মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির: আরবি ও ইসলামি সাহিত্যে তাঁর অবদান

GIFT

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
403543

403543

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
নাজির আহমদ
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মুহাম্মাদ আল আমীন
এম. ফিল গবেষক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ
আগস্ট ২০০৫

بسم الله الرحمن الرحيم

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, "মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির: আরবি ও ইসলামি সাহিত্যে তাঁর অবদান" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এর পূর্ণ বা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ করি নি এবং অন্য কোন ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় উপস্থাপন করি নি।

403543

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

আল আমীন
০৫.০৯.০৫

(মুহাম্মাদ আল আমীন)
এম. ফিল গবেষক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নং ৫১
শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৯-২০০০

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রত্যয়নপত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ আল আমীন, এম. ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক **"মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির: আরবি ও ইসলামি সাহিত্যে তাঁর অবদান"** শীর্ষক শিরোনামে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি তার নিজস্ব একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয় নি। আমি গবেষণা অভিসন্দর্ভটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি এবং এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

403543

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(নাজির আহমদ)
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবি, উর্দু ও ফার্সি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا - অ	ص -ছ	---- اِ	يِ - য়ি
ب -ব	ض -য	--ـِـ	يِى - য়ী
پ -প	ط -ত	ا---َا	يُ- ইয়ু
ت -ত	ظ -য	ـُ--وْ	يُو - ইউ
ٹ -ট	ع -ʻ	ى -আ	غَ - আ/ ʻআ
ث -ছ/স	غ -গ ـ	اَ-আ	عَا -আ/ ʻআ
ج -জ	ف -ফ	اِ- ই	عُ - উ/ ʻউ
چ -চ	ق -ক	اِىْ -ঈ	عُو - উ/ ʻউ
ح -হ	ک -ক	اُ - উ	عِ - ই/ ʻই
خ -খ	گ-গ	اُوْ - ঊ	عِي ঈ/ ʻঈ
د -দ	ل -ল	وَا - ওয়া	
ڈ -ড	م -ম	وَ - ওয়া	
ذ -জ	ن -ন	وى - বী/ভী	
ر -র	و -ও	وُ - উ	
ڑ -ড়	ه -হ	وُوْ - ঊ	
ز -য	ء -,	يَ - ইয়া	
س -স	ى -য়	يا - ইয়া	
ش -শ	ـُا		

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর করুণা ও মেহেরবানীতে "মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির : আরবি ও ইসলামি সাহিত্যে তাঁর অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা করা সম্ভব হয়েছে। দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর পরিচয় ও পথের দিশা দ্বীন ইসলাম লাভ করে ধন্য হয়েছি। এই মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম হাফেজ মুহাম্মাদ সফি উদ্দীনকে, যিনি আমাকে দ্বীনী ইলম শিক্ষাদানের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক নাজির আহমদের প্রতি, যাঁর নির্দেশনা, পরামর্শ ও উদ্দীপনা আমাকে অভিসন্দর্ভটি রচনায় শক্তি যোগিয়েছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শ্রদ্ধেয় স্যার অধ্যাপক ড. এ. বি. এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী সাহেবের প্রতি। স্যারের মহানুভবতা, ঔদার্য, নির্দেশনা ও পরামর্শ আমাকে যথাসময়ে অভিসন্দর্ভটি রচনা সম্পন্ন করতে প্রেরণা ও সাহস যোগিয়েছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ প্রভাষক হাফেজ মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের প্রতি, যিনি আমাকে ছাত্রজীবন থেকে নির্দেশনা দিয়ে এসেছেন। তাঁর সহযোগিতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা আমাকে নিরলস প্রেরণা দান করেছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নুরুল হক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান, অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক ড. সাহেরা খাতুন, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, অধ্যাপক ড. আ.স.ম. আবদুল্লাহসহ আমার পরম শ্রদ্ধেয় সকল শিক্ষকের প্রতি। তাঁরা আমার জীবন

গঠনে অংশীদার ও পথপদর্শক। সকলের প্রতি আমার হৃদয় নিঙড়ানো শ্রদ্ধা র'ল। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শরীফ মুহাম্মদ মুনীর ও শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কইয়ূম এর প্রতি; যারা আমাকে সকল ধরণের সহযোগিতা করে অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন। তাদের মহানুভবতা সত্যিই প্রশংসনীয়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ হুসাইন, মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ অহীদুল আলম, প্রভাষক কাজী মুফিজ উদ্দীন জেহাদী, প্রভাষক মুহাম্মদ সিরাজুম মুনির, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ সকল শিক্ষকের প্রতি। যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, ছারছীনা মাদরাসা লাইব্রেরি ও রাজউক কলেজের লাইব্রেরিতে কর্তব্যরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি। তারা আমাকে লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন করার সুযোগ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার বড় ভাই হাফেজ মুহাম্মদ রুহুল আমীন, মুহাম্মদ নুরুল আমীন, মাওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ মুশাররফ হোসেনের প্রতি। তারা আমাকে স্নেহ মমতা দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

বিনীত

আল আমীন ০৫.০২.০৫

(মুহাম্মাদ আল আমীন)
এম. ফিল গবেষক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ১-২

প্রথম অধ্যায় ৩-৩৩

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের সমসাময়িক রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক অবস্থা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২২

আর্থসামাজিক অবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৬

ধর্মীয় অবস্থা ২৯

চুতর্থ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৪-৮৫

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ ৩৪

পরিচিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৪৪

দাম্পত্য জীবন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪৯

কর্মজীবন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৫৫

জাতীয় পর্যায়ে কর্তব্য পালন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৬৩

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শরীফ সাহেবের অবদান

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৬৪

শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে অবদান

সপ্তম পরিচ্ছেদ ৬৮

দ্বীনী তাবলীগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান

অষ্টম পরিচ্ছেদ ৭২

শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের চারিত্রিক গুণাবলি

তৃতীয় অধ্যায় ৮৬-১৩০

আরবি সাহিত্যে অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ ৮৬

মৌলিক রচনাবলি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১৩

অনুবাদকর্ম

চতুর্থ অধ্যায় ১৩০-১০২

ইসলামি সাহিত্যে অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ ১৩০

মৌলিক রচনাবলি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৯৫

অনূদিত গন্থ ও সম্পদনা কর্ম

উপসংহার ২০২

পরিশিষ্ট ২০৩

সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির

নিবেদিত কবিতা ২০৮

অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি "সোসালিজম ও ইসলাম" ২১১

এ্যালবাম ২২৮

গ্রন্থপঞ্জী ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

الحمد لله حمد الشاكرين والصلوة والسلام علي رسوله الامين وعلي اله و اصحابه اجمعين

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার; যাঁর অশেষ মেহেরবানীতে "মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির : আরবি ও ইসলামি সাহিত্যে তাঁর অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরকে ছাত্র থাকা অবস্থায় ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসাবে পেয়ে তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে অবগত হই। তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর জীবন ও সাহিত্য কর্মের উপর অভিসন্দর্ভ রচনার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। একদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. এ.বি. এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী সাহেবের সাথে আলোচনা করি। শ্রদ্ধেয় স্যার আমাকে শরীফ সাহেবের সাহিত্য কর্মের উপর গবেষণা করার পরামর্শ ও নির্দেশনা দেন। সে পরামর্শ অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়ের উপর অভিসন্দর্ভ রচনা শুরু করি। অভিসন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে শরীফ সাহেবকে অন্তরঙ্গভাবে জানার সুযোগ হয়। তাঁর রচনাবলি পড়ে আমি রীতিমতো অভিভূত। তাঁর জীবন বর্ণাঢ্য এবং রচনাবলি বেশ সমৃদ্ধ। ছাত্র জীবনে তিনি অসাধারণ মেধার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। দেশের সুবৃহৎ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ছারছীনা দারুচ্ছুনাত আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা ও অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে তিনি সহস্রাধিক ছাত্রের জীবন গঠনে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। এর সাথে সাথে চলতে থাকে তাঁর সাহিত্য রচনার কাজ। ছারছীনা দরবার শরীফ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর উপর। সম্পাদনা কর্মের পাশাপাশি তিনি প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। আরবি কবি ইবনুল ফারিদের দিওয়ান এর কাব্যানুবাদ করে 'অশ্রু সরোবর' নামে প্রকাশ করলে শিক্ষিত সমাজে কবি হিসাবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এর পর শেখ সাদীর 'কারীমা' এর কাব্যানুবাদ প্রকাশ করা ছাড়াও তিনি নিয়মিত কবিতা রচনা করতেন। সেগুলো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এর ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

হয়। গদ্য রচনায়ও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইসলামে নারীর মর্যাদা, জীবনের আদর্শ, নারী জীবনের আদর্শ, এক নজরে সীরাতুন্নবী (স), আউলিয়া কাহিনী , হাকীকাতুল অছীলাহ, নালায়েন শরীফের ফযীলত ইত্যাদি তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম। আরবি ভাষায় তাঁর রচিত বার চান্দের খুৎবাহ বাংলাদেশের সর্বত্র মসজিদে মসজিদে নিয়মিত পঠিত ও আলোচিত হচ্ছে। গ্রন্থ রচনা ছাড়াও সভা সমাবেশে বক্তৃতা প্রদান ও ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে তিনি আরবি ও ইসলামি সাহিত্যে অবদান রেখেছেন। এ অভিসন্দর্ভে তাঁর সাহিত্য কর্মকে চারটি অধ্যায়ে এবং একটি পরিশিষ্টে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর শৈশব কাল, শিক্ষা জীবন, কর্মজীবন এবং চারিত্রিক গুণাবলি, তৃতীয় অধ্যায়ে আরবি সাহিত্যে তাঁর অবদান এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামি সাহিত্যে তাঁর অবদান আলোচিত হয়েছে। পরিশিষ্টে তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থ, সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে তাঁকে মূল্যায়ন এবং তাঁর জীবনের স্মৃতি বিজড়িত এ্যালবাম সংযোজিত হয়েছে। সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জির তালিকা সংযোজিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক নাজির আহমদ এবং আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী সাহেবের সরাসরি নির্দেশনা ও পরামর্শে রচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের সমসাময়িক রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের জীবনকালে দেশের সমসাময়িক অবস্থার বিভিন্নমুখী পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এ অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। প্রথম পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক অবস্থা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আর্থসামাজিক অবস্থা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধর্মীয় অবস্থা এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ দেওয়া হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক অবস্থা

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের জীবনকাল ১৯২১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ব্যাপৃত। এ দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশ তিন ধরণের শাসনাধীনে আসে।

ক. ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)

খ. পাকিস্তানি শাসন (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.)

গ. বাংলাদেশী শাসন (১৯৭১- ২০০১ খ্রি.)

নিম্নে তাঁর সময়কার রাজনৈতিক অবস্থার তিনটি পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হলো :

ক. ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী বিপর্যয়ের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। এ সুযোগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের সাথে 'এলাহাবাদ চুক্তি' সম্পাদনের মাধ্যমে ইংরেজগণ এদেশের শাসন ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে।[১] ফলে এদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ধীরে ধীরে তারা গোটা ভারতবর্ষকে তাদের করতলগত করেন। এরপর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়া (মৃ.১৯০১) ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। সে সময় থেকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[২] ইংরেজগণ এদেশে শাসনব্যবস্থার পাশাপাশি অর্থনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ঔপনিবেশিক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

---

১ এম.এ.রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), (ঢাকা : আহমদ পাবলিসিং হাউস, জুন ১৯৮৯), পৃ. ১১; আবদুস সাত্তার, তারিখে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, (ঢাকা : মাদ্রাসা-ই-আলিয়া রিসার্স এন্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৫৯), পৃ.৩১-৩২।

২ এম. এ. রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ভেদনীতি (Devide and Rule Policy) এর মাধ্যমে এদেশের প্রধান দু'টি সম্প্রদায় মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ত ও দ্বান্দ্বিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তারা নানা ধরণের অপকৌশল গ্রহণ করে।

কিন্তু মুসলমানগণ কিছুটা উপলব্ধি করলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা ব্রিটিশদের সাথে তাল মিলিয়ে গোটা ভারতবর্ষের মানুষের বিপর্যয় ডেকে আনে।[৩] ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার বঙ্গভঙ্গ আদেশ বাস্তবায়ন করে। এর ফলে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় এদেশীয় হিন্দু ও কতিপয় মুসলিম নেতার প্রবল বিরোধিতার ফলে ভারত সরকার "বঙ্গভঙ্গ" আদেশ রহিত করেন। এতে মুসলিম স্বার্থ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।[৪] যার ফলশ্রুতিতে এদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান এত বেশি বেড়ে যায় যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা দেখা দেয়। এরপর থেকে উপমহাদেশের রাজনীতিতে মুসলিম ও হিন্দুদের পারস্পরিক বিরোধিতা প্রকাশ্য রূপ লাভ করে এবং রাজনীতি দু'টি ধারায় প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় থেকেই ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ এদেশের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণও উন্নতির স্বার্থে একটি উপযুক্ত রাজনৈতিক মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আসছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার পর হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসের বৈমাত্রেয় ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ মুসলিম নেতাদের মনে এ ধারণার যৌক্তিকতা আরো দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সর্ব-ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সভায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।[৫] তৎকালীন সরকারের সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এ দল গঠন করা হয়। ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নতি সাধন এবং সম্ভবমতো সরকারের বিধি-বিধানের সমর্থন করা ছিল মুসলিম লীগ গঠনের মূল লক্ষ্য।[৬]

কলকাতাকে রাজধানী করে বড় লাটের অধীনে এবং ঢাকাকে রাজধানী করে ছোট লাটের অধীনে যথাক্রমে বঙ্গ ও পূর্ব-বঙ্গাসাম প্রদেশকে ন্যস্ত করা হয়। উভয় বাংলার বিচার বিভাগও পূর্ববৎ কলকাতা হাইকোর্টের অধীনে রাখা হয়।

---

৩ বঙ্গভঙ্গ আদেশের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে বৃহৎ ভূখন্ড 'বঙ্গ' এবং 'পূর্ব বঙ্গাসাম' এই দু'টি নামে গোটা ভারতবর্ষকে দুই প্রশাসনিক প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন এ ঘোষণা দেন। উক্ত আদেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে পূর্ব-বঙ্গাসাম প্রদেশ গঠন করা হয়।

৪ A. R. Mallik, British Policy and Muslims of Bangla, (Dhaka : Bangla Academy, 1977), P. 26.

৫ ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এলাকায় নওয়াব ওয়াকারুল মুলুকের সভাপতিত্বে উক্ত রাজনৈতিক সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রণীত 'মুসলিম অল-ইন্ডিয়া কনফেডারসি' এর উপর ভিত্তি করে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' গঠিত হয়।
দ্র. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ. ১৯।

৬ এম. এ. রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪; G. Allana, Pakistan Movement : Historic Documents, (Karachi : Wisdom Publisers, 1968), P. 25.

Dhaka University Institutional Repository

সূচনা লগ্ন থেকেই উক্ত সংগঠন ভারতব্যাপী মুসলমানদের স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হয়। ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম লীগের শাখা গঠিত হয়।[৭]

১৯১৫ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নওয়াব সলীমুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে মুসলিম লীগে উদারনৈতিক শিক্ষিত মুসলিম যুব শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করে। যুব শ্রেণীর নেতারা সরকারের বিধি-বিধানের সমর্থন করার পরিবর্তে দেশের স্বায়ত্বশাসন আদায়ের জন্য সংগ্রামী তৎপরতা জোরদার করেন। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তারা দেশে মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের প্রচেষ্টা চালান। তাদের এ মিলনধর্মী রাজনীতির ধারা ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লখনৌ চুক্তি থেকে আরম্ভ করে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'নেহরু রিপোর্ট' রচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়। 'নেহরু রিপোর্ট' প্রকাশিত হলে পুনরায় মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস এর রাজনীতি ভিন্ন পথ ধরে এগুতে থাকে।[৮]

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রাওলাট আইন[৯] এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড[১০] ভারতীবাসীর মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতিতে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে প্রস্তাব পাসের মধ্য দিয়ে মহন দাস করম চাঁদ গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।[১১]

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল এ পার্কে ব্রিটিশ বিরোধী সভা চলছিল। চতুর্দিকে অট্টালিকা বেষ্টিত এ পার্কের বহির্গমন পথ ছিল অত্যন্ত সরু। একদিকে আবার ১০০ ফুট উচুঁ প্রাচীর। প্রায় ১০ হাজার লোক সভায় সমবেত হয়েছিল। হঠাৎ ব্রিটিশ সামরিক অফিসার জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য বেপরোয়া গুলি চালাতে থাকে জনগণকে লক্ষ্য করে। ১৬০০ রাউন্ড গুলি চালানোর পর গুলি শেষ হয়ে যায়। সরকারি হিসাব মতে ৩৭৯ জন লোক গুলিতে নিহত হয় এবং প্রায় ১২০০ লোক আহত হয়। প্রকৃত হিসাবে নিহতের সংখ্যা আরো বেশি। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভে ও ঘৃণায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজদের দেয়া নাইট (স্যার) উপাধি প্রত্যাখান করেন।

---

৭ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

৮ ড. মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, (কলিকাতা : এ হাকিম এন্ড সন্স, ১৯৯৬), পৃ.৩৪।

৯ **রাওলাট আইন ঃ** ভারতীয়দের রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতবাসীর কণ্ঠরোধ করা এবং বিনা বিচারে কারাদন্ড ও নির্বাসন দেওয়ার সুবিধার্থে ব্রিটিশ সরকার এ আইন প্রবর্তন করে।

দ্র. অতুল চন্দ্র রায় এবং প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস, (কলিকাতা : মৌলিক লাইব্রেরি, ২০০০), পৃ. ৪৫০।

১০ **জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড ঃ** ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল সংঘটিত হয় ইতিহাসের জঘন্যতম জালিওয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড। জালিওয়ানওয়ালাবাগ ভারতের অমৃতসরে অবস্থিত একটি পার্কের নাম।

দ্র. রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ , ১৯৯২), পৃ.২১।

১১ ড. আবুল ফজল হক, ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান ও মোঃ মাকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্ব ও নীতিমালা, (রাজশাহী : বুকস প্যাভিলিয়ান, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯০), পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নিম্নোক্ত কর্মসূচী পালনের প্রতি দেশের জনগণকে আহবান জানান-

ক. ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত সকল খেতাব বর্জন।

খ. পুলিশ ও সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ।

গ. সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ।

ঘ. সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে ছেলেমেয়েদের প্রত্যাহার করে নেওয়া।

ঙ. বিদেশী পণ্য বর্জন ও দেশী পণ্য ব্যবহার।

চ. সকল প্রকার কর প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন।

ছ. কাউন্সিল নির্বাচন বর্জন।

জ. আইনজীবীদের আদালত বর্জন।

ঝ. সম্প্রীতি স্থাপন।[১২]

মহাত্মাগান্ধীর আন্দোলন সফল হলে এক বছরের মধ্যে ভারতবাসী স্বরাজ লাভ করে। গান্ধী সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার আহবান জানান। অন্যদিকে মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে মুসলমানরা খিলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ক্রমশ অহিংস আন্দোলন সহিংস আন্দোলনে রূপ লাভ করে। গান্ধীজী তখন আন্দোলন প্রত্যাহার করে জনসাধারণকে নিবৃত্ত করেন।[১৩]

এরপর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত হয়। এ আইনে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল হওয়ার বিধান দেওয়া হয়। সে কারণে তত্ত্বগত ধারণা মতে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন যথার্থই ছিল। কিন্তু সে ধারণা বাস্তবে কার্যকর হয়নি।[১৪]

লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালের ২২ ও ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনের সমাপ্তি দিবসে অবিভক্ত ভারতবর্ষের দশ কোটি মুসলমানের স্বকীয় জীবনধারা স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবীতে অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি পেশ করেন। স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবীর এই প্রস্তাবই ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব হিসাবে খ্যাত।[১৫]

---

১২ মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, মার্চ ১৯৯৩), পৃ. ১৭৫।

১৩ রফীকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

ড. আবুল ফজল হক, ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান ও মোঃ মাকসূদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭-৪৬১।

১৪ মুহাম্মদ ইনাল-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

১৫ অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, (ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., তারিখ বিহীন), পৃ-২।

Dhaka University Institutional Repository

মূল প্রস্তাবটি নিম্নরূপ ঃ

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুবিবেচিত অভিমত এই যে, এ দেশে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই কার্যকর কিংবা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যদি না নিম্নে বর্ণিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে তা পরিকল্পিত হয়। যথা-ভৌগলিক নৈকট্য সমন্বিত ইউনিটগুলি প্রয়োজন অনুসারে স্থানিক রদবদল পূর্বক সীমানা চিহ্নিত করে অঞ্চল গঠন করতে হবে এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল যেমন ঃ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল সমন্বয়ে অবশ্যই স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে, যেখানে অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলি স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাবকে মুসলিম লীগের আদর্শরূপে প্রচার করা হয়।[১৬] এ প্রস্তাবে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রস্তাব জাতি হিসাবে ভারতের অখন্ডতাকে অস্বীকার করে এবং ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানায়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল-সমূহের সমন্বয় পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।[১৭]

খ. পাকিস্তানি শাসনামল

পাকিস্তানি শাসনামল শুরু হওয়ার পূর্বেই মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ছাত্রজীবন সমাপ্ত করেন। পাকিস্তানি শাসনামলের বহুরূপী চালচিত্র তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল লাহোর প্রস্তাবকে পরিবর্তন করে মুসলিম লীগ আইন পরিষদের কনভেনশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮)[১৮] সাহেবের নির্দেশে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯৩ – ১৯৬৩)[১৯] পাকিস্তান প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

---

১৬ রফীকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১৭ এম. এ. রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭।

১৮ **মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ** : মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে করাচীতে জন্মগ্রহণ করেন। লন্ডনে পড়াশুনা শেষ করে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ওকালতি শুরু করেন। ১৯০৫ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করলেও ১৯২০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সদস্যপদ বহাল রাখেন। একই সঙ্গে দুই দলের সদস্য থাকার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য সাধন। এতে তিনি পুরাপুরি সফল না হলেও কিছুটা সফল হন। ১৯৩৪ সালে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। এ বছরই তিনি স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
দ্র. শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পাকিস্তানে জিন্না, (কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৩১৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৮; Safar A. Akanda, East Pakistan And Politics of Regionalism (Ph.D Thesis (Unpublished), University of Denver, 1970). P. 213.

১৯ **হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী** : ১৮৯৬ সালে পশ্চিম বাংলার মোদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা ও লন্ডনে পড়াশুনা শেষ করে তিনি কলিকাতায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯২৫ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক কাউন্সিলের সদস্য হন। ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি অখন্ড বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এ বছরই তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।
দ্র. Safar A. Akanda, Ibid, P. 368.

২০ Mohammad Abdur Rhim, The Muslim Society And Politics in Bengal, (Dhaka : Bangladesh Book Society, 1978), P. 300.

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রস্তাবে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের পরিবর্তে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছে।[২০] কিন্তু পরিতাপের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে মুসলিম লীগ হতে বহিষ্কৃত হলে ১৯৪২ সালে হিন্দুমহাসভা নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর যোগসাজসে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ (Bengal Legislative Assembly) এর ২৫০ জন সদস্যের ২১০ জন শ্যামা-হক মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করে।[২১]

১৯৪৬ সালের ৯ মে জার্মানী ও ইটালীর আত্মসমর্পণের পর আফ্রো-ইউরোপীয় রণভূমিতে যুদ্ধ হয়। এর অব্যাবহিত পরই গণতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাজ্যে ১৯৪৫ সালের ২৬ জুলাই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ী শ্রমিক দল মি. ক্লিমেন্ট এটলীর নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। অক্ষশক্তির অন্যতম অংশীদার জাপান ২ সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করলে এশীয় রণভূমিতে যুদ্ধ বন্ধ হয়। মহাযুদ্ধেরকালে পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন অনুধাবন করে ভারতীয় জনমত যাচাই করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা দেন। এ নির্বাচনে ৫২৫ টি মুসলিম আসনের মধ্যে পাকিস্তান দাবীর পক্ষ শক্তি ৪৬৪ টি আসন লাভ করে।[২২]

এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহের সমন্বয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।[২৩] কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর অল্প দিনের মধ্যেই শাসকগোষ্ঠি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সময় বর্তমান বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ববাংলা। ১৯৫৫ সালে এর নাম হল পূর্বপাকিস্তান। আর মূল পাকিস্তানকে বলা হত পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের এই দুই অংশের মধ্যে দূরত্ব দেড় হাজার মাইল। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একমাত্র বন্ধন ছিল ধর্মের। কিন্তু এই দুই অংশের আর্থসামাজিক কাঠামোতে ছিল ভারসাম্যের অভাব। পাকিস্তানের মোট ভুখন্ডের শতকরা ৪৩.৭ ভাগ বসবাস করত পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ৫৬.৩ ভাগ লোক বসবাস করত পূর্ব পাকিস্তানে। এ সত্ত্বেও শাসকগণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখত। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।[২৪]

---

২১ অলি আহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

২২ অলি আহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

২৩ শাহনাজ পারভিন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান, (রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি থিসিস (অপ্র.), ১৯৯৯), পৃ. ২২; মোনয়েম সরকার, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ৬৬।

২৪ মোনয়েম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭; অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি পূর্বপাকিস্তানের লোকদের প্রতি বিমাতাসূলভ আচরণ করত। তারা পূর্বপাকিস্তানের জনগণের মুখের ভাষাকে কেড়ে নেওয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ মে হায়দারাবাদে উর্দু সম্মেলনে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান সভাপতির ভাষণে প্রসঙ্গত বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।[২৫]

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহম্মদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জ্ঞানগর্ভ যুক্তি দিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা প্রস্তাব করেন।[২৬] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়া অনেক কবি, সাহিত্যিক ও লেখক লেখনীর মাধ্যমে ড. জিয়াউদ্দীনের প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ এবং ছাত্র সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়ার স্বপক্ষে একটি প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়।[২৭]

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেম সাহেবের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে 'তমুদ্দুন মজলিস' নামে ইসলামী স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠিত হয়।[২৮]

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁর লিখিত রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' তমুদ্দন মজলিস কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[২৯] ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ববাংলা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব উথাপন করে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব করেন।[৩০]

---

২৫ রতন লাল চক্রবর্তী সম্পা., ভাষা আন্দোলনের দলীলপত্র, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ২০০০), পৃ.১৯৭; বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রথম খন্ড, নভেম্বর ১৯৯৫), পৃ. ২৯।

২৬ রফীকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২; ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৪৪।

২৭ ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১), (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ.৮৬-৮৭।

২৮. মুকুল চৌধুরী সম্পা., ভাষা আন্দোলন, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৭৯; ড. মো. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭।

২৯ বশীর আল হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

৩০ রতন লাল চক্রবর্তী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৮; ড. আবুল ফজল হক, ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান ও মাকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; মোনয়েম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান (১৮৯৫-১৯৫১ খ্রি.) গণপরিষদে বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা, অন্য কোন ভাষা নয়।[৩১] রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (১ অক্টোবর ১৯৪৭ খ্রি.) সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন করা হয় ২ মার্চ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১ খ্রি.) এর ফজলুল হক হলে এ সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক মনোনীত হন শামসুল হক।[৩২] এতে ৭ মার্চ ঢাকায় এবং ১১ মার্চ দেশের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত হয়।[৩৩] বস্তুত ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে এর ১১ মার্চই ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম সংগঠিত গণবিক্ষোভ।[৩৪]

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ২১ মার্চ গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮ খ্রি.) ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে দম্ভোক্তি করে বলেন, তিনি কোন শত্রুকে এমনকি সে যদি মুসলমানও হয় সহ্য করবেন না। তিনি স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়।[৩৫] ২৪ মার্চ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বলেন, বাঙালিরা তাদের প্রদেশের ভাষারূপে যেকোন ভাষা নির্বাচিত করতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানের সরকারি ভাষা অবশ্যই উর্দু হবে।[৩৬] জিন্নাহর এর উক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত গ্রাজুয়েটবৃন্দ 'না', 'না', ধ্বনি উচ্চারণ করেন।[৩৭] এর পরবর্তী ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর ১১ মার্চ পালিত হয়। এ সময় জোরালো কোন আন্দোলন না হলেও ছাত্রদের মনে ক্ষোভ অব্যাহত থাকে।[৩৮]

এরপর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে ভাষা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪ খ্রি.)[৩৯] এর এক উক্তিতে। ২৭ জানুয়ারি (১৯৫২ খ্রি.) তিনি পল্টনের এক জনসভায় বলেন, 'পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'।

---

৩১ রতন লাল চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৮।

৩২ বদরুদ্দীন ওমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

৩৩ সিরাজুল ইসলাম সম্পা., বাংলাদেশের ইতিহাস, (১৭০৪ – ১৯৭১, রাজনৈতিক), (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম খন্ড, ফেব্রুয়ারি ২০০০), পৃ. ৮৮ –৮৯; মোনয়েম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৩৪ রতন লাল চক্রবর্তী সম্পা., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

৩৫ রফীকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; ড. মো. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৩৬ মোনয়েম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৩৭ রফীকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; ড. মো. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

৩৮ ড. মো. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

৩৯ **খাজা নাজিম উদ্দিন :** তিনি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ঢাকার নওয়াব পরিবারের সন্তান। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ সময় পর্যন্ত ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ১৯৪৩–১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, ১৯৪৮–১৯৫১ খ্রি. সময় পর্যন্ত পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, তারপর (১৯৫১–১৯৫৩ খ্রি.) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Safar A. Akanda, Ibid, Pg. 367.

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত প্রধানমন্ত্রীর এ উক্তির প্রতিবাদে ও 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার' দাবীতে ৩০ জানুয়ারি (১৯৫২ খ্রি.) বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের নেতৃত্বে প্রথম প্রতীক ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ও সভা এবং ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২ খ্রি.) পুনরায় ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ জানুয়ারি (১৯৫২ খ্রি.) 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' পরিচালনার জন্য একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি গঠিত হয়।[৪০]

২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২ খ্রি.) ছিল পূর্ব বাংলা সরকারের বাজেট অধিবেশন। তাই সরকারের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫১ খ্রি.) সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও সভার কর্মসূচি দেওয়া হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২ খ্রি.) সন্ধ্যা ৬টায় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন একটানা ১মাস ঢাকা জেলার সর্বত্র হরতাল, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারী করেন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের ছাত্ররা নিজ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে (বর্তমান মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে) সমাবেশ করে এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আইন পরিষদ ভবনের দিকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণে গ্রেফতার হতে থাকেন। বিকাল ৩টা ১০ মিনিটের দিকে পুলিশ ও সেনাদল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ছাত্র জনতার উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে এক নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটায়। একে একে শাহাদৎ বরণ করেন রফিক উদ্দিন আহমদ,[৪১] শহীদ আবুল বরকত,[৪২] আবদুস সালাম,[৪৩] আব্দুল জাব্বার[৪৪] সহ আরো অনেক ছাত্র-জনতা।

আইন পরিষদের নির্ধারিত অধিবেশন চলছিল। বাইরের উন্মত্ত স্রোতের ঢেউ এসে লাগে পরিষদের অভ্যন্তরেও। মুসলিম লীগ দলীয় তৎকালীন সাংসদ মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ গর্জে উঠে বলেন, "যখন আমাদের বক্ষের মানিক, আমাদের রাষ্ট্রের ভাবীনেতা ৬ জন ছাত্র রক্ত শয্যায় শায়িত তখন আমরা পাখার নীচে বসে হাওয়া খাব এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি জালিমের এই জুলুমের প্রতিবাদে গৃহ পরিত্যাগ করছি।"[৪৫]

---

৪০ বশীর আল হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

৪১ **রফিক উদ্দিন আহমদ :** ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রথম শহীদ হন রফিক উদ্দিন আহমদ। তখন তার বয়স ১৯/২০ বছর। তিনি মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজে এই.কম. দ্বিতীয় বর্ষে পড়তেন। তবে তিনি কেন ঢাকায় এসেছিলেন তা জানা যায় না। শহীদ রফিককে দাফন করা হয় আজিমপুর গোরস্থানের অসংরক্ষিত এলাকায়। তাঁর কবর সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি।

দ্র. বশীর আল হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪।

৪২ **শহীদ আবুল বরকত :** তিনি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বরকত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম.এ. শেষ পর্বের ছাত্র ছিলেন। আজিমপুর গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

দ্র. বশীর আল হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪।

৪৩ **শহীদ আব্দুস সালাম :** তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবিদ্ধ হন। তবে শাহাদাত বরণ করেন ৭ই এপ্রিল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডাইরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজে পিয়ন-এর কাজ করতেন। তার গ্রামের বাড়ী ফেনী জেলার লক্ষণপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া।

দ্র. সিরাজুল ইসলাম সম্পা., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮; বশীর আল হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭।

৪৪ **শহীদ আব্দুল জব্বার :** তিনি ছিলেন একজন দর্জি। তার বাড়ী গফরগাঁওয়ের পাঁচাইয়া গ্রামে। তার পিতার নাম আব্দুল কাদের।

দ্র. সিরাজুল ইসলাম সম্পা., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৪৫ মোনয়েম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র-জনতা হত্যার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২ খ্রি.) ঢাকা শহরে ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকায় ছাত্র-জনতা হত্যার সংবাদে প্রদেশের অন্যান্য স্থানে পৌঁছামাত্র সারা পূর্বপাকিস্তানে গণআন্দোলন শুরু হয়। সরকারের পক্ষ থেকে চরম সন্ত্রাসের রাজত্ব কয়েম করা হয়। অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনতাকে গ্রেফতার করা হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে, 'রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন পুনরায় বিবেচনা করে দেখবেন।'

প্রাদেশিক পরিষদের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন স্বয়ং বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক বিজয় সম্পন্ন হয় পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 'বাংলার' স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সামরিক শাসক আইয়ুব খান ঘোষিত পাকিস্তানের সংবিধানে তিনি 'বাংলা' ও 'উর্দু' কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বহাল রাখেন। (আর্টিকেল ২১৫)

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা'।[৪৬]

১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। বিশ শতকের শেষ লগ্নের এ দিনটি বাঙালির বিশেষ করে বাংলাদেশী বাঙালির জন্য নতুন গর্ব ও অহঙ্কারের। এ দিনে আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা 'ইউনেস্কো' একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এ দিনটির সাফল্য আমাদের রক্ত-স্বেদ-শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত।

৬ দফা আন্দোলন

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের ফলেই পূর্ব-বাংলায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ধ্বংসস্তুপের উপর জন্ম নেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ। পরবর্তীকালে এ জাতীয়তাবাদই বাঙালিদের সব আন্দোলনের অনুপ্রেরণা যোগায়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাপক আকার ধারণ করে। পূর্ব-বাংলা হতে পশ্চিম বাংলায় কোটি কোটি টাকার সম্পদ পাচার করা হয়। পাকিস্তান সরকারের এরূপ বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক নীতির ফলে পশ্চিম পাকিস্তান একটি শিল্পোন্নত অঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠে এবং পূর্ব-বাংলা তার উপনিবেশ তথা রক্ষিত বাজারে পরিণত হয়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) পূর্ববাংলার আঞ্চলিক শাসনের দাবী সম্বলিত ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচী উত্থাপন করেন।[৪৭]

---

৪৬ ড. মো. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

৪৭ এম.এ. রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৩-৬১৬; ড. মো. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪-৩৫; মোনায়েম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে এ ৬ দফা পেশ করার সাথে সাথে রাজনৈতিক মহলে, বিশেষ করে শাসক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ ছয় দফা দাবী আদায়ের লক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে এবং বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এর পরিণতিতে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে এবং পাকিস্তানের জনগণ ৬দফা কর্মসূচির পক্ষে রায় প্রদান করে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে (National Aesembly) আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্ত্বেও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন নি। প্রকৃতপক্ষে ৬ দফা ছিল বাংলায় স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম কার্যকর পদক্ষেপ।[৪৮]

মুক্তিযুদ্ধ / স্বাধীনতা যুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।[৪৯] ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করে বাংলার নিরস্ত্র, নিরাপরাধ মানুষের উপর চালায় মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ও ভয়াবহতম গণহত্যা। একই সঙ্গে বাঙালি ই.পি.আর. ও পুলিশ বাহিনীর তরফ থেকে প্রতিরোধ আসতে পারে ভেবে তাদেরকে নির্মূল করার জন্য বাঙালি ই.পি.আর. ও পুলিশ লাইনগুলিতে পাকবাহিনী সরাসরি হামলা চালিয়ে অস্ত্রাগারগুলি দখল করে বাঙালি সশস্ত্র লোকদেরকে গুলি করে হত্যা করতে থাকে। কিন্তু বাঙালিরা চুপচাপ বসে না থেকে ২৫ মার্চ (১৯৭১ খ্রি.) রাত্রি থেকেই সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং এভাবে প্রথম মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

আক্রমণ পাল্টা প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে সকল বাঙালি সশস্ত্র সেনা, কৃষক এবং ছাত্র জনতার সম্মিলিত ঐক্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধের এমনি মুহূর্তে ২৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু (১৯২০-১৯৭৫ খ্রি.) কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা বাঙালির মুক্তির সংগ্রামকে উজ্জীবিত এবং সুদৃঢ় করে। পাকিস্তানি হামলার মুখে বাংলায় যে অবিন্যস্তভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিল তা একটি সুবিন্যাস্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার লক্ষ্যে একজন সিনিয়ার সামরিক অফিসারের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ৪ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর নেতৃত্বে হেড কোয়ার্টারে (তেলিয়া পাড়া, কুমিল্লা) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শীর্ষ সামরিক অফিসারদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল ওসমানী, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সালাউদ্দিন, মোহাম্মদ রাজা, মেজর নূরুল ইসলাম, মেজর মইনুল হাসান চৌধুরী, লে. ক. আব্দুর রব পাক সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর কাজী নুরুজ্জামান প্রমুখ।

---

৪৮ এম.এ. রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-২১৫।

৪৯ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পা., বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র, (ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স, তৃতীয় খন্ডের ভূমিকা, জুন ২০০৪), পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত বৈঠকে উপস্থিত অফিসারবৃন্দ কর্নেল ওসমানীকে সমগ্র যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করেন। এরপর ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। এই সরকার ১৭ এপ্রিল (১৯৭১ খ্রি.) কুষ্টিয়ার মেহেরপুর থানার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। একই অনুষ্ঠানে জেনারেল ওসমানীকে মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগের পর মুক্তিবাহিনী দ্রুত সংগঠিত করা অত্যাবশ্যক হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজন ছিল-

প্রথমত : যে সমস্ত বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর.পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার বাহিনী বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে একক কমান্ডে নিয়ে আসা।

দ্বিতীয়ত : হানাদার বাহিনীর মনোভাব, শক্তি ও প্রকৃতি সাপেক্ষ যুদ্ধ স্ট্রাটেজী তৈরী করা।

তৃতীয়ত : মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী বিভিন্ন সামরিক অফিসারকে যথোপযুক্ত দায়িত্বে নিয়োগ করা এবং যুদ্ধ এলাকা নির্ধারণ করা ।

চতুর্থত : যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও কৃষক-শ্রমিকের মধ্য থেকে যুবকরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে আসছিল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধে নিয়োগ করা।

পঞ্চমত : অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ উপকরণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সজ্জিত করা।[৫০]

এগুলিকে সামনে রেখেই মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলা হয়। যার মধ্যে নিয়মিত সৈনিক ছাড়াও ছিল বহু সংখ্যক অনিয়মিত বাহিনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিল্প-কারখানার শ্রমিক, কৃষক, গৃহিনী, যুবক-যুবতীসহ সকলে স্তরের নারী-পুরুষ নিয়ে অনিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয়। সরকারি পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা: (১) নিয়মিত সেনাবাহিনী (২) ও অনিয়মিত গণবাহিনী। নিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল সেনাবাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর, পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীর লোকদের নিয়ে। সরকারি পর্যায়ে যাদের নামকরণ করা হয় এম. এফ (মুক্তি ফৌজ)। যারা সংখ্যায় ছিল প্রায় ১০ হাজার।[৫১]

গণবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে চাকুরীজীবী, কৃষক ও শ্রমিক। এক কথায় দেশের সর্বস্তরের কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী নারী-পুরুষ। যুদ্ধে এ বাহিনীই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণবাহিনীর সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। প্রায় ১ লক্ষ গেরিলা দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করেন।[৫২]

---

৫০ মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিব, পৃ. ৮৩৭।

৫১ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮), পৃ.২৯৫।

৫২ Dr. Abul Fazal Haque, Constitution and Politices in Bangladesh : Conflict, Change and Stability, (Rajshahi : Rajshahi University Ph. D. Thesis, Unpublished), Pg. 47.

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাসী সরকার পরবর্তীতে বাংলাদেশকে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ১০ টি সেক্টরে বিভক্ত করে ৯ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। পরে ১১ নং সেক্টরও গঠিত হয় এবং প্রতিটি সেক্টর কতগুলি সাব-সেক্টরে (১নং সেক্টরে ৫টি, ২নং সেক্টরে ৮টি, ৩নং সেক্টরে ৯টি, ৪নং সেক্টরে ৬টি, ৫নং সেক্টরে ৭টি, ৬নং সেক্টরে ৬টি, ৭নং সেক্টরে ৭টি, ৮নং সেক্টরে ৮টি, ৯নং সেক্টরে ৭টি, ১১নং সেক্টরে ৮টি) বিভক্ত ছিল।[৫৩]

দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৪টা ২১ মিনিটে ঢাকার রেডকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও নিয়মিত বাহিনীর পক্ষে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার ও বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসনের অবসান ঘটে।[৫৪]

৩. বাংলাদেশী শাসন

মুজিব শাসনামল (১৯৭২-১৯৭৫)

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেডকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে নতুন দেশ বাংলাদেশের এর জন্ম হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলাদেশের যে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল স্বাধীন হওয়ার পর সে সরকার অনুযায়ী শাসন চলছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে আসেন। পরের দিন রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার স্থলে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা দেন। শ্রীঘ্রই তিনি ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা ঘোষণা দেন। এ সরকার ব্যবস্থায় বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী দেশের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম শিল্পমন্ত্রী এবং তাজউদ্দিন আহমদ অর্থমন্ত্রী হিসেবে দয়িত্ব গ্রহণ করেন[৫৫]

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে শাহ আব্দুল হামিদ স্পিকার এবং মোহাম্মদ উল্লাহ ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় দিনে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালে ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ড. কামাল হোসেন খসড়া সংবিধান বিল আকারে উত্থাপন করেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর এ সংবিধান কার্যকর হয়।

---

৫৩ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান খান, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব, (ঢাকা : সিটি লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯১), পৃ.১৩১-১৩৪।

৫৪ Mizanur Rahman Shelly, Emergence of a Nation in a Malti-Polar World: Bangladesh, (Washington : Washington D.C., 1978), Pg. 192.

৫৫ Talukder Maniruzzaman, Bangladesh Revolution, Pg. 165.

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ছিল চারটি। তা হল :

১। জাতীয়তাবাদ ২। সমাজতন্ত্র ৩। গণতন্ত্র ৪। ধর্মনিরপেক্ষতা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে মুসলিম আকীদা-বিশ্বাস চরমভাবে উপেক্ষিত হয়। এর ফলে ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতা এ সংবিধানের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ১৯৭৩ সালে ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল না থাকায় ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯২ টি আসন লাভ করে।[৫৬] স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করার কারণে আওয়ামী লীগের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস যতটা ছিল ক্রমে ক্রমে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের কর্মকান্ডে তা ভাটা পড়তে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল তা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও অনেকেই অস্ত্র জমা না দিয়ে তা দ্বারা ডাকাতি, রাহাজানি ও লুটতরাজ করে। ফলে সরকারের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুন্ন হতে থাকে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি সাধারণ মানুষকে হতাশ করে।

দারিদ্রপীড়িত জনতা অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করে। দশ আনা সেরের চাল হয় দশ টাকা, আট আনা সেরের আটা হয় আট-নয় টাকা।[৫৭]

রক্ষী বাহিনীর ক্ষমতার দর্প ও অত্যাচারে জনসাধারণ হয়ে পড়েন শঙ্কিত। সংঘটিত হয় অনেক বর্বরোচিত লোমহর্ষক ঘটনা। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেককেই মূল্যায়ন না করে তোষামোদকারী কতিপয় লোককে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ সব কারণে মুজিব সরকারের প্রতি জনগণের ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন হতে থাকে। এ অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশাল গঠন করেন। এর ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন এক সঙ্কটময় মুহূর্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক শ্রেণীর ঘাতক আইন ও বিচারকে উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। এভাবে মুজিব শাসনামলের অবসান ঘটে।[৫৮]

---

৫৬ আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, ৭০ থেকে ৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, (ঢাকা : পান্ডুলিপি, ডিসেম্বর ১৯৯১), পৃ. ৮৩।

৫৭ অলি আহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬১।

৫৮ আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬; অলি আহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

মোশতাক সরকার

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা ও মুজিব মন্ত্রীপরিষদের ডানপন্থী সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি দ্রুত মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন। এ পরিষদে মুজিব সরকারের ১৯ জন মন্ত্রীর ১১ জন এবং ৯ জন প্রতিমন্ত্রীর ৮ জন যোগদান করেন। খন্দকার মোশতাক ১৯৭৫ সালের ৩ অক্টোবর ঘোষণা করেন, দেশে পুনরায় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে আবার রাজনৈতিক কার্যক্রম চালু হবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু তার এ ঘোষণা কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন।[৫৯]

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। তিনি সামরিক বাহিনীর স্টাফ প্রধান মেজর জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেন এবং নিজে সামরিক বাহিনীর স্টাফ প্রধানের পদ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু মাত্র চার দিন পরে ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে তিনি দলবলসহ পরাজিত হন ও শেষ পর্যন্ত নিহত হন।[৬০]

জিয়াউর রহমানের শাসনামল (১৯৭৫ – ১৯৮১)

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সংঘটিত সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানে খালেদ মোশারফ নিহত হলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান (Chief of Army Staff) পদে পুনরায় নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হন। প্রথম দিকে তিনি সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর থেকে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁর সামরিক শাসনকাল বিস্তৃত ছিল। এ সময় তিনি রাজনৈতিক দলনিরেপেক্ষতা ও উদারনৈতিকতা, আইন-শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুশৃঙ্খল বাহিনীতে রূপান্তর, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কারণে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন।[৬১]

---

৫৯ ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ, পৌরবিজ্ঞানের কথা, (ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি., আগস্ট ১৯৯৬), পৃ. ৩৬০ ।

৬০ আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৬১ আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল জিয়াউর রহমান ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এর ফলে জিয়ার সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে দেশব্যাপী এক গণভোটের আয়োজন করা হয়। এতে জিয়াউর রহমানের প্রতি জনগণের আস্থা আছে কি-না, সে বিষয়ে ভোটারদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। ভোট ছিল হ্যা-না ভোট। এতে জিয়াউর রহমান হ্যা পক্ষে শতকরা ৯৮.৮৮ ভাগ ভোট পান।[৬২]

১৯৭৮ সালের ৩ জুন দেশে রাষ্ট্রপ্রতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে জিয়াউর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় তার ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবুস সাত্তার জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এর সঙ্গে আওয়ামী লীগ বিরোধী পাঁচটি দল (ন্যাপ-ভাসানী, মুসলিম লীগ, ইউ.পি. পি. লেবার পার্টি ও তপসিলী ফেডারেশন) মিলিত হয়ে "জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট" নামে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করে। জিয়াউর রহমান ছিলেন এদলের প্রার্থী। অপর দিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব জাতীয় জনতা পার্টি, ন্যাপ-মোজাফফর, সিপিবি, গণ-আযাদী লীগ ও পিপলস্ লীগ সমন্বয়ে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম.এ.জি ওসমানী ছিলেন এ জোটের প্রধান। আরো কয়েকজন প্রার্থী থাকলেও জিয়াউর রহমান ও ওসমানীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। ওসমানী ২১.৭ ভাগ ভোট পান।[৬৩]

১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টভুক্ত দলগুলোকে একীভূত করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন। জিয়াউর রহমান নিজে এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৬৪]

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ছোট বড় মোট ৩১ টি দল অংশগ্রহণ করে। ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭ টি আসন ও শতকরা ৪১ ভাগ ভোট পেয়ে বিএনপি বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ ৩৯ টি আসন ও শতকরা ২৫ ভাগ ভোট লাভ করে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে আবির্ভুত হয়। অন্যান্য দলগুলো অল্প সংখ্যক আসন লাভ করে।[৬৫]

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদে তা গৃহীত ও পাশ হয়। এ সংশোধনীতে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার, 'বাঙালি' এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' সংযোজিত হয়। ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, সংহতকরণ ও জোরদার করার নীতিও সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার নিকট জিয়াউর রহমান প্রিয়ভাজনে পরিণত হন।[৬৬]

---

৬২ আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

৬৩ Abdul Latif, Zia Regime, Pg. 116; Talukder Maniruzzaman, Bangladesh Revolution, Pg. 225.

৬৪ আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৬৫ আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

৬৬ আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে এক সেনা বিদ্রোহে নির্মমভাবে নিহত হন।[৬৭]

বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের শাসনামল (৩০ মে১৯৮১ – ২৪ মার্চ ১৯৮২)

জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পর সংবিধান অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সময়ের চীফ অফ স্টাফ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সহায়তায় তিনি সেনা বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।[৬৮]

সংবিধানের ধারা মোতাবেক তিনি রাষ্ট্রপতির শূন্যপদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সংবিধান অনুযায়ী ষষ্ঠ সংশোধনী পাশের মাধ্যমে নিজের প্রার্থিতা বৈধ করে নেন। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বিএনপির আব্দুস সত্তার এবং আওয়ামী লীগের ড. কামাল হোসেন।[৬৯]

এ নির্বাচনের পর দলের মধ্যে নানা ধরনের কোন্দল দেখা দেয় এবং বার্ধক্যজনিত কারণে আব্দুস সত্তার হিমসিম খেয়ে যান। এক মাসের মধ্যে দু'বার মন্ত্রিসভায় রদবদল করতে হয়। অবশেষে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তিনি সেনাবাহিনীর অনুকূলে ক্ষমতা ত্যাগ করেন।[৭০]

জেনারেল এরশাদের শাসনামল (১৯৮২ – ১৯৯০)

বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের দুর্বলতার সুযোগে জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে সামরিক আইন জারি করেন এবং সংসদ ভেঙ্গে দেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর আহসান উদ্দিনকে সরিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে সংবিধানের সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংশোধনী আনেন। দশম সংশোধনীতে তিনি জাতীয় সংসদে দশ বছরের জন্য ৩০ টি মহিলা আসন সংরক্ষিত করেন। প্রথম দিকে তিনি প্রশাসনকে সামরিকীকরণের দিকে ঝোকেন। পরে তিনি প্রশাসনকে বেসামরিক করার প্রতি আগ্রহী হন। ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ তিনি দেশব্যাপী হ্যাঁ- না গণভোট নেন। এতে এরশাদের পক্ষে ৯৪.১৪ ভাগ আস্থা ভোট পড়ে।[৭১] এরপর তিনি উপজেলা গঠন করে ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ উপজেলা নির্বাচন দেন। এভাবে তিনি ক্ষমতার ভিত মজবুত করেন। ১৯৮৩ সালে আহসান উদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে তিনি 'জনদল' গঠন করেন। এরপর ১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট গঠন করেন 'জাতীয় ফ্রন্ট'। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তিনি 'জাতীয় পার্টি' গঠন করেন এবং নিজে এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৭২]

---

৬৭ আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

৬৮ ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭ – ২০০০, (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০০১), পৃ. ৩৫৭।

৬৯ সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৭), পৃ. ৬৬৪-৬৬৫।

৭০ আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

৭১ আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

৭২ আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের ৭ মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে জাতীয়পার্টি ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসন লাভ করে বিজয়ী হয় এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ ৭৬টি আসন পায়। অন্যান্য দলগুলো যথাযথভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নি। এ নির্বাচনের পর বিরোধী দলগুলো এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আয়োজন করেন। প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। ফলে তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হন। তবে এ নির্বাচনকে সবাই প্রহসন বলে অভিহিত করে।[৭৩]

এরপর থেকে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামীসহ রাজনৈতিক দলগুলো দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। হরতাল, অবরোধ ও ধর্মঘটের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত করে তোলে। ১৯৯০ সালে এ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াত মিলে এরশাদের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীতে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন আহূত দেশব্যাপী চিকিৎসক ধর্মঘট চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির মোড়ে ডা. মিলন নিহত হন। ২৭ নভেম্বর রাতে সারাদেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয় এবং ঢাকা শহরে কার্ফ্যু জারি করা হয়। এর ফলে সাধারণ জনগণ ও ছাত্রজনতা মিলে আন্দোলন আরো তীব্র করে তোলে। ২৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একযোগে পদত্যাগ করেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও পদত্যাগ করতে শুরু করেন। অবশেষে ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ৬ ডিসেম্বর তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।[৭৪]

খালেদা জিয়ার শাসনামল (১৯৯১ – ১৯৯৬)

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বিএনপি ১৪০ টি, আওয়ামী লীগ ৮৮ টি, জাতীয় পার্টি ৩৫ টি, জামায়াতে ইসলামী ১৮ টি আসনে বিজয়ী হয়। বিএনপিকে জামায়াত সমর্থন করে সরকার গঠনে সহায়তা করে। বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী এবং আব্দুর রহমান বিশ্বাস প্রেসিডেন্ট হন। তিন বছর মোটামুটি ভালভাবে অতিবাহিত হলেও শেষের দুই বছর খালেদা জিয়া সরকারের শাসনামলে সরকার বিরোধী আন্দোলন দানা বাধে।

---

৭৩ ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবরের নির্বাচনে মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
৭৪ ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ মাগুরা – ২ আসনে উপনির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে বিরোধী দল সরকারের পদত্যাগ দাবী করে। ক্রমশ বিএনপি জামায়াতের মধ্যকার সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত মিলে আন্দোলন শক্তিশালী করে তোলে। তিন দল মিলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের দাবী জানায়। কিন্তু বিএনপি তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন ঘোষণা করে। বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বয়কট করে। বিএনপি এককভাবে বিজয়ী হলেও তা ফলপ্রসূ হয় নি। তিন দল মিলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন পাস করে ৩০ মার্চ খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন।[৭৫]

শেখ হাসিনার শাসনামল (১৯৯৬ – ২০০১)

১৯৯৬ সালের ১২ জুন বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সপ্তম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বিএনপি ১১৬ টি,আওয়ামী লীগ ১৪৬ টি, জাতীয় পার্টি ৩২টি ও জামায়াতে ইসলামী ৩ টি আসনে বিজয়ী হয়।[৭৬] সরকার গঠনে জাতীয় পার্টির একাংশ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির একাংশ মিলে 'ঐকমত্যের সরকার' নামে সরকার গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা এবং প্রেসিডেন্ট হন শাহাবুদ্দিন আহমদ। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে পুনরায় বাকশালী কায়দায় শাসন পরিচালনা শুরু করে। আলেম-ওলামাদেরকে গ্রেফতার, ইসলামী বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ ইত্যাদি কারণে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টির একাংশ এবং ইসলামী ঐক্যজোট মিলে চারদলীয় জোটের ব্যানারে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ধীরে ধীরে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। অবশেষে ১৫ জুলাই ২০০১ শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

---

৭৫ ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০।

৭৬ The Report of the Fair Election Monitoring Alliance (FEMA), July 1996, নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আর্থসামাজিক অবস্থা

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের জীবনকালের আর্থসামাজিক অবস্থাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

ক. স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের আর্থসামাজিক অবস্থা

খ. স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের আর্থসামাজিক অবস্থা

নিম্নে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের আর্থসামাজিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো :

ক. স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের আর্থসামাজিক অবস্থা

ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার অর্থনীতি ছিল অত্যন্ত পশ্চাদপদ এবং অনগ্রসর। ব্রিটিশ সরকার এদেশে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ডকে ভেঙ্গে দেয়। তারা এদেশের অর্থনীতির কলকাঠী নাড়াচাড়া করত। শাসকগোষ্ঠী ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিসহ সকল পর্যায়ে অরাজকতা কায়েম করেছিল। হিন্দু জমিদারগণ তাদের পদলেহন করে টিকে থাকলেও অধিকাংশ জনসাধারণ হচ্ছিল আর্থসামাজিকভাবে চরম নিগৃহীত ও বঞ্চিত। এম.এম আকাশ[৭৭] এর বর্ণনা মতে তৎকালীন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- স্থবিরতা, বৈষম্য, দারিদ্র্য, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও পুষ্টিহীনতা।[৭৮] অনাহারে, অর্ধাহারে ক্লিষ্ট বাংলার মানুষের মধ্যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। তারা ব্রিটিশ ও ব্রিটিশদের দোসর জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ফকীর আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, ফরায়েজী আন্দোলন এবং নীলবিদ্রোহ এসব আন্দোলনের মধ্যে প্রধান। বাংলার বিদ্রোহী জনতার আপ্রাণ সংগ্রামের ফলে ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাশ হয়। এ আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের হাতে এবং ১৫ আগস্ট ভারতীয় গণপরিষদের হাতে মাউন্ট ব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। উপমহাদেশ স্বাধীন হল। সৃষ্টি হল ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি আলাদা রাষ্ট্র। এভাবে ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেওয়া অর্থব্যবস্থার অবসান ঘটে।[৭৯]

বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান) পাকিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। কিন্তু এ দু'অঞ্চলের মধ্যে ছিল সহস্র মাইলের ব্যবধান এবং এর বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছিল বৈরী ভারত। ফলে দুই প্রদেশের ভৌগলিক অবস্থানের কারণেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। এ কারণে পূর্বপাকিস্তান আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ থেকে যায়।

---

৭৭ এম.এম আকাশ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।

৭৮ সিরাজুল ইসলাম সম্পা., বাংলাদেশের ইতিহাস, (১৭৫৭ – ১৯৭১, আর্থনৈতিক), (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ফেব্রুয়ারি ২০০০), পৃ. ১০৭।

৭৯ পিটার জে. মার্শাল, সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা : কোম্পানি আমল (প্রবন্ধ), সিরাজুল ইসলাম সম্পা., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালিদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করত। যেমন- কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক নিম্নরূপ :

- আদমজী, বাওয়ানী, আমীন, দাউদ প্রভৃতি কতিপয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আয়ের একটি বিরাট অংশ আসতো পূর্বপাকিস্তানে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে। অথচ তারা ট্যাক্স দিত পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হেড অফিসে। এ ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ইচ্ছা মাফিক কর নির্ধারণ করত।[৮০]
- পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের ব্যয় দিন দিন দ্রুত গতিতে বাড়তেছিল। যেমন ১৯৪৯ – ৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের হিস্যা ছিল ৫০.৫%। ১৯৬৯–৭০ সাল নাগাদ তা এসে দাড়ায় ৫৭.৪% এ।[৮১] কিন্তু এ ব্যয়ভার পূর্বপাকিস্তানের জনগণের সমানভাবে বহন করতে হত। অথচ পূর্বপাকিস্তানকে সার্বিকভাবে অবহেলিত রাখা হত।
- কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসূলভ আচরণের ফলে পূর্ববাংলার মানুষের জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যন্ত নিম্ন ও হতাশাব্যঞ্জক।
- পূর্ব পাকিস্তানের পাট, চা, চামড়া ইত্যাদি থেকে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার বেশির ভাগ অর্জিত হত। কিন্তু এ আয়ের সিংহভাগ খরচ হত পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে। পূর্বপাকিস্তান হত বঞ্চিত।
- বিদেশ থেকে যে ঋণ আসত তারও বেশির ভাগ খরচ হত পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ ঋণের বোঝা বাঙালিদেরও বহন করতে হত।
- ব্যাংক, বীমা, চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিরা ছিল অবহেলিত ও বঞ্চিত।
- পূর্বপাকিস্তানের যে সকল উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত, তার কোনটিই বাস্তবায়ন করা হত না।[৮২]

এ সব কারণে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে এদেশে হতাশাব্যঞ্জক আর্থসামাজিক অবস্থা বিরাজমান ছিল।

খ. স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের আর্থসামাজিক অবস্থা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে শরীফ সাহেবের ইনতিকালের বছর (২০০১ খ্রি.) পর্যন্ত বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হচ্ছিল। কিন্তু কাঙ্খিত লক্ষ্য থেকে তা ছিল অনেক অনেক পিছনে।

---

৮০ রেহমান সোবহান, বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি (প্রবন্ধ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৯।

৮১ World Bank, Bangladesh Development in a Rural Economy, (Washington D.C, Vol. 3, 1974), Pg. 883.

৮২ Harun-or-Rashid, The forshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim league and Muslim Politics, 1936 – 1987, (Dhaka : University Press Ltd., 1987), Pg. 328.

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের আর্থসামাজিক অবস্থা তুলে ধরা হলো :

জীবিকা নির্বাহের জন্য বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন উন্নতি করতে পারে নি। এর প্রধান প্রধান কারণগুলো হলো : পুরাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ, জমির উপরিভাগের বিচ্ছিন্নতা, উন্নত বীজ ও সারের অভাব, সেচ সুবিধার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমির উর্বরতা হ্রাস, কীটপতঙ্গের আক্রমণ, ঋণের সমস্যা, ভূমির মালিকানার উপযুক্ত সংগঠনের অভাব ইত্যাদি। বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্য শষ্যের মধ্যে ছিল- ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, যব, ভুট্টা, আলু, ফলমূল, শাক-সবজি, মশলা ইত্যাদি। অর্থকরী ফসলের মধ্যে ছিল পাট, চা, আখ, তামাক, তুলা, রেশম, রাবার ইত্যাদি। ১৯৭১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছরে কৃষি ক্ষেত্রে দেশের পরিসংখ্যানে যে চিত্র দেখা গেছে তা অনেকাংশে হতাশাব্যঞ্জক। যেহেতু দেশের সংখ্যাগুরু লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, সুতরাং দেশের আর্থসামাজিক পশ্চাপদতার জন্য কৃষি ক্ষেত্রে অনুন্নতি বহুলাংশে দায়ী। আমাদের জাতীয় আয়ের ৪০ ভাগ আসত কৃষি থেকে। কিন্তু শতকরা ৬০ ভাগ শ্রম শক্তি কৃষিতে নিয়োজিত। এ কারণেও কৃষি খাতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে ভর্তুকি দিতে হত।[৮৩]

জাতীয় আয়ের ১০ ভাগ আসত শিল্প থেকে। এ পরিমাণ আমাদের দেশের কাঙ্খিত উন্নয়নের জন্য মোটেই আশাব্যঞ্জক ছিল না। শিল্পে অনগ্রসরতার প্রধান প্রধান কারণের মধ্যে রয়েছে- পুজির স্বল্পতা, খনিজ ও শক্তি সম্পদের অভাব, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, উদ্যোক্তার অভাব, শিল্প ঋণের সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, দক্ষ পরিচালকের অভাব, সুষ্ঠু শিল্পনীতি ও পরিকল্পনার অভাব ইত্যাদি।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুনীতির অভাবে স্বাধীনতার পর থেকে ৩০ বছর অতিক্রান্ত হলেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করতে পারে নি। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের ধারাবাহিকতায় এখানে ধনীরা ক্রমশ ধনী এবং গরিবরা ক্রমশ গরিব হচ্ছিল। দেশের মধ্যে অস্থিরতা ও নৈরাজ্যের কারণে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা অনেক ক্ষেত্রে অনাগ্রহ প্রদর্শন করেছে। ফলে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার কাঙ্খিত উন্নতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও) এ দেশের মানবসম্পদ ব্যবহার করে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দিন দিন উন্নতি করছিল। তবে তাদের উন্নতির ছোয়া সাধারণ জনগণের গায়ে তেমন লাগে নি।[৮৪] বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে ধীরে ধীরে শিক্ষার হার বৃদ্ধির ফলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং শিক্ষিত সমাজের লোকেরা উন্নতি অগ্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল।

---

৮৩ নাসির উদ্দিন আহমেদ ও ড. মোহাম্মদ তারেক সম্পা., উন্নয়ন অর্থনীতি : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩), পৃ. ১০৩।

৮৪ প্রফেসর মো. আবদুল হামিদ, আধুনিক অর্থনীতি, (ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা.) লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪), পৃ. ৩১১ – ৩১৯।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে জনসাধারণ তিন ভাগে বিভক্ত ছিলেন। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। ব্রাহ্মণগণ, বড় বড় ব্যবসায়ীগণ, পীর মাশায়েখগণ, জমিদারগণ ও উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তাগণ উচ্চবিত্তের অন্তর্গত। তারা সুরম্য প্রাসাদে বসবাস করতেন। তাদের অনেকেই আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকতেন বেশির ভাগ সময়। তাদের স্ত্রী-কন্যারা মূল্যবান পোষাক ও স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত থাকত।[৮৫]

সাধারণ ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক, কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী ও সাধারণ আলেমগণ ছিলেন মধ্যবিত্তের অন্তর্ভুক্ত। মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে এরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাদের জীবনযাত্রা ছিল সুন্দর ও সাচ্ছন্দ্যময়।

অর্থনৈতিক কারণে দেশের অধিকাংশ জনগণ ছিল নিম্নবিত্তের অন্তর্ভুক্ত। কৃষক, তাতী, জেলে, নাপিত, দরজী, ধোপা, কশাই, কামার, কুমার, কুলি, দিনমজুর প্রভৃতি পেশার লোক এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত। এরা অভাব-অনটনে জর্জরিত ছিল।

---

৮৫ ড. আব্দুর রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২), পৃ. ২৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ধর্মীয় অবস্থা

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির এর সময় বাংলাদেশে প্রধানত চারটি ধর্ম প্রচলিত ছিল। ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্ট্রান ও বৌদ্ধ ধর্ম। তন্মধ্যে ইসলাম ধর্মের অনুসারীই ছিল শতকরা নব্বই ভাগ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবদ্দশায়ই ভারতবর্ষে ইসলাম আগমন করেছে। মহানবী (স) এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে ইসলাম প্রসার লাভ করে।[৮৬] পরবর্তীকালে পীর-মাশায়েখ সূফী-দরবেশদের মাধ্যমে বাংলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা পায়। এ কারণে বাংলাদেশকে পীর-আওলিয়ার দেশ বলা হয়ে থাকে।[৮৭] পীর দরবেশগণ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে দরগাহ ও খানকাহ স্থাপন করেন। তাদের খানকাহ ও দরবারে দূর-দুরান্ত থেকে লোকজন এসে দ্বীনের দীক্ষা লাভ করতেন। শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির এর সময় বাংলাদেশে দক্ষিণাঞ্চলে ছারছীনার শায়খ শাহ নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) (১৮৭৩-১৯৫২) চরমোনাইর মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এসহাক (রহ) (১৯০৫-১৯৭৩) ও ফরিদপুরের মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ) (১৮৯৮-১৯৬৮) ছিলেন বিখ্যাত ওলী ও ধর্মপ্রচারক। তাঁরা দেশের আনাচে কানাচে পরিভ্রমণ করে তাবলীগ ও দ্বীনের অসাধারণ খেদমত করে গিয়েছেন। তারা সারাদেশে মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, খানকাহ ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন।[৮৮]

এছাড়া ও বাংলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চলে অসংখ্য আলিম, বুজুর্গানে দ্বীন, ওলী দরবেশ ও সাধারণ মুবাল্লিগদের মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই ইসলামের অনুসারীর সংখ্যাই ছিল বেশি। ইসলামের অনুসারীদের মাধ্যে শিয়া[৮৯] ও সুন্নী[৯০] দু'টি সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তবে সুন্নী সম্প্রদায়ের লোকই তুলনামূলকভাবে বেশি ছিলেন।

---

৮৬ নাসির হেলাল, বাংলাদেশে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল – জুন ২০০০), পৃ. ৭৫।

৮৭ মো. মাসুম আলীম, হযরত খান জাহান আলী : জীবন ও কর্ম, (রাজশাহী : আল মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২০০২), পৃ.২৩ ।

৮৮ উপসম্পাদকীয় , দৈনিক ইনকিলাব, ০৩-০৮-২০০১।

৮৯ শীয়া : শীয়া শব্দের অর্থ সহচর, অনুসারী, সাহায্যকারী, শিষ্য ইত্যাদি। পরিভাষায় শীয়া এমন একটি সম্প্রদায়কে বলে, যারা হযরত আলীকে (রা) সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে কতিপয় লোক হযরত আলীকে (রা) উলুহিয়াতের পর্যায়ে পৌছে দেয়। তাদের কেউ কেউ হযরত আলীকে (রা) নবী করীম (স) এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করে।
আল্লামা মুগনিয়া বলেন, শীয়া ঐ সম্প্রদায়কে বলে, যারা হযরত আলীকে (রা) মহব্বত করে, তাঁকে মুরব্বি মনে করে এবং তাঁর অনুসরণ করে।
দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, ফাতাওয়া ও মাসাইল, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০১), পৃ. ৭৪।

৯০ সুন্নী : সুন্নী হলেন তারাই, যারা প্রকৃত পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী। রাসুলল্লাহ (স) এর সুন্নাতের (তরীকার) অনুসারী বলে তাদেরকে সুন্নী বলা হয়।
দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

সুন্নীরা অধিকাংশই হানাফী,[৯১] শাফিঈ[৯২] মালিকী[৯৩] ও হাম্বলী[৯৪] এই চার মাযহাবের যে কোন এক মাযহাবের অনুসারী। আবার কতিপয় মুসলিম ছিলেন যারা কোন মাযহাবেরই অনুসারী নন। তাদেরকে বলা হয় আহলে হাদীস।[৯৫] উল্লিখিত মুসলিম সম্প্রদায়গুলো ছিলেন প্রকৃত ইসলামের অনুসারী। এছাড়াও বাংলাদেশে ইসলামের নামে কতিপয় কুফরী মতবাদের অনুসারীও লক্ষণীয় ছিল। যেমন- কাদিয়ানী,[৯৬] বাহাই,[৯৭] আগাখানী ইত্যাদি। এসব সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে তাদের নিকৃষ্ট ধর্মমতের দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করত।

---

৯১ হানাফী : সুন্নী মুসলমানদের বেশির ভাগ লোকই তাকলীদের অনুসারী। তারা চারটি মাযহাবের যে কোন একটিকে মেনে চলেন। চারটি মাযহাবের মধ্যে একটির নাম হানাফী মাযহাব। এ মাযহাবের অনুসারীদেরকে হানাফী বলা হয়। ইমাম আবূ হানিফা নুমান বিন সাবিত (রহ) এই মাযহাবের প্রবর্তক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে এই মাযহাব বেশি সমাদৃত। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশের লোকেরা অধিকাংশই হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৯২ শাফিঈ : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের একটি ফিকহী মাযহাবের নাম শফিঈ মাযহাব। ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রিস হলেন এই মাযহাবের প্রবর্তক। হিযায, বাগদাদ, খুরাসান, তুরান, সিরিয়া, ইয়ামন প্রভৃতি দেশে এই মাযহাবের অনুসারী বেশি। বাংলাদেশেও এ মাযহাবের কতিপয় অনুসারী রয়েছেন।

দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

৯৩ মালিকী : ইমাম মালিক ইবন আনাস (রা) যে মাযহাব প্রবর্তন করেন, তার নাম মালিকী মাযহাব। হিজরি তৃতীয় শতকে মদীনা মুনাওয়ারায় এই মাযহাবের উৎপত্তি হয়। এরপর মিসর, বসরা, আফ্রিকা, স্পেন, সিসিলী, সুদান প্রভৃতি দেশে এর বিকাশ ঘটে। বাংলাদেশের স্বল্প সংখ্যক মুসলমান এ মাযহাবের অনুসারী।

দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

৯৪ হাম্বলী : ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) যে মাযহাবের প্রবর্তন করেন, তাকে হাম্বলী মাযহাব বলে। প্রথমে বাগদাদে এ মাযহাবের উৎপত্তি হয় এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ মাযহাবের অনুসারী ছড়িয়ে পড়েন।

দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

৯৫ আহলে হাদীস : আহলে হাদীস শব্দের অর্থ হাদীসের ধারক বাহক। মুসলমানদের মধ্যে যে সম্প্রদায়ের লোকেরা কেবল কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই শরীআতের বিধান পবর্তন ও অনুসরণের পক্ষপাতী তাদেরকে আহলে হাদীস বলা হয়। এরা ইজতিহাদের মাধ্যমে মাসআলা নির্ধারণের পক্ষপাতী নন।

৯৬ কাদিয়ানী : ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদী শাসকদের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনায় মুসলিম জাতিকে তাঁদের ধর্মীয় চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামের নাম দিয়ে একটি কুফরী মতবাদের জন্ম নেয়। এ সম্প্রদায়ের নেতা হলো মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। কাদিয়ানীর অনুসারীরা নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় দাবী করলেও তারা কাফির। কাদিয়ানীদের বিশ্বাস হলো : হযরত ঈসা (আ) এর রুহ মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। তাই সে ইমাম মাহদী। তারা আরো ধারণা করে, আল্লাহর সত্তা তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। তারা মহানবীকে (স) শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করে না। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে তারা নবী দাবী করে।

দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

৯৭ বাহাই : উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে মীর্যা হোসাইন আলী নামক এক ব্যক্তি নিজেকে বাহাউল্লাহ বা আল্লাহর জ্যোতি বলে দাবী করে। সে ইসলামের নাম দিয়ে একটি ধর্মমত চালু করে। উক্ত ধর্মের নাম বাহাই ধর্ম। বাহাইদের ধর্ম বিশ্বাস কাদিয়ানীদের চেয়েও জঘন্য। বাহাইরা দাবী করে মীর্যা হোসাইন আলীর মধ্যে আল্লাহ প্রবেশ করেছে। তাদের এ মতবাদ কুফরী।

দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ধীরে ধীরে এসব কুফরী মতবাদের অনুসারীরা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। দেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাদের বিরোধিতা করলেও সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি। স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে এদেশে মুসলমানরা শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করে আসলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী অনুশাসনের প্রয়োগ তেমন ছিল না বললেই চলে। তবে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকেই কয়েকটি ইসলামী সংগঠন রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। আশির দশকে এসে এ ধরণের সংগঠনের সংখ্যা এবং কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া বাংলাদেশের পীর-মশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদরা বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠনের অধীনে ইসলামের বিধি-বিধান অনুশীলন করে ইসলামী আদর্শকে পুনর্জীবিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ তাবলীগী সমাবেশের ময়দান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে অবস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন দেশের ধর্মপ্রাণ লোকেরা এদেশে এসে ইসলাম প্রচার ও আমলের প্রশিক্ষণ নিতেন। ফলে এদেশের মুসলমানদের মধ্যে নেক আমলের চেতনা জাগ্রত হত। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ইসলামের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা চালু ছিল। কিন্তু তা ছিল নামে মাত্র। তবে ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকেই বাংলাদেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী মাদরাসায় পড়াশুনা করে দ্বীন ইসলামের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করে খাঁটি মুসলিম হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেন। ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা ছিল সন্তোষজনক। মুসলামানগণ শবেবরাত, শবেকদর, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, ঈদে মিলাদুন্নবী, মহররম, শবে মিরাজ ইত্যাদি ধর্মীয় দিবস ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করতেন।

তখনকার বাংলাদেশী হিন্দু সমাজ ছিল বহু বর্ণে বিভক্ত। তবে চারটি গোত্র ছিল প্রধান। গোত্র চারটি হলো : ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষৈত্রিয় ও শুদ্র। তবে পুরানে উল্লিখিত হিন্দু ধর্মের ৩৬টি বর্ণের লোকই বাংলাদেশে বিদ্যমান ছিল। হিন্দুদের পূজা-পার্বণ নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পালিত হত। খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরাও তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অবাধে পালন করতেন। দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থা

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের জীবনকালে (১৯২১ – ২০০১) উপমহাদেশে প্রধানত দুই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল।

১. সাধারণ শিক্ষা

২. মাদরাসা শিক্ষা

১. সাধারণ শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষা বলতে আমাদের দেশে প্রচলিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বুঝায়। এ শিক্ষা ছয়টি স্তরে বিন্যস্ত ছিল। তা হলো :

ক) প্রাথমিক : প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৫ বছর।

খ) মাধ্যমিক : ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৫ বছর।

গ) উচ্চ মাধ্যমিক : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী ২ বছর।

ঘ) স্নাতক : ২/৩ বছর।

ঙ) স্নাতক (সম্মান) : ৩/৪ বছর।

চ) স্নাতকোত্তর : ১/২ বছর।

ভারতীয় উপমহাদেশে পর্তুগীজ ধর্মযাজকগণ সর্বপ্রথম এ ধরণের শিক্ষা প্রবর্তন করে। ধর্মযাজকগণ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য এ দেশে ইউরোপীয় আদর্শে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পর্তুগীজদের পরে আসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ইউরোপীয়দের পরাজিত করে তারা প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করে। খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৬৬৮ সালে কোম্পানি আইন সনদ প্রবর্তন করে তারা পার্লামেন্টে মিশনারি বিষয়ক একটি ধারা সন্নিবেশ করে। এ ধারায় বঙ্গ-ভারত-পাকিস্তানে ইংরেজ বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে ধর্মযাজক নিযুক্ত করতে এবং শিক্ষা প্রচারের জন্য স্কুল স্থাপন করতে বলা হয়। এর ফল উপমহাদেশে মিশনারিদের শিক্ষামূলক কার্যকলাপ খুব বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৯৮]

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক ভাগে বাংলাদেশ অঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ১৯২১ সালে উচ্চ শিক্ষার সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯৯] নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩–১৯২৯)-এর অক্লান্ত চেষ্টায় এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

---

৯৮ মোহাম্মদ মুমিন উল্লাহ, শিক্ষার ইতিহাস, (নোয়াখালী : আল হেলাল বুক হাউস, ১৯৮৬), পৃ. ২৫৯।

৯৯ M. A Rahim, The History of the University of Dhaka, (Dhaka : Dhaka University Publication, 1981), Pg. 266.

Dhaka University Institutional Repository

এর পর ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৭০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে স্বাধীনতার পূর্ব থেকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮৫ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৯৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ আমল থেকে প্রতিটি বড় শহরে এক বা একাধিক কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে আসছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে প্রায় প্রতিটি গ্রামে একটি বা একাধিক করে। ১৯৯৮–৯৯ সালের পরিসংখ্যান রিপোর্টে দেখা যায় সারা দেশে মোট ৬৫৬১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৪০৬৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২২৮৮ টি কলেজ, ১৬ টি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ, ৬ টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৪২ টি ল কলেজ, ৪ টি কৃষি কলেজ, ১৩ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩ টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ৫৪ টি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ২১ টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে।[১০০]

স্বাধীনতা পূর্ব থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার বার বার পরিবর্তন এসেছে। ১৯৪৯ সালের ১৬ মার্চ তৎকালীন সরকার শিক্ষা সমস্যাকে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা আকরাম খাঁর সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পূর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পূনর্গঠন কমিটি গঠন করে। এ কমিটি প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা, নারী শিক্ষা, ইসলামী শিক্ষা, সংখ্যালঘু ধর্মীয় শিক্ষা, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার সুপারিশ করে। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান সরকার জনাব এস.এম. শরীফকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশন দেশে স্বাধীনতা ও সংহতির সাথে সমাঞ্জস্য রেখে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করে।[১০১] ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে 'নতুন শিক্ষানীতি' প্রণয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা হয়।[১০২] ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে উপেক্ষা করার বিষয়টি লক্ষণীয়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 'ইকরা' শব্দটি বাদ দেওয়া। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত অপসারণ করা এবং কবি নজরুল ইসলাম কলেজের নাম পরিবর্তন করে কবি নজরুল কলেজ রাখা হয়।

---

১০০ 2000 Statislical Yearbook of Bangladesh, (Dhaka : Bangladesh, Bureau of Statistics, 21st Edition), Pg. 497.

১০১ Government of Pakistan, Ministry of Education, Report of the Commission in East Pakistan, 1959, Pg-223.

১০২ Government of Pakistan : Report of the "New Educantion Policy" 1969, Pg. 126.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালে এক আদেশে ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' নামে একটি কমিশন গঠন করা হয়।[১০৩] কমিশনের সদস্যরা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত সফর করে ১৯৭৪ সালে একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। এতে ইসলামী চেতনা বিবর্জিত সেক্যুলার শিক্ষা চালু করার কথা বলা হয়।[১০৪] এ শিক্ষা কমিশনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরোপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়। ১৯৭৯ সালে জনাব আব্দুল বাতেন ও পরে কাজী জাফর আহমদকে সভাপতি করে 'শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হলে তা কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে নি। ১৯৮৩ সালে ড. আবদুল মজিদ খানের নেতৃত্বে 'মজিদ খান কমিটি' কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিশনে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদকে চেয়ারম্যান করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়। এ কমিশনে ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবিক ও নৈতিকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। ১৯৯৭ সালে প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে পুনরায় কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য সুপারিশ করা হলে তা বাস্তবায়িত হয় নি। সর্বোপরি, বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা বার বার পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেওয়া হলেও তার অধিকাংশ পদক্ষেপই বাস্তবায়িত হয় নি। এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রকৃত অর্থে কল্যাণমুখী বলা যায় না।

মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমল থেকে দুই ধরনের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। ক. আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা খ. কওমী মাদরাসা শিক্ষা।

ক. আলিয়া মাদরাসা

১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মাদরাসার অনুকরণে এ দেশে যে সকল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরবর্তীতে তা আলিয়া মাদরাসা হিসাবে পরিচিত লাভ করে।[১০৫] আলিয়া মাদরাসার ৫ টি স্তর রয়েছে। ১. ইবতেদায়ী স্তর; ২. দাখিল স্তর; ৩. আলিম স্তর; ৪. ফাযিল স্তর ও ৫. কামিল স্তর।

আলিয়া মাদরাসাগুলো সরকার নিয়ন্ত্রিত ও অনুদানভুক্ত। ১৯৮৫ সালের পূর্বে আলিয়া মাদরাসা থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের সমমান দেওয়া হত না। ১৯৮৫ সালে দাখিলকে এসএসসির সমমান এবং ১৯৮৭ সালে আলিমকে এইচএসসির সমমান দেওয়া হয়। ফাযিল ও কামিল এখনও বিএ ও এমএ-এর সমমান সর্বক্ষেত্রে দেওয়া হত না।

---

১০৩ এ.কে.এম আজাহারুল ইসলাম ও শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, (যুক্তরাজ্য : দি ইসলামিক একাডেমী, কেম্ব্রিজ, ২০০৩), পৃ. ৪।

১০৪ Government of Bangladesh : Report of the Education Commission, Dacca, 1974, Pg.132.

১০৫ এ.কে.এম. আজহারুল ইসলাম ও শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬; Dr. Sekandar Ali Ibrahimy, Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal (1861 – 1977), (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1985), Pg. 286 – 289.

Dhaka University Institutional Repository

আলিয়া মাদরাসায় কুরআন, হাদীস, আরবি সাহিত্য, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ ইত্যাদির পাশাপাশি, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি সাধারণ বিষয়গুলো পড়ানো হয়। তবে উচ্চ স্তরে এখনো আধুনিক বিষয়াবলি যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। ১৯৯৪-৯৯ বছরের পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে, সারাদেশে ৪৮৩৯ টি দাখিল মাদরাসা, ৯৬৯ টি আলিম মাদরাসা, ৯৫৩ টি ফাযিল মাদরাসা এবং ১২৬ টি কামিল মাদরাসা ছিল।[১০৬]

খ. কওমী মাদরাসা

১৮৭০ সাল থেকে উত্তর-ভারতের দেওবন্দ, সাহারানপুর, মুরাদাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহের অনুকরণে এ দেশে যে মাদরাসাগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে তাকে কওমী মাদরাসা বা দরসে নেজামী মাদরাসা বলে।[১০৭] এ মাদরাসাগুলোতে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, আরবি, উর্দু, ফার্সি পাঠদান করা হয়। বাংলা, ইংরেজি, গণিত ইত্যাদি সাধারণ বিষয় কওমী মাদরাসায় সাধারণত গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয় না। শরীফ সাহেবের জীবনকালে বাংলাদেশে দশ হাজারেরও বেশি কওমী মাদরাসা ছিল। এছাড়া মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের সময় বাংলাদেশে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, সাটেলাইট স্কুল, কমিউনিটি স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ব্রাক স্কুল, প্রশিকা স্কুল, বেইস পরিচালিত ফিডার স্কুল, কারিতাস পরিচালিত স্কুল এবং আর.ডি.আর.এস পরিচালিত স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার সুযোগ ছিল।[১০৮]

সাংস্কৃতিক অবস্থা

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে অনেক পূর্ব থেকে দুইটি ধারা প্রবাহিত ছিল। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের বেশিরভাগই বাঙালি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা নববর্ষ, বাসন্তী উৎসব, শরৎকালীন উৎসব, পৌষ মাসে শীতকালীন উৎসব ইত্যাদি পালন করতেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসে থার্টি ফার্স্ট নাইট পালনের রেওয়াজও ছিল লক্ষণীয়। ধার্মিক মুসলমানরা এসবের প্রতি আগ্রহী নন। তারা মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব যেমন- ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, ঈদে মিলাদুন্নবী (স.), শবে মিরাজ, শবে কদর, শবে বরাত, আশুরা, আখেরী চাহা শোম্বা, ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম ইত্যাদি দিবস সানন্দ চিত্তে পালন করতেন। ঈদ উৎসব সব ধরনের মুসলমানদের পালন করতে দেখা যেত। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার সাচ্ছন্দে পালন করত। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতেন, মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে সালাম বিনিময় করতেন। সুখের সংবাদ শুনলে মুসলমানগণ আলহামদুলিল্লাহ, দুঃখের সংবাদ শুনলে ইন্নালিল্লাহ বলতেন। আলিঙ্গন, করমর্দন ইত্যাদি ইসলামী সংস্কৃতি সমাজ প্রচলিত ছিল।

---

১০৬ 2000 Statestical Yearbok of Bangladesh, (Dhaka : Bangladesh Bureau of Slatistics, 21st Edition), Pg. 497.

১০৭ এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

১০৮ এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০ –৩১।

Dhaka University Institutional Repository

পোষাক-পরিচ্ছদেও দুইটি ধারা লক্ষণীয় ছিল। মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেছেন তারা পাজামা-পাঞ্জাবি পরতেন। মুরব্বীরাও এ ধরনের পোষাক পরতেন। সাধারণ শিক্ষিতদের অনেকেই প্যান্ট-সার্ট পরতেন। শ্রাবণ ১৩২৭ বঙ্গাব্দের 'আল-এসলাম' মাসিক পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এভাবে, "সাধারণ শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ অনুকরণে পোষাক পরিচ্ছদ-কোট প্যান্ট, সার্ট ব্যবহার করা, ইংরেজ ফ্যাসনে কলার নেকটাই ধারণ করা, হুক্কা-তামাক ছেড়ে সিগারেটের ধূমোদগারণ করা, আহারের সময় ফরস এর স্থলে চেয়ার-টেবিল, হাতের পরিবর্তে কাটা চামুচ, চুড়ি ব্যবহার ধরেছে। আর এদিকে হিন্দুর অনুকরণে আচকন পায়জামার পরিবর্তে ধুতি, চাদর, টুপির স্থলে নগ্নমস্তক, টেরি কেটে রমণীসুলভ নানা প্রকারের চুল বাহার করে বেড়ানো আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন বলে নির্ধারিত হয়েছে।[১০৯] বেশির ভাগ মেয়েরা শাড়ি ব্লাউজ পরত। অনেকে আবার কামিজ, ফ্রোক ও পায়জামা পরিধান করত। ছোট বালিকারা এ ধরনের পোষাক বেশি পরত। মহলিারা পরদা রক্ষার্থে বোরকা পরত। আবার শহরে কিছু কিছু মেয়েরা পুরুষের ন্যায় সার্ট প্যান্টও পরত।[১১০]

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশীদের প্রধান খাদ্য ভাত। এ প্রসঙ্গে নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন, "ইতিহাসের উষাকাল হতেই যে দেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন ফসল ধান সে দেশের প্রধান খাদ্যই হবে ভাত তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভাত ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কার অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। উচ্চ কোটির লোক হতে নিম্ন কোটির লোক পর্যন্ত সকলের প্রধান ভোজ্য বস্তু ভাত।"[১১১]

পূর্ববর্তী কালে এদেশে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যেত। সে জন্য এদেশের মানুষকে মাছে-ভাতে বাঙালি বলা হত। পুটি, রুই, কাতলা, শোল, বোয়াল মাছ ছিল বাঙালিদের প্রিয় খাদ্য। ফল-ফসলাদির মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, তাল, নারিকেল ছিল বাঙালিদের অন্যতম খাদ্য। পান সহযোগে সুপারী গ্রহণ অনেকের নিকট ছিল অতি প্রিয়। খেলাধূলার মধ্যে হা-ডু-ডু এ দেশীয়দের ঐতিহ্যবাহী খেলা। ধীরে ধীরে ফুটবল, হকি, কাবাড়ি, ক্রিকেট ইত্যাদি জনপ্রিয়তা লাভ করে ছিল। গ্রামের ছেলেমেয়েরা কানামাছি, গোল্লাছুট, লুকোচরি ইত্যাদি খেলতে ভালবাসত।

---

১০৯ মুস্তফা নুর-উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৭২।
১১০ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, (কলিকাতা : ১৩৫৯), পৃ. ৪৪১।
১১১ নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের জীবনী

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভা। তার গোটা জীবনই ছিল জ্ঞানার্জন ও সে আলোকে মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বানের কাজে নিয়োজিত। তার কর্মময় জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নরূপ। এ অধ্যায়ে তাঁর জন্ম, বংশ পরিচয়, শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন, দাম্পত্য জীবন, কর্মজীবন, জাতীয় পর্যায়ে কর্তব্য পালন, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অবদান, শিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবায় অবদান, দ্বীনী তাবলীগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কাব্য প্রতিভা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিচিতি

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ৯ মাঘ বঙ্গাব্দ; ১৩ জুমাদাল উলা ১৩৩৯ হিজরি; ২৩ জানুয়ারি ১৯২১ ঈসায়ী সনে বৃহত্তর বরিশালের ঝালকাঠী জেলার অন্তর্গত রহমতপুর (সাবেক রামানাথপুর) গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ আবদুল কাদির। শরীফ তাঁর বংশগত উপাধি।[২] পুরা নাম শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির। তাঁর ডাকনাম ছিল আবুল খায়ের। স্নেহময়ী মা ফখরুন্নেছা তাঁকে এ নামেই ডাকতেন। তবে 'শরীফ সাহেব' হিসাবেই তিনি সর্বজন পরিচিত ছিলেন।[৩]

---

১ মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪) পৃ. ১২১; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির (রহ) : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৪), পৃ. ৪৩; শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির : পারিবারিক পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ) পৃ. ১; রুহুল আমীন খান, আল্লামা শরীফ আবদুল কাদির (রহ) : একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন, দৈনিক ইনকিলাব, ০৩.৮.২০০২, পৃ.১১; শরীফ মুহাম্মদ মুনীর,নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান সাধক, অধ্যক্ষ শরীফ আবদুল কাদির, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১-৮-২০০২, পৃ. ১১; মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (রহ) : জীবন ও কর্ম, (রাজশাহী : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ থিসিস (অপ্রকাশিত), পৃ. ৪০।

২ শরীফ (شريف) শব্দটি আরবি شرف শব্দ থেকে উদ্গত। অর্থ নম্র, ভদ্র, মার্জিত, রুচিশীল ইত্যাদি।

৩ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের কর্মস্থল ছিল ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা। এ মাদরাসায় তিনি প্রথমে প্রভাষক, অতঃপর মুহাদ্দিস এবং সব শেষে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ছারছীনা মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক এবং ছারছীনা দরবার শরীফের হাজার হাজার ভক্ত ও মুরীদানের নিকট তিনি 'শরীফ সাহেব হুজুর' হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পিতার নাম মাওলানা আবদুল আলী (১৮৮৫-১৯৩০)। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের নামকরা আলেম।[৪] তিনি বানারীপাড়া হাই স্কুলের প্রধান মৌলভী হিসাবে দীর্ঘদিন যাবত কর্মরত ছিলেন। গ্রাম্য সালিশিতে তিনি ছিলেন বিশেষ দক্ষ ও পরিচিত ব্যক্তি। ইতিহাস থেকে জানা যায়, শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের পূর্বপুরুষ সুদূর বাগদাদ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইসলাম প্রচারের জন্য এ দেশে আগমন করেন। শেখ আইনুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি ধর্ম প্রচারের জন্য এ অঞ্চলে আগমন করে ঝালকাঠী জেলার রামানাথপুর গ্রামে একটি ছোট্ট জমিদারী নিয়ে বসবাস শুরু করেন। তাঁর ছেলের নাম শেখ বুরহানুল্লাহ। তিনি এ অঞ্চলের নামকরা জমিদার ছিলেন। তিনি তখনকার সময়ের বিখ্যাত খন্দকার[৫] বংশে বিবাহ করেন। শেখ ও খন্দকার বংশের মিলনের ফলে তাদের পরবর্তী বংশধরগণ শেখ থেকে শরীফে পরিবর্তিত হন।[৬]

বুরহানুল্লাহর পুত্রের নাম পাঞ্চতন শরীফ। তিনি বিখ্যাত আবেদ ও কামেল ওলী ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি মসজিদে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর পুত্র চাদ শরীফ, যিনি গ্রাম্য সালিশদার ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তি ছিলেন। চাদ শরীফের পুত্র মাওলানা আবদুল আলী; যিনি মাওলানা শরীফ আবদুল কাদিরের পিতা।[৭]

জন্মস্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের জন্মস্থান রহমতপুর। এর পূর্বনাম ছিল রামানাথপুর। এটি ঝালকাঠি জেলার অন্তর্গত একটি ছোট্ট গ্রাম। ঝালকাঠি বরিশাল বিভাগের একটি অন্যতম জেলা।[৮] স্বাধীনতার পর থেকে এটি বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ জেলার মহাকুমা ছিল।[৯] ১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এটি জেলায় উন্নীত হয়।[১০] ঝালকাঠির পূর্বনাম মহারাজগঞ্জ। জেলাটি ২২°২০″ থেকে ২২°৪৭″ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০°০১″ থেকে ৯০°২৩″ পশ্চিম দ্রাঘিমায় অবস্থিত।[১১]

---

৪ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের পিতা আবদুল আলী তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে জামাত উলা পাশ করেন। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

৫ প্রাচীনকাল থেকে এ উপমহাদেশে পাঁচটি অভিজাত বংশ বিখ্যাত ছিল। ক. শেখ; খ. সৈয়দ; গ. মোঘল; ঘ. পাঠান; ঙ. খন্দকার।

৬ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ.১.; মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯।

৭ শরীফ মুনীর এর সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য; ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (রহ) : জীবন ও কর্ম (৩১ জুলাই ২০০৩ইং তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ), পৃ. ২।

৮ বরিশাল বিভাগের মোট ৬টি জেলা। ক. বরিশাল; খ. ঝালকাঠি; গ. পিরোজপুর; ঘ. পটুয়াখালী; ঙ. ভোলা; চ. বরগুনা।

৯ Bangladesh Population Cencus-1991, District- Jalkati, Bangladesh Barueau of Statistics, Pg. 176.

১০ সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১১শ খন্ড, ১৯৮৮), পৃ.৭১৭।

১১ এস.এম.এ ভূইয়া টিটন, টিটনস্ মানচিত্রে বিশ্বপরিচিত ও বাংলাদেশ পরিক্রমা, (ঢাকা : দি এ্যাটলাস পাবলিসিং হাউস, ২০০১), পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ জেলার পশ্চিমে পিরোজপুর, দক্ষিণে বরগুনা এবং পূর্ব ও উত্তরে বরিশাল জেলা অবস্থিত। জেলার মোট আয়তন ৭৫৮.০৬ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৬৯৬০৫৫, পুরুষ ৪৯.৩৬%, মহিলা ৫০.৬৪% । মুসলমান ৮৭.৩১%, হিন্দু ১২.৬৪% ও অন্যান্য ০.০৫%। উপজেলা চারটি। ঝালকাঠি সদর, কাঠালিয়া, নলছিটি ও রাজাপুর। নদ-নদী ঃ ধানসিড়ি, সুগন্ধা, বিশখালী, গাবখান, জাংগালিয়া ও বামন্ডা। শিক্ষিতের হার ৫১.২%, সরকারি কলেজ ২ টি। বেসরকারি কলেজ ২১ টি। সরকারি হাই স্কুল ২ টি। বেসরকারি হাই স্কুল ১৬৫ টি। মাদরাসা ১৫৯ টি। সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয় ৩৩৯ টি। বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত দ্রব্য ও ব্যবসায় কেন্দ্র হিসাবে জেলাটি বিখ্যাত।[১২]

শৈশবকাল

জন্মের পর শিশু আবদুল কাদির পিতামাতার স্নেহে লালিত-পালিত হতে থাকেন। শৈশবে তিনি অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও মার্জিত স্বভাবের ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী ও বুদ্ধিমান। তাঁর কথাবার্তায় প্রজ্ঞার পরিচয় ফুটে উঠেছিল অতি অল্প বয়সেই। সচ্চরিত্র ছিল তার ভূষণ।[১৩]

পিতৃবিয়োগ

শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের বয়স যখন ৯ বছর তখন তাঁর পিতা মাওলানা আবদুল আলী ইনতিকাল করেন। পবিত্র হজ্জ পালন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারক যিয়ারত শেষে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বেশ কিছু দিন অসুস্থ থাকায় ক্রমশ তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে। অবশেষে ১৯৩০ সনের ১০ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১১.৪৫ টায় মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আবদুল কাদির পিতৃস্নেহ থেকে চিরবঞ্চিত হন।[১৪] পিতার মৃত্যুর পর শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের লালন-পালনের ভার তাঁর মা ফখরুন্নেছার ওপর আসে। তিনি অভাব-অনটন ও নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের লালন-পালন ও লেখাপড়া চালিয়ে যান। অভাবের কারণে তাঁর মাকে মাঝে মাঝে চিন্তিত মনে হত। আবদুল কাদির তখন মাকে সান্ত্বনা দিতেন।

---

১২ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দশম খন্ড, মার্চ ২০০৩), পৃ. ৯৮-৯৯।

১৩ পারিবারিক সূত্র, শরীফ মুনীরের সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত।

১৪ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪; শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; শরীফ মুনীরের সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

এত ছোট বালকের মুখে সান্ত্বনার বাণী শুনে মা বিমোহিত হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। করুণাময় আল্লাহর নিকট দু'হাত তুলে তাঁর জন্য দুআ করতেন। পিতৃহীন বালক শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির পিতার অবর্তমানে নিজেকে গডডলিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেন নি। তিনি খেলাধূলা, দুষ্টুমি, হাসি-তামসা ইত্যাদিকে এড়িয়ে চলতেন। তাঁকে দেখে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও শান্ত-শিষ্ট মনে হত। পারিপার্শ্বিক দোষ-ত্রুটি ও কলুষতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি।[১৫] মা ফখরুন্নেছা তার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনের সকল দুঃখ ভুলে যেতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিভিন্ন জায়গা থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও ফখরুন্নেছা বিয়েতে রাজি হন নি। কেবল সন্তানকে মানুষ করাই ছিল তার ব্রত।[১৬]

শিক্ষাজীবন

শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের পিতামাতা উভয়ই ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী। তাঁরা আবদুল কাদিরকে শৈশবেই নিজ গ্রাম রহমতপুর মকতবে ভর্তি করিয়ে দেন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে। আবদুল কাদিরের মেধা ছিল অসাধারণ। মাত্র সাড়ে ছয় বছর বয়সেই তিনি মায়ের নিকট তাজবীদ সহকারে বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন। মকতবে পড়াকালীন শিক্ষকগণ তাঁর মধ্যে অসাধারণ গুণাবলি লক্ষ্য করে বিমোহিত হন। বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত, কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও বুদ্ধিমত্তায় তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। রাস্তায় চলার পথে ও মক্তবে কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা তিনি পছন্দ করতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অবসর সময় তিনি দুআ-দুরূদে মশগুল থাকতেন।[১৭] মকতবের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি প্রাঞ্জিপুথিপাড়া মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না হওয়ার কারণে তাঁকে অনেক কষ্ট করে স্কুলে যেতে হত।

কিছুদিন ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর তিনি বানারীপাড়া হাইস্কুলে ভর্তি হন। এ স্কুলেই তাঁর পিতা শিক্ষকতা করতেন। ১৯৩০ সালে পিতা ইনতিকাল করলে শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের প্রতিপালন ও সার্বিক দায়িত্ব তাঁর মা ফখরুন্নেছার ওপর পড়ে। মা তাঁকে আহমদিয়া কাউয়ারচর সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ভর্তি করিয়ে দেন।[১৮]

---

১৫ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের পুত্র শরীফ মুহাম্মদ মুনীর এর সাথে সাক্ষাৎকারে মাধ্যমে প্রাপ্ত।

১৬ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

১৭ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, নেছার কুঞ্জের অন্যতম জ্ঞানতাপস শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ), পৃ. ১।

১৮ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

সেখান থেকে তিনি ইংরেজ সরকারের দেয়া জেলাভিত্তিক বৃত্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে উল্লেখযোগ্য নম্বর পেয়ে বৃত্তি লাভ করেন।[১৯] এরপর তিনি ভর্তি হন বরিশাল (তৎকালীন বাকেরগঞ্জ) জেলার শায়েস্তাবাদ মাদরাসায়। এখানে ভর্তি হওয়ার পর আর্থিক অভাব-অনটন দেখা দেয় তীব্রভাবে। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর অদম্য আগ্রহই তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি বই কিনে পড়তে পারতেন না বিধায় অন্যদের কাছ থেকে বই ধার করে এনে লিখে নিতেন এবং তা পড়তেন।[২০] এমনি অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে তিনি শায়েস্তাগঞ্জ মাদরাসা থেকে ১৯৪১ সালে আলিম[২১] এবং ১৯৪৩ সনে ফাযিল[২২] পাশ করেন। উক্ত মাদরাসায় তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে মাওলানা মুহাব্বত আলী এবং সহপাঠীদের মধ্যে মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ ছিলেন অন্যতম।[২৩]

---

১৯ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

২০ শরীফ মুহাম্মদ মুনীর, নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানসাধক অধ্যক্ষ শরীফ আবদুল কাদির, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১.৮.২০০১, পৃ. ১১।

২১ আলিম মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সমমানের ডিগ্রী।

২২ ফাযিল বিএ এর সমমানের মাদরাসা ডিগ্রী।

২৩ ড. আ. র.ম. আলী হায়দার, বাংলার তিন সাধক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পি এইচ ডি থিসিস, অপ্রকাশিত), পৃ. ২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন

ফাযিল পাশ করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতা গমন করেন। ১৯৪৩ সনে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায়[২৪] ভর্তি হন। এ প্রতিষ্ঠানেও তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় তিনি কামিল শ্রেণীর প্রথম বর্ষ সমাপন করেন। দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করে ক্লাশ শুরু করার কয়েক দিন পরই তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। কলিকাতা হাসপাতালে তাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হল। তার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বরিশালের চরামদ্দী নিবাসী আজহার মিয়া কলিকাতা হাসপাতালে তাঁর সেবা-শুশ্রুষা করতেন।

---

২৪ কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা : ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনামলে পাশ্চত্য শিক্ষাকে বর্জন করার ফলে আধুনিক শিক্ষার অভাবে মুসলমান পশ্চাদপদ থেকে যান। একারণে তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ থেকে বঞ্চিত হন। এই অসুবিধা অনুধাবন করে ১৭৮০ সালে কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম শিক্ষাবিদ ও নাগরিক লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংয়ের সাথে সাক্ষাত করেন এবং আরবি, ফার্সি ও ইসলামী বিষয়াবলি শিক্ষাদানের জন্য একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তাঁর নিকট আবেদন জানান। এ সময় শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর বিশিষ্ট শাগরিদ ও প্রসিদ্ধ আলিম মাওলানা মাজদূদ্দীন কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত করার জন্য হেস্টিংকে অনুরোধ করা হয়েছিল। হেস্টিং এ অনুরোধ রক্ষা করেন। তিনি কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করে রিপোর্ট প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে কলিকাতার বৈঠকখানা রোডে একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে মাদরাসার কার্যক্রম আরম্ভ করেন।
ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এই ভাড়াটিয়া বাড়ি থেকে কলিকাতার পদ্মাপুকুর লেনে (১৭৮১ সালে) মাদরাসা ভবন নির্মাণ করা হয়। সরকারি কাগজ পত্রে মাদরাসাটি Mohamedan College নামে অভিহিত হয়। কিন্তু জনসাধারণের নিকট Colcutta Madrasha নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৭৮১ হতে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত একটি পরিচালনা পর্ষদ মাদরাসাটির সার্বিক দায়িত্ব পালন করে। ১৮১৯ সালে মাদরাসার জন্য একজন ইংরেজ সেক্রেটারী এবং একজন মুসলিম সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। এব্যবস্থা ১৮৫০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। প্রথম দিকে মাদরাসায় দারস-ই-নিজামী পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে প্রয়োজন মোতাবেক সরফ, নাহু, আদাব, ফিকহ, উসুলুল ফিক্‌হ, তাফসীর, ফারাঈয, আকাঈদ, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯০৮ সালে তিন বছর মেয়াদী কামিল কোর্স খোলা হয়। এ কোর্সে উত্তীর্ণদের ফখরুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি প্রদান করা হত। পরবর্তীতে এ কোর্সকে দুই বছর মেয়াদী করা হয় এবং এতে উত্তীর্ণদেরকে মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালে মাদরাসার পরীক্ষাসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য এ মাদরাসায় বোর্ড অব সেন্ট্রাল মাদরাসা একজামিনেশন, বেঙ্গল নামে একটি বোর্ড স্থাপন করা হয়। ১৯৪৭ সালে মাদরাসাটির আরবি সেকশন ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমান মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা কলিকতা আলিয়া মাদরাসার সেই আরবি সেকশন।
দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম খন্ড), পৃ. ২৬৯ – ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে তাঁর মায়ের কাছে কতিপয় লোক জানালো, আবদুল কাদির লেখাপড়ার নামে বিদেশ গিয়ে বাউন্ডুলে হয়ে গেছে। এ সংবাদ শুনে তাঁর মা চিন্তায় অস্থির। জায়নামাযে বসে তিনি আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করলেন। ইতোমধ্যে তাঁর নিকট সংবাদ আসল, আবদুল কাদির কলিকাতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। মা তাঁর চাচাতো ভাই আশরাফ আলীকে কলিকাতা প্রেরণ করেন। আজহার মিয়া ও আশরাফ আলী কিছুটা সুস্থ অবস্থায় আবদুল কাদিরকে বাড়ি নিয়ে আসেন।[২৫] এর ফলে তার লেখাপড়ায় কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে তার আর কলিকাতা যাওয়া হল না। কামিল দ্বিতীয় বর্ষে তিনি আর কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় পড়তে পারলেন না। কিন্তু তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দেন নি। এ বছরই তিনি কৃত্তিপাশা হাই স্কুল থেকে প্রাইভেট ভাবে মেট্রিকুলেশন (এসএসসি) পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় তিনি অবিভক্ত বাংলার একমাত্র বোর্ডে মেধা তালিকায় সপ্তম স্থান অধিকারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য কৃত্তিপাশা স্কুল কমিটি তাঁকে উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতা করেন।[২৬]

ছারছীনা মাদরাসায় অধ্যয়ন

কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় কামিল প্রথম বর্ষ শেষ করে অসুস্থ অবস্থায় দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আর কলিকাতায় পড়ার সুযোগ হল না শরীফ আবদুল কাদিরের। এদিকে ছারছীনার পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত মাদরাসায় কামিল শ্রেণী (১৯৪৪) চালু করেছেন। তিনি যেখানেই ওয়াজ মাহফিলের জন্য গমন করতেন সেখানেই ছাত্র সংগ্রহের জন্য লোকজনের সাথে আলাপ করতেন।

একদা পীর সাহেব ঝালকাঠি বন্দরে যান দ্বীনী দাওয়াত নিয়ে। সেখানে তিনি শরীফ আবদুল কাদিরের চাচাত ভগ্নিপতি জনাব সেকান্দার আলী খান সাহেবের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিশ্রামাগারে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেন। এ সময় তিনি খাঁন সাহেবের সাথে ছাত্র সংগ্রহের ব্যাপারে আলাপ করেন। খাঁন সাহেব তাঁকে শরীফ আবদুল কাদিরের কথা বললেন। পীর সাহেব শরীফ আবদুল কাদির সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করে জেনে নেন এবং এ ধরনের একজন মেধাবী ছাত্রের খোঁজ পাওয়ার কারণে অত্যন্ত খুশী হন। পীর সাহেব আবদুল কাদিরকে সাক্ষাৎ করার জন্য ডেকে পাঠান। আবদুল কাদির দেখা করলেন পীর সাহেবের সাথে। পীর সাহেব তাঁকে ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় কামিল দ্বিতীয় বর্ষ পড়ার আহ্বান জানান। কিন্তু আবদুল কাদির তাতে রাজি হলেন না। তখন পীর সাহেব তাঁকে বললেন, বাবা! আমার অনুরোধ রক্ষা করা তোমার জন্য

---

২৫ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; শরীফ মুহাম্মদ মুনীর এর সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত।

২৬ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, প্রাগুক্ত, পৃ.২।

Dhaka University Institutional Repository

জরুরি নয়, কিন্তু তোমার মা বললে তা রক্ষা করাতো তোমার জন্য ফরয। তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর তিনি তোমাকে কোথায় পড়তে বলেন। শরীফ আবদুল কাদির অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়িতে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং পীর সাহেবের অনুরোধের ব্যাপারটিও জানালেন। মা তাঁকে পীর সাহেবের কথার মতই ছারছীনা মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার নির্দেশ দিলেন। মায়ের নির্দেশ উপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। ভর্তি হলেন ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায়।[২৭] ছারছীনা মাদরাসার উস্তাযগণ যেমন ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী তেমনি ছিলেন আল্লাহভীরু। শরীফ আবদুল কাদির অল্পদিনের মধ্যেই পড়াশুনা, সদালাপ, মার্জিত ব্যবহার ও ভদ্রতায় শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্রে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছেন। ছারছীনা মাদরাসায় তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদুম খোতানী (রহ.) (১৮৯৭ – ১৯৮৬)[২৮] আব্দুস সাত্তার বিহারী (মৃ. ১৯৬৫) ছিলেন অন্যতম।

---

২৭ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

২৮ **শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদুম (রহ)** : উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদুম (রহ) মধ্য এশিয়ার রাশিয়া ও চীনের মধ্যবর্তী অঞ্চল 'খোতান'এর সীংগাঙ নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮৯৭ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দীক ও পিতামহ শায়খ মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ ছিলেন দেশ বিখ্যাত আলেম ও মুফতী। তাঁর মা সাইয়্যেদা আয়েশা খানম ছিলেন ঐ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত আলেম বংশের মেয়ে। খোতান এলাকার প্রধান বিচারপতি শায়খ আহমদ ছিলেন তাঁর মামা। তাঁর আরেক মামা ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ ইসমাইল সিদ্দীকী। ইলম, মর্যাদা ও ধন-সম্পদে তাঁর পিতৃ ও মাতৃ পূর্বপুরুষরা ছিলেন বিখ্যাত। আল্লামা খোতানীর বয়স যখন চার বছর তখন তিনি পারিবারিক পরিসরে লেখাপড়া শুরু করেন। যখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর তখন তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন। এর এক বছর পর তাঁর মাতাও ইনতিকাল করেন। তখন থেকে তিনি তাঁর চাচা শায়খ মুহাম্মদ কাসিম এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। চাচা শিশু নিয়াযকে 'খালাক' নামক মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। এ মাদরাসায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কুরআন, হাদীস, উসূল, ফিকহ, আরবি সাহিত্য, ব্যাকরণ, ফারসি প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি 'কাশগড়' মাদরাসায় ভর্তি হয়ে তাফসীর, হাদীস, আকাঈদ, আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণে পান্ডিত্য লাভ করে ১৯ বছর বয়সে একজন প্রখ্যাত আলেম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। জার শাসনের অবসানের সময় তিনি সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৯১৭ সালে ৫ কোটি মুসলিমসহ ২০ কোটি মানুষের রক্তস্রোত প্রবাহিত করে বিশ্বের বর্বরতম কমিউনিজম বিপ্লবের পর তিনি তুরস্ক গমন করেন। সেখান থেকে তিনি দেওবন্দ গমন করেন। ১৯৪০ সালে তিনি দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৪১ সালে তিনি মেধাতালিকায় স্থানসহ মনোবিজ্ঞানে ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৪২ সালে তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি দাওরা হাদীসে ১ম শ্রেণীতে ৩য় স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি দেওবন্দ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৫ সালে ছারছীনা পীর শায়খ নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) এর পত্র লাভ করে এবং শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তিনি ছারছীনা আগমন করেন। তখন থেকে তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদারাসার শায়খুল হাদীস হিসাবে আমরণ খিদমত করেন। শায়খ খোতানী (রহ) ছিলেন অধ্যবসায়ী গবেষক। পূর্বপ্রস্তুতি ও অধ্যয়ন ছাড়া তিনি কখনো ক্লাসে যেতেন না। ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি রাতে রেফারেন্স গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে নিয়োজিত থাকতেন। ক্লাসে যখন তিনি পড়াতেন তখন কোন ছাত্র তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারতেন না। কোন একটি হাদীস পড়ানোর সময় তিনি অনেকগুলো হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান করতেন। কোন হাদীসগ্রন্থের কোন অধ্যায়ের কোন পরিচ্ছেদের কোন পৃষ্ঠার হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে তাও তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিতেন। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি নিরলসভাবে ইলমে হাদীসের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময় তাঁর নিকট থেকে ২৮৫৮ জন ছাত্র হাদীসের সনদ গ্রহণ করেছেন। ১৯৮৬ সালের ২৯ অক্টোবর বুধবার তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ড. এ.এইচ.এম. ইয়াহ্ইয়ার রহমান, আল্লামা নিয়ায মাখদুম : বাংলাদেশে হাদীস শিক্ষাদানে তাঁর অবদান (কুষ্টিয়া : ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ৭ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৮), পৃ. ১–৮।

Dhaka University Institutional Repository

ছারছীনা মাদরাসায় পড়াকালীন শরীফ আবদুল কাদির নিয়মিত তাকরার করতেন। ছাত্রদের মধ্যে যারা পড়া অপেক্ষাকৃত কম বুঝত, ছাত্রাবাসে তিনি তাদেরকে তাকরাবের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন। এর ফলে ছাত্ররা সবাই তাঁকে খুব ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। ক্লাসের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প লিখতেন। এসব লেখা দেয়ালিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হত। এর ফলে ছাত্র জীবনেই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়ায মাখদূম (রহ) অত্যন্ত আদরের সাথে তাঁকে বুখারী শরীফ পড়াতেন। তিনি শরীফ আবদুল কাদিরের মত মেধাবী ছাত্র পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির যোগ্য উস্তাযদগণের সাহচর্যে অতি উদ্যমের সাথে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৪৫ সালে তিনি ছারছীনা মাদরাসা থেকে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে কামিল হাদীস পাশ করেন।[২৯] কামিল পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। পরবর্তীতে শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ছারছীনা মাদরাসার প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং এক পর্যায়ে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তখনও তিনি তার উস্তায আল্লামা খোতানীকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। কামিল ডিগ্রি অর্জনের পর শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ব্যক্তিগত উদ্যোগে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, উসূল, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশুনা করে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন।

সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন

শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ছিলেন নিরলস জ্ঞান-পিপাসু জ্ঞান সাধক। জ্ঞান আহরণই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও তিনি লোকলজ্জা উপেক্ষা করে ১৯৭২ সালে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৪ সালে তিনি বিএ পরীক্ষা দিয়ে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জন করেন।[৩০] এরপর তিনি তাঁর বড় পুত্র শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূমের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টডিজ বিভাগে ভর্তি হন। আবাসিক ছাত্র হিসাবে পিতা-পুত্র হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের ৩৪০ নম্বর কক্ষে থাকতেন।[৩১] শিক্ষকগণ তাঁর মত একজন বিজ্ঞ আলেমকে ছাত্র হিসেবে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হন। তাঁর সাথে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু শ্রেণী কক্ষে তিনি কম বয়সী শিক্ষকদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। ১৯৭৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে এম.এ. চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত আলেম হওয়ায় ভাইভা বোর্ডের সদস্যগণ তাঁকে একাডেমিক বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেন নি। তাঁরা তাঁর সাথে কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে সময় কাটান। এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৩২]

---

২৯ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; ছারছীনা মাদরাসার রেকর্ড ফাইল; শরীফ মুহাম্মদ মুনীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৮।

৩০ রুহুল আমীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ.১১; শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৩১ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূমের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত।

৩২ পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপের মাধ্যমে সংগৃহীত; রুহুল আমীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড ফাইল থেকে সংগৃহীত; শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদিরের এম.এ পাসের সনদে ১৯৭৬ সাল উল্লেখ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হোমিও ডিগ্রি অর্জন

ইসলামী শিক্ষা অর্জনের পর সাধারণ শিক্ষা অর্জন করেও শরীফ আবদুল কাদির ক্ষান্ত হন নি। সময় পেলেই তিনি বিজ্ঞান গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতেন। যেহেতু এম.বি.বি.এস. কোর্সে ভর্তি হওয়ার কোন সুযোগ তাঁর ছিল না, তাই তিনি হোমিও রেজি. ডক্টরশিপ কোর্সে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড, ঢাকার অধীনে হোমিও রেজি. ডক্টরশিপ ডিগ্রি অর্জন করেন।[৩৩]

আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির বাল্যকাল থেকে আল্লাহভীরু, সৎ ও নেক আমলদার ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনি আত্মাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য ইলমে তাসাউফ[৩৪] চর্চার প্রতি উৎসাহী ও অনুরাগী ছিলেন। তাই তিনি ছারছীনার তৎকালীন পীর হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ)[৩৫] এর হাতে ছাত্রাবস্থায়ই বায়আত গ্রহণ করে তরীকা মশ্‌ক (অনুশীলন) করতে থাকেন।

---

৩৩ শরীফ মুহাম্মদ মুনীর, আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য (অপ্রকাশিত), পৃ. ১।

৩৪ তাসাউফ (تصوف) আরবি শব্দ। এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে।

ক) صوف শব্দ থেকে تصوف শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। صوف অর্থ পশম। আর تصوف অর্থ পশমী পোষাক পরিধান করা। যেহেতু প্রথম পর্যায়ে যারা তাসাউফ চর্চা করতেন তারা পশমী পোষাক পরিধান করতেন, সেহেতু তাসাউফ এ শব্দ থেকে উদগত হয়েছে কথাটি যুক্তিসঙ্গত।

খ) মোল্লাজামির মতে تصوف শব্দটি صفا শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, শুভ্রতা ইত্যাদি। পরিভাষায়, যে জ্ঞান চর্চা করলে মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন করতে পারে তাকে তাসাউফ বলে। The Encyclopedia of Religion গ্রন্থে বলা হয়েছে, One of the truly creative manifestation of religious life in Islam in the mystical tradition is known as Tasawuf or Sufism.

৩৫ **মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) :** মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) বৃহত্তর বরিশাল (তৎকালীন বাকেরগঞ্জ) এর পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠী (বর্তমান নেছারাবাদ) থানার অন্তর্গত ছারছীনা গ্রামে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী সদর উদ্দীন আহমদ (মৃ. ১৮৮৬) ও মাতার নাম যোহরা খাতুন। শৈশবে তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন। গ্রামের পাঠশালায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মাদারীপুর ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি হাম্মাদিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসা থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। কলিকাতা শহরের কোলাহল তাঁর ভাল লাগত না। তাই তিনি কলিকাতা ছেড়ে হুগলি মাদরাসায় গিয়ে ভর্তি হন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে কৃতিত্বের সাথে জামাআতে উলা (স্নাতক) পাশ করেন। এরপর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রি অর্জন করেন। হুগলী মাদরাসায় থাকা অবস্থায় তিনি ফুরফুরার পীর মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকীর হাতে বায়আত গ্রহণ করে কামালিয়াত অর্জন করেন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন করার পর তিনি হিদায়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত হন। অল্প দিনের মধ্যে বাংলার আনাচে কানাচে তাঁর অসংখ্য ভক্ত ও মুরীদান ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দ্বীনী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজ বাড়িতে দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত জামেয়া-ই-ইসলামিয়া গড়ে তোলেন। তাকওয়া ও ইখলাসের কারণে দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন।

দ্র. মোহাম্মদ আবদুল বারী খন্দকার, হযরত মাওলানা শাহসূফী নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ), (পিরোজপুর : ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, ৪র্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ৯-৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপন করে তিনি পীর সাহেবের সন্নিধ্য লাভ করার উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে দ্বীনী দাওয়াতে সহযোগিতা করেন। এভাবে তিনি ইলমে তাসাউফের ক্ষেত্রে কামালিয়াত অর্জন করতে সক্ষম হন। পীর সাহেব তাঁকে চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দীয়া ও মুজাদ্দেদিয়া[৩৬] তরীকার খিলাফত ও ইযাযত দান করেন।[৩৭]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাম্পত্য জীবন

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ছাত্রাবস্থায় ছারছীনার তৎকালীন পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) সহ শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। মেধার পরিস্ফুটনের পাশাপাশি ভদ্রতা, নম্রতা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে তিনি হয়ে ওঠেন সকলের প্রিয়পাত্র। লেখাপড়ার সাথে সাথে তিনি বিভিন্ন পত্র ও সাময়িকীতে লিখতেন। তাঁর লেখা পড়ে পীর সাহেব মুগ্ধ হন। বক্তৃতায়ও শরীফ সাহেব সকলের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পীর নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) গোপনে শরীফ আবদুল কাদির সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন তাঁর কনিষ্ঠকন্যা আয়েশা সিদ্দিকাকে বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তিনি তাঁর একান্ত আপনজন ও পরামর্শদাতা মৌলভী এমদাদ আলী মাস্টার সাহেবকে শরীফ সাহেবের বাড়িতে প্রেরণ করলেন। এমদাদ আলী মাস্টার সাহেব শরীফ আবদুল কাদিরের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে ইতিবাচক রিপোর্ট দিলেন। তিনি পীর সাহেবকে জানালেন যে, আবদুল কাদিরের বংশ সম্মানিত ও ঐতিহ্যবাহী। পীর সাহেব তাঁর মেয়েকে এখানে পাত্রস্থ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন।[৩৮] আমাদের দেশে সাধরণত বিয়ের পূর্বে পাত্রী দেখার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। ইসলামে বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্রী দেখা সুন্নাতও বটে। কিন্তু পীর সাহেব তাঁর কন্যা দেখাতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এর মধ্যে কি হিকমত নিহিত ছিল তা তিনিই জানতেন। এদিকে শরীফ সাহেব পাত্রী দেখার ইচ্ছা পোষণ করলেন। যে দিন তিনি পাত্রী দেখার মনস্থ করলেন ঠিক সেদিন তাঁর প্রচন্ড জ্বর হল। তিনি আধ্যাত্মিক সাধক শায়খ নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) এর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং তাঁর ইচ্ছার কথা অবহিত করলেন। ১৯৪৬ সালে ডিসেম্বর মাসে শুভ বিবাহ সংঘটিত হল।[৩৯]

---

৩৬ ইলমে তাসাউফের চারজন ইমাম রয়েছেন। ক. খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ); খ. আব্দুল কাদির জিলানী (রহ); গ. শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ)); ঘ. খাজা বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী। এঁদের নামানুশারে চার তরীকার নামকরণ করা হয়েছে। এঁদের প্রত্যেকেরই লতিকা হযরত সায়্যিদিনা মাওলানা হাবিবিনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৩৭ মাওলানা আব্দুল হাই, অধ্যক্ষ, সারেংগল নেছারিয়া ফাযিল মাদরাসা, ঝালকাঠী এর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য; মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৩৮ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

৩৯ রুহুল আমীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের পর সাত বছর খুব সুখেই দাম্পত্য জীবন কাটছিল। কিন্তু সেই সুখ আর স্থায়ী হল না। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে শরীফ সাহেবের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা ইনতিকাল করেন। প্রথমা স্ত্রী আয়েশা সিদ্দীকার ইনতিকালের পর দুই বছর অতিক্রান্ত হল। দুটি পুত্র সন্তান রেখে আয়েশা সিদ্দীকার ইনতিকাল করায় তাদের লালন-পালনের জন্য শরীফ সাহেবের পুনর্বিবাহ করা জরুরি হয়ে পড়ে। তাই তিনি আবার পাত্রী সন্ধান করতে লাগলেন।

বাকেরগঞ্জের সাহেবগঞ্জ নিবাসী মৌলভী আফসার উদ্দিন খন্দকারের প্রথমা কন্যা মাজেদা খাতুনের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে ঠিক হল। ১৯৯৫ সালের ৫ ডিসেম্বর মুতাবিক ২০ রবিউস সানী ১৩৭৫ হিজরি তারিখ দ্বিতীয় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।[৪০] রূপে ও গুণে অতুলনীয়া মাজেদা খাতুন শরীফ সাহেবের সংসারে আসাতে তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। মাজেদা খাতুন বয়সে ষোড়শী হলেও স্বামীর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করতে সক্ষম ছিলেন। তিনি মাতৃহারা দু'টি সন্তান শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম ও শরীফ মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদকে অতি আদর-যত্ন ও স্নেহের পরশ দিয়ে লালন-পালন করতে থাকেন। তারা যেন তাদের আপন মাকে খুঁজে পেল। মা হারানোর বেদনা ভুলে গেল তারা।

বিয়ের পূর্ব থেকেই শরীফ সাহেব ছারছীনা পীর নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) এর সাথে দ্বীনী দাওয়াতের কাজে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন। এ কারণে তিনি সংসারে যথেষ্ট সময় দিতে পারতেন না। তাই স্বভাবতই শিশু পুত্রদ্বয়ের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। স্বামীর এ অবস্থা জানতে পেরে মাজেদা খাতুন ভ্রমণতর স্বামীর নিকট একটি আকর্ষণীয় পত্র লিখেন। পত্রটি নিম্নরূপ :

"স্বামিন! জানিতে পারিলাম, আপনি মাতৃহারা শিশু দু'টি সম্পর্কে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার মত বালিকা দ্বারা তাহাদের প্রতিপালন ও স্নেহদান সম্ভব হবে কিনা এই চিন্তা আপনাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। কবির ভাষায়-

কে দিবে তোর মাথায় বালিশ?
কে দিবে তোর চাদর গায়,
কে পাড়াবে ঘুম?
ওরে আমার ভাঙা ঘরের চাঁদের আলো!
ওরে আমার বৃন্তচ্যুত মন্দার কুসুম!
শুনতো হুকুম করতো পেয়ার
যে জন, এখন নাইত সে আর

৪০ অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন, মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির (রহ), পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর : ছারছীনা দরবার শরীফ, ১৭শ সংখ্যা, ৫২ বর্ষ, জুলাই ২০০১), পৃ. ৩৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

মায়া কাটিয়ে চলে সেত গেছে এখান থেকে
তোকে যাদু আমার কাছে রেখে।

এই লাইনগুলি যদি আপনার অন্তরে দুর্বলতা পরিবেশন করিয়া থাকে, তবে আমি আরো এক করিব ভাষায় বললাম-

পালিত বলিয়া অপর পাখির নীড়ে
পিকের কণ্ঠে এত গান ফোটে কিরে?
মেঘ-শিশু ছাড়ি সাগর-মাতার নীড়
উড়ে যায় হায় দূর হিমাদ্রি-শির,
তাই কি সে নামি বর্ষা-ধারার রূপে
ফুলের ফসল ফলায় মাটির স্তূপে।
জননী গিরির কোল ফেলে নির্ঝর
পালাইয়া যায় দূর বন-প্রান্তর
তাই কি সে শেষে হয়ে নদী স্রোত-ধারা
শস্য ছড়ায় সিন্ধুতে হয় হারা।
বিহগ-জননী স্নেহের পক্ষ পুটে
ধরিয়া রাখে না, যেতে দেয় নভে ছুটে

বিহগ শিশুরে, মুক্ত কণ্ঠে তাই
সে কি গাহে গান বিমানে সর্বদাই?
বেণু-বন কাটি লয়ে শাখা গুণী
তাই কিগো তাতে বাঁশরীর ধ্বনি শুনি?

এ লাইন কয়টি দ্বারা আপনার মনে সরলতা সিঞ্চন করিতে চাই। আমি জানি আমি নারী। স্বামী সেবা, সন্তান প্রতিপালন ও তাহাদের তরবিয়াত দানের মহান কর্তব্য লইয়াই নারীর জীবন। ইনশাআল্লাহ্, সেই কর্তব্য সমাধা করিতে পারিব, এই রূপ মনোবল আমার আছে। আমিও মাত্র এক বৎসর বয়সে মাতৃহারা হইয়া দ্বিতীয়া মাতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া আপনার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছি। সত্য জানিবেন, দ্বিতীয়া মাতার আদর যত্নে মাতৃহীনতার কোন দুঃখই আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমি কি আমার বর্তমান স্নেহময়ী মাতার নিকট হইতে কিছুইশিখি নাই? সে ছাড়া আমার বর্তমান ছোট ছোট ভাই বোনদের পালন-পোষণ, ধোয়ানো-মোছানো ও তাহাদিগকে লইয়া খেলা করার কাজ অনেকটা আমার ভাগেই পড়িয়াছে। খোদার রহমতে আমি সুষ্ঠুভাবেই উহা করিয়া যাইতেছি। আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

আপনি ওদেরকে আমার ছেলে করিয়া দিন। আর আল্লাহর কাছে দো'আ করুন-আমি যেন মাতৃহারা বালকদের মনের মত মা হইতে পারি। ওদের মার রূহ যেন বলিয়া উঠে-

আমি ধরেছিনু গর্ভে তুমি যে ধরি বুকে
করছে পালন, মোরা দুই বোন সেই সুখে।

ইতি

আপনার দাসী

মাজেদা খাতুন।"

শরীফ সাহেব বিশাল মানসিকতা ও গভীর আন্তরিকতা সম্পন্না রূপবতী ও গুণবতী স্ত্রীকে পেয়ে নিজেকে ধর্মের সেবায় আরও বেশি নিয়োজিত করার সুযোগ পেলেন।[৪১]

তাকওয়াভিত্তিক পারিবারিক জীবন

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ অবদুল কাদির তাকওয়া[৪২] পূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী আয়েশা সিদ্দীকা যেমন রূপে ও গুণে ছিলেন অতুলনীয়া তেমনি ছিলেন আল্লাহভীরু। শরীফ সাহেব এবং তাঁর মধ্যে ছিল সোনায় সোহাগা মিল। প্রতিটি কাজে তাঁরা আল্লাহ-রাসূলের নির্দেশ মেনে চলতেন। সুন্নাত তরীকায় তাঁরা পরিবারের সকল কাজ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করতেন। ইবাদত-বন্দেগী ও তাসাউফ চর্চায় পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতেন। শরীয়তসম্মত পন্থায় কখনো খেল-তামাসাও করতেন। আল্লাহ তাআলার বাণী- "তারা তোমাদের ভূষণ আর তোমারা তাদের ভূষণ"[৪৩] এ বাণীর বাস্তব রূপ ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। একজন অন্যজনকে পোষাকের ন্যায় আপন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর মাত্র সাত বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই প্রিয়তমা আয়েশা সিদ্দীকা শরীফ সাহেবকে ছেড়ে পরপারে চলে গেলেন।[৪৪]

দ্বিতীয় স্ত্রী মাজেদা খাতুন ও ছিলেন অত্যন্ত সতী-সাধবা, পতীপরায়ণা ও তাকওয়াবতী। স্বামীর সেবা করাই ছিল তার একমাত্র ব্রত। তিনি স্বামীর সংসারের যাবতীয় কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করেন এবং সন্তানদেরকে আদর-সোহাগ দিয়ে লালন-পালন করেন। এমনকি সন্তানরা মা হারানোর ব্যথা ভুলে গিয়েছিল। তাদের কাছে মনে হয়েছিল পূর্বের মা আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।[৪৫]

---

৪১ শরীফ মুহম্মদ মুনীর এর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত।

৪২ তাকওয়া অর্থ আল্লাহভীতি, আত্মশুদ্ধি, পরহেযগারী, বিরত থাকা, পরিহার করা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায়, মহান আল্লাহর ভয়ে সব রকম অন্যায়, অনাচার, পাপাচার ও সর্বপ্রকার অসৎকর্ম পরিহার করে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশমত জীবনযাপন করাকে তাকওয়া বলে।

৪৩ আলকুরআন, ০২ : ১৮৭।

৪৪ অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮।

৪৫ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূমের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানদের লেখাপড়া ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে সার্বিক দেখাশুনা করার ক্ষেত্রে তিনি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নি। নিজের সন্তানদের চেয়ে তিনি শরীফ সাহেবের বড় স্ত্রীর রেখে যাওয়া সন্তান দু'টিকে কোন অংশে কম আদর করতেন না। শরীফ সাহেব দ্বীন প্রচারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করতেন। মাজেদা খাতুন সন্তান দু'টিকে লেখাপড়া করানোর মধ্য দিয়ে সময় কাটাতেন।[৪৬]

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ও তাঁর পরিবারবর্গ অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। পোষাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি–ঘরের সরঞ্জামাদি, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন। "অপচয়কারী শয়তানের ভাই"[৪৭]- শরীফ সাহেব কুরআনের এ বাণীর প্রতি লক্ষ্য রেখেই জীবন যাপন করতেন। পরিবারের সকলের প্রতি তাঁর সার্বক্ষণিক নজর ছিল। কেউ যাতে শরীআতের বিধি-বিধানের ব্যতিক্রম না করে সে ব্যাপরে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।[৪৮] সকল বিষয়ে তিনি খুব হিসাবী ছিলেন। খুঁটিনাটি ব্যাপারও তিনি ডায়েরিতে লিখে রাখতেন। এর ফলে বছরান্তে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলানো সহজ হত।[৪৯]

পারিবারিক পরিসরে জ্ঞানচর্চা

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ছিলেন সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। ছেলে-মেয়েদেরকে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে তিনি সামান্যতমও দ্বিধান্বিত হন নি। কঠোর পর্দা রক্ষা করে তিনি তাঁর কন্যাদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা শরীফা সায়ীদা খাতুন কৃতিত্বের সাথে এম.এম ও এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং উভয় শ্রেণীতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এ বিরল অর্জন সম্ভব হয়েছিল কেবল পরিবারে জ্ঞানচর্চার ফলে।[৫০]

---

৪৬ শরীফ মুহাম্মদ মুনীর এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত।

৪৭ আল কুরআন, ১৭ : ২৭ ।

৪৮ শরীফ মুহাম্মদ মুনীর ও শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের স্ত্রী মাজেদা খাতুনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য।

৪৯ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের দৈনন্দিন জীবনের ডায়েরি তাঁর বাড়িতে সংরক্ষিত রয়েছে। এসব ডায়েরিতে তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম ও আয়-ব্যায়ের হিসাব-নিকাশের বিবরণ তাঁর নিজ হাতে লিখিত আছে। এমনকি যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন তখনকার যাবতীয় আয় ব্যয়ের বিবরণ ও তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৫০ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর্মজীবন

শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ১৯৪৫ সালে কৃত্তিপাশা হাই স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ায় ঐ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি তাঁকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করার অনুরোধ জানালে তিনি যোগদান করেন।[৫১] এখান থেকেই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। কৃত্তিপাশা হাই স্কুলে তিনি ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও ইংরেজি, বাংলা ও অন্যান্য বিষয় পাঠদান করতেন। পড়াশুনার সাথে তিনি ছাত্রছাত্রীদের আমল ও আখলাক শিক্ষা দিতেন। ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি বলতেন, তোমরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, নিয়মিত লেখাপড়া করবে, বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করবে, পিতামাতার কথা মান্য করবে। তাঁদেরকে কষ্ট দিবে না। সর্বদা সত্য কথা বলবে। কোন অবস্থাতেই মিথ্যার আশ্রয় নিবে না। ঝগড়া-বিবাদ করবে না। উচ্চস্বরে কথা বলবে না। ঠিকমত হাত ও পায়ের নখ কাটবে। একমাস অন্তর একবার চুল ছোট করবে। মাঝে মাঝে তিনি ছাত্রছাত্রীদেরকে ওজু ও নামায শিক্ষা দিতেন।[৫২]

এসময় তাঁর বয়স কম হলেও তিনি ছাত্র-শিক্ষক মহলে শ্রদ্ধারপাত্রে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছিলেন আপন মহিমায়। অনেক বয়স্ক শিক্ষক তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরামর্শের জন্য আসতেন।[৫৩]

শ্রেণী কক্ষে পাঠদানে তিনি যেমন ছিলেন যত্নবান তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পড়া হৃদয়াঙ্গম করতে পারে সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে নিয়মিত পড়াশুনা করে কি-না তা জানার জন্য তিনি সন্ধ্যার পরে ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়িতে খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি অভিভাবকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা জানার চেষ্টা করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে অভিভাবকদের পরামর্শ দিতেন।[৫৪]

---

৫১ পারিবারিক সদস্যদের সাথে আলাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত।

৫২ মাওলানা আব্দুল হাই, অধ্যক্ষ, সারেংগল নেছারিয়া হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসা, ঝালকাঠী-এর সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গৃহীত, মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

৫৩ শরীফ মুহাম্মদ মুনীর এর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত।

৫৪ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, ব্যবসায়ী, ঝালকাঠী-এর সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ছারছীনা মাদরাসায় যোগদান

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা[৫৫] উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ। মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির ১৯৪৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এ মাদরাসায় প্রভাষক পদে যোগদান করেন।[৫৬]

---

৫৫ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা : ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী বিদ্যাপীঠ। ছারছীনার মরহুম পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) নিজ বাড়িতে ১৯১৪ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসাটি বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর জেলার অন্তর্গত নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠী) থানার ছারছীনা গ্রামে অবস্থিত।

Md. Habibur Rashid সাহেব Bangladesh District Gajetters Bakergonj-এ লিখেছেন, In 1914 Maulana Shah Sufi Nesar Uddin Ahmad established Sarsina Darus Sunnat Alia Madrasha, Jame Masjid, Boarding House, Madrasha Library, Teacher's Quarters, Agricultural farm and the different sections of this religious institutions.

১৯১৪ সালে যখন মাদরাসাটির যাত্রা শুরু হয়। তখন এর নাম ছিল কিরামতিয়া মাদরাসা। গোলপাতার ছাউনি ও বাঁশের খুঁটি দ্বারা নির্মিত ছোট্ট কুঠির ছিল মাদরাসা ভবন। মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা শাহ সূফী নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) তাঁর ভগ্নিপতি আলহাজ্জ আবদুর রশীদকে উক্ত মাদরাসার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি মক্কা মুয়াজ্জমায় পড়াশুনা করেছেন। একাধারে তিনি হাফিয, কারী ও বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ক্বারী খুরশিদ আলী ও ইদিলপুর নিবাসী মৌলভী মির্জা আলীকে আরবি ও ইসলামী বিষয়াবলির এবং ভান্ডারিয়া নিবাসী এমদাদ আলী মাস্টারকে বাংলা ও ইংরেজির শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। মৌলভী মির্জা আলী সাহেব প্রথম জামাত (শ্রেণী) নিয়মে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন।

এদিকে গোলপাতার ঘরের অর্ধাংশে মাদরাসা এবং বাকী অংশে মকতব চলতে থাকে। ১৯১৫ সালে বলহার নিবাসী জনাব মাস্টার আবদুল ওয়াহেদ সাহেব উক্ত মকতবের হেড পন্ডিত নিযুক্ত হন। তার অক্লান্ত পারিশ্রমে অল্প দিনের মধ্যে মকতবের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। মাস্টার আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ছাত্রদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করেন। ফলে প্রতি বছর দু'একজন ছাত্র বৃত্তি লাভ করে। এতে মকতবের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। একারণে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিষয়ক পরিদর্শকমন্ডলী ছারছীনার মকতবটি পরিদর্শন করতে আসেন এবং উক্ত মকতবটিকে একটি আদর্শ মকতব হিসাবে স্বীকৃতি দেন।

অতি অল্প দিনের মধ্যে ছারছীনা মাদরাসা ও মকতবের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়াতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্র এসে ভর্তি হতে থাকে এবং সাধারণ মানুষেরা এর উন্নতির জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ১৯২০ সালে মাদরাসা ভবন নিচ পাকা টিনের ঘরে উন্নীত হয়। মাদরাসার অবয়বের উন্নতির পাশাপাশি তৎকালীন পীর সাহেব হযরত মাওলানা শাহ নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) ছাত্রদের আদব-আখলাক, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ ইত্যাদির উন্নতির দিকে নজর দেন। ছাত্রদেরকে তিনি খাঁটি নায়েবে রাসূল (স) হিসাবে গড়ে তোলেন। ফলে মাদরাসার সুনাম-সুখ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমশ মানুষের দানের পরিমাণও বাড়তে থাকে। পীর সাহেব (রহ) ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার জন্য মাদরাসা সংলগ্ন লিল্লাহ বোর্ডিং নির্মাণ করেন এবং সূফী ফতেহ আলী (রহ) এর নামানুসারে এর নাম দেন "ফতেহিয়া লিল্লাহ বোর্ডিং।"

এর পর কিছুদিনের মধ্যে শিক্ষকদের থাকার স্থান ও মুসাফিরখানা তৈরী করা হয়। মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং এর জন্য যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে কামারকাঠীর মৌলভী মোবারক আলী, রায়েন্দার সূফী মৌলভী ইয়াসিন, তেলিখালীর আলহাজ্জ সূফী আনসার উদ্দীন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। দিন দিন মাদরাসা অতি দ্রুত গতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

১৯৩০ সালে মাদরাসার আলিম শ্রেণী মঞ্জুরী পায়।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন ছাত্রদের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর পাঠদানে ছাত্ররা বিমোহিত হতেন। তিনি মূলত কুরআন, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ ও আরবি সাহিত্য পড়াতেন। তবে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকগণ অনুপস্থিত থাকলে এ বিষয়গুলোও তিনি অত্যন্ত পারদর্শিতার সাথে পাঠদান করতেন। এ প্রসঙ্গে দারুন্নাজাত সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক সাহেব স্মৃতি চারণ করছেন, "আমাদের ছাত্র জীবনে ছারছীনা মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষকের খুবই অভাব ছিল। কোন সময় কোন পিরিয়ড না হলে হুজুরকে বলতাম, হুজুর আমাদের ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। মনে পড়ে একদিন 'লাঞ্চন' গল্পটা কি সুন্দরভাবে আমাদের পড়িয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি বলতেন, ইংরেজিকে তোমরা ভয় পাও কেন? ইংরেজিতো একটি সহজ ভাষা। অনুশীলন কর, দেখবে খুব সহজেই এটি আয়ত্ব করতে পারবে।

১৯৩৪ সালে ৮০ হাত দীর্ঘ ও ২০ হাত প্রস্ত একটি দ্বিতল দালান নির্মাণ করা হয়। এতে খরচ হয় ৪০ হাজার টাকা।

১৯৩৪ সালেই নতুন ভবনে ফাযিল শ্রেণী খোলা হয়। কিন্তু সর্বোচ্চ মানের শিক্ষার জন্য ফাযিল শ্রেণী পর্যন্ত যথেষ্ট ছিল না। তাই পীর সাহেব (রহ) কামিল শ্রেণী খোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের শরণাপন্ন হন। ১৯৪৪ সালে শেরে বাংলার সহযোগিতায় কামিল শ্রেণী খোলা হয় এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পীর সাহেব মা দরাসার নাম রাখেন ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা। এটি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কামিল মাদরাসা।

মরহুম নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) এর ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ সাহেব মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ৪ তলা বিশিষ্ট একটি বিরাট মাদরা সা ভবন নির্মাণের কাজে হাত দেন। তিনি একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চালিয়ে যান এবং মাদরাসার নাম দেন ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত জামেয়া -ই-ইসলামিয়া। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত পীর সাহেব কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯৭৩ সালে মুক্তি লাভ করার পর থেকে পূর্ণ উদ্যমে মাদরাসা উন্নতির কাজ চালিয়ে যান। বর্তমানে ১ টি ৬ তলা বিল্ডিং, ১ টি ৪ তলা বিল্ডিং এবং ৪ টি বৃহৎ ২ তলা সুরম্য বিল্ডিংয়ে মাদরাসা ও ছাত্রাবাসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২ হাজার।

দ্র. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, দেশের প্রথম কামিল মাদরাসা, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬.০৭.২০০২ , পৃ.২০ (ধর্ম চিন্তা পাতা); মুইজুদ্দীন আহমদ কবীর, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ছারছীনা, মাসিক মারজান, মার্চ ১৯৯৯, ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, পৃ. ১০-১১; নূরুদ্দীন আহমদ, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা : অতীত ও বর্তমান, (পিরোজপুর : ছারছীনা মাদরাসা লাইব্রেরি, ১৯৬৯), পৃ. ১-৩২।

৫৬ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় রক্ষিত রেকর্ড ফাইল থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা স্যার না থাকলে তিনি বাংলারও ক্লাস নিতেন। মনে পড়ে একদিন আমাদের ক্লাসে কবি কায়কোবাদের "আযান" কবিতাটি পড়িয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল।"[৫৭] তিনি শ্রেণীকক্ষে কঠোর আচরণ করতেন না। কিন্তু তাঁর পাঠদান কালে শ্রেণীকক্ষে কোন ধরনের হৈ চৈ বা শব্দ শুনা যেত না। ছাত্ররা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাঁর পাঠ গ্রহণ করতেন। প্রভাষক থাকাকালীন তিনি বেশিরভাগ সময়ই ছারছীনায় অবস্থান করার চেষ্টা করতেন। তবে মাঝে মাঝে তাঁকে তাবলীগ ও দাওয়াতের (ওয়াজ-নসীহত) কাজে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গমন করতে হত। ছারছীনা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ শাহ্ নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) এর সুযোগ্য উত্তরসূরী শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ সাহেব (১৯১৬ – ১৯৯০)[৫৮] এর সাথে তিনি ওয়াজ ও নসীহতের জন্য গমন করতেন। পরবর্তী সময় অতিরিক্ত ক্লাশ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেন।[৫৯]

---

৫৭ অধ্যক্ষ আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক, আমার প্রিয় শিক্ষক : আল্লামা শরীফ আবদুল কাদির, মাসিক কুঁড়িমুকুল, (পিরোজপুর : ছারছীনা শরীফ, জুলাই ২০০২ সংখ্যা), পৃ. ১১।

৫৮ মাওলানা শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (রহ) : মাওলানা শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (রহ) ১৯১৫ সালে পিরোজপুর জেলার অন্তর্গত নেছারাবাদ উপজেলার ছারছীনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) এবং মাতার নাম আফসারুন নেসা। বাল্যকাল থেকে তিনি নম্র, ভদ্র ও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা থেকে তিনি ফাযিল পাশ করেন। অতঃপর ভারতের সাহারানপুরের মাজাহিরুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকহশাস্ত্র, আরবি সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করে ফিরে আসেন পিত্রালয়ে। ফুরফুরার তৎকালীন পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (রহ) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে তিনি পিতার নিকট চার তরিকার সবক পালনের মাধ্যমে ইলমে তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করেন এবং কামালিয়াত অর্জন করতে সক্ষম হন। ১৯৫২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতার পথ ধরে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের আঞ্জাম দেন। ছারছীনা মাদরাসার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেন। নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার উন্নতির পাশাপাশি তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় সাড়ে চার হাজার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখার কারণে ১৯৯০ সালে তিনি স্বাধীনতা পদক লাভ করেন।
বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহের মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সরকারিভাবে মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তা ঢাকার অদূরে রাখার জন্য তিনি আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন। মাদরাসা শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়াতুল মুদাররেসিনের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। ১৯৯০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ইনতিকাল করেন।
দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ছারছীনার পীর শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (রহ), মাসিক কুড়িমুকুল, (পিরোজপুর : ছারছীনা শরীফ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সংখ্যা), পৃ. ১৯-২০।

৫৯ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পাঠদান সম্পর্কে তাঁর ছাত্র মোঃ আবু সালেহ পাটোয়ারী লিখেছেন, "আলিম শ্রেণীতে তিনি আরবি অনুবাদ, রচনা, আরবি পত্রলিখন পদ্ধতি পড়াতেন। এমন প্রাঞ্জল ও সহজভাবে পাঠ্য বিষয় বুঝিয়ে দিতেন যে, ছাত্ররা আলিম শ্রেণীর কঠিন বিষয়কে ৫ম-৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যের মত সহজ মনে করত।[৬০]

শরীফ সাহেব ছাত্রদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন। কিন্তু পড়া আদায়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান ও কঠোর। কেউ পড়া শিখে না আসলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন, তবে তিনি কখনো শারীরিক শাস্তি দিতেন না। আলিম দ্বিতীয় বর্ষে একদা "মীযানুল আখবার" পাঠদানকালে তিনি বলেন, "আমার উস্তায সাইয়্যিদ মুফতী আমীমুল ইহসান এ গ্রন্থখানির রচিয়তা। তিনি সমুদ্রকে একটি পেয়ালার মধ্যে ভরে দিয়েছেন।"[৬১]

আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণীতে তিনি হাদিসশাস্ত্র পাঠদান করতেন। ফাযিল শ্রেণীতে তিনি মিশকাতুল মাসাবীহ[৬২] পড়াতেন। এমন চমৎকারভাবে তিনি বুঝিয়ে দিতেন যে বাড়িতে বা ছাত্রাবাসে গিয়ে আর না পড়লেও চলত। শ্রেণী কক্ষেই ছাত্রদের মুখস্ত হয়ে যেত। কামিল শ্রেণীতে তিনি পড়াতেন সহীহ আল-বুখারী।[৬৩] বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো থেকে উদ্বৃতি দিয়ে তিনি বিভিন্ন মাসআলার সমাধান দিতেন।[৬৪]

অধ্যক্ষ হিসাবে শরীফ আবদুল কাদির

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। ছারছীনার তৎকালীন পীর শাহসূফী মাওলানা আবূ জাফর মুহাম্মদ সালেহ এর একান্ত অনুরোধে তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৬৫]

---

৬০ মোঃ আবু সালেহ পাটোয়ারী, আমার দৃষ্টিতে শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (রহ) (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ), পৃ. ৩।

৬১ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর হাই, অধ্যক্ষ, সারেংগল নেছারিয়া হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসা, পিরোজপুর-এর সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত।

৬২ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আলখতীব সঙ্কলিত বৃহৎ হাদীস গ্রন্থ। প্রথমে ইমাম হুসাইন ইবন মাসউদ আল বাগাভী (মৃ. ৫১৬ হি.) এ গ্রন্থটিকে সংকলন করেন এবং এর নামকরণ করেন মাসাবীহুস সুন্নাহ। অল্পদিনের মধ্যে আলিম সমাজে গ্রন্থটির সমাদর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তাঁর ইনতিকালের প্রায় দুইশত বছর পরে (৭০৭ হি.) মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আলখতিব এটিকে বর্ধিত ও পুনঃসংকলন করেন এবং নামকরণ করেন আল মিশকাতুল নাসাবীহ।

দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০২), পৃ. ৪০৫।

৬৩ ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল বুখারী (রহ) (৮০৯-৮৬৯ খ্রি.) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। গ্রন্থটির পুরা নাম الجامع المسند الصحيح من امور رسول الله صلعم وسننه وايامه বিশুদ্ধতার দিক থেকে কুরআনের পরেই এ গ্রন্থটির স্থান।

দ্র. আহসান সাইয়েদ, হাদীস সংকলনের ইতিবৃত্ত, (ঢাকা : এডর্ন পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১), পৃ. ৫৯।

৬৫ ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, বাংলার তিন সাধক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচডি থিসিস (অপ্রকাশিত), পৃ. ২৬৪; ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার রেকর্ড ফাইল থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে মাদরাসার সকল শ্রেণীতে পাঠদান করতেন। কুরআন, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূল, বালাগাত, আরবি সাহিত্য, উর্দু, ইংরেজি সকল বিষয়ই তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় পড়াতে ও বুঝাতে পারতেন।

প্রশাসক হিসাবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মাদরাসার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি সুষ্ঠু নীতি ও জবাবদিহিতাকে প্রাধান্য দিতেন। মুহাম্মদ আবূ সালেহ পাটোয়ারী নামক একজন ছাত্র ঢাকার প্যারীদাস রোডে অবস্থিত ছারছীনা শরীফের খানকাহ থেকে ছারছীনার তৎকালীন পীর আবূ জাফর মুহাম্মদ সালেহ সাহেবের পত্র নিয়ে ছারছীনা মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য আসে। অধ্যক্ষ শরীফ আবদুল কাদির পীর সাহেবের পত্র পাওয়া সত্ত্বেও উক্ত ছাত্রটিকে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ছাড়া ভর্তি করাননি। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তিনি তাকে অফিস থেকে ভর্তি ফরম নিয়ে পূরণ করতে বলেন এবং যথারীতি ইন্টারভিউ গ্রহণ করে ভর্তি করান।[৬৬] তিনি অধঃস্তন কাউকে কখনো নির্দেশের ভাষায় কথা বলতেন না। তৎকালীন উপাধ্যক্ষ এবং পরবর্তী অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রব খান সাহেব বলেন, আমি দীর্ঘদিন তাঁর সহকর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি, কোনদিন তাঁর থেকে অসৌজন্যমূলক আচরণ পাই নি। কোন দিন আমার ওপর ক্ষমতা দেখিয়ে তিনি কৈফিয়ত তলব করেন নি। কোন ভুল হলে তিনি বলতেন, এটা এ রকম না করে এ রকম করলে ভাল হত না?[৬৭] কোন বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং কোন ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন দেখলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হতেন। সবকিছু যথানিয়মে ও যথা সময় করতে হবে-এই ছিল তাঁর প্রশাসনের মূলনীতি। প্রতিদিন যোহরের সালাতের পর তিনি ছাত্রদের নিয়ে মসজিদে বসতেন। কারো ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকলে তা শুনতেন এবং যত দ্রুত সম্ভব ফয়সালা দিতেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁর ছিল আত্মার সম্পর্ক।[৬৮]

অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি ছিলেন একজন অমায়িক ব্যক্তিত্ব। সবার প্রতি তিনি সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। ১৯৮৮ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের পরিচালক (মাদরাসা শিক্ষা) অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বার্ষিক ঈসালে সওয়াব মাহফিলে ছারছীনায় আগমন করেন। ডাকবাংলাতে গিয়ে শরীফ আবদুল কাদির ছারছীনা মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসাবে তার সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন তাঁরই স্নেহধন্য ছাত্র মাহবুবুর রহমান। অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান তার কাছে কদমবুছি করতে আসলে তিনি তাকে আবেগ আপ্লুত হয়ে জড়িয়ে ধরেন। অতঃপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে এক বিশাল ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে তাকে সংবর্ধনা দেন।[৬৯] গুণীজনকে এভাবে তিনি সম্মান প্রদর্শন করতেন।

---

৬৬ মুহাম্মদ আবূ সালেহ পাটোয়ারী, প্রধান মুহাদ্দিস, সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদরাসা-এর সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য।

৬৭ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রব খান, অধ্যক্ষ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য।

৬৮ মুহাম্মদ আবু সালেহ পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৬৯ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শরীফ আবদুল কাদির অধ্যক্ষ থাকাকালীন তাঁর দক্ষ পরিচালনায় মাদরাসার ফলাফল উত্তরোত্তর ভাল হতে থাকে। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার ছারছীনার তৎকালীন পীর আবূ জাফর মুহাম্মদ সালেহ্ সাহেবকে ১৯৮১ সালে জাতীয় শিক্ষা পদক প্রদান করে।

দীর্ঘকাল দক্ষতার সাথে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে ১৯৮৯ সালের ৩১ মার্চ শরীফ আবদুল কাদির ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৭০]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জতীয় পর্যায়ে কর্তব্য পালন

মহান সাধক ও জ্ঞানতাপস মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির সমাজ সংস্কারের অংশ হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে নানামুখী কর্মাকন্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। মেধা ও মননের মাধ্যমে তিনি জাতির দিশারী হিসাবে কর্তব্য পালন করেছেন। নিম্নে জাতীয় পর্যায়ে তার অবদানের একটি বিবরণ দেওয়া হল :

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ[৭১] এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত থেকে দেশ ও জাতির জন্য বিভিন্নমুখী খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৮৮ সালের ২০ আগস্ট তিনি তিন বছরের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য নিযুক্ত হন।[৭২]

---

৭০ ছারছীনা মাদরাসার রেকর্ড ফাইল থেকে সংগৃহীত।

৭১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ দেশের বৃহত্তম ইসলামী গবেষণা সংস্থা। জীবনব্যস্থা হিসেবে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের উদ্যোগে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলূম (ইসলামিক একাডেমী) নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক হামিদুর রহমান। বয়-স্কাউট ভবনের তৃতীয় তলায় ছিল এর প্রধান কার্যালয়। সংগঠনটি খুব দ্রুত অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যায়। প্রতিষ্ঠার বছরই ঢাকায় একটি বৃহৎ মসজিদ স্থাপন ও দারুল ইফতা ও ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য "বায়তুল মুকাররম সমিতি" গঠন করা হয়। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি বায়তুল মুকাররম নামে একটি মসজিদ ও একটি বিপণী কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যে মসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়। এ মসজিদ সাথেই ইসলামিক একাডেমীর প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ বিভক্ত হওয়ায় ইসলামিক একাডেমীর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করে ইসলামিক একাডেমীর অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল-

ক) ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে ইসলামিক সেন্টার, মসজিদ ও মসজিদভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

খ) বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানের মূল্যায়ন ও গবেষণা।

গ) মসজিদভিত্তিক বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

ঘ) ইমাম প্রশিক্ষণ ও ইমামদেরকে প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানদান।

ঙ) ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও ইসলামের ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরা।

দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম খন্ড, ১৯৯৫), পৃ. ১৮৩।

৭২ ইসলামিক ফাউন্ডেশনে রক্ষিত রেকর্ড ফাইল থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

এর মাধ্যমে তিনি জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। কেননা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ দেশের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রতিষ্ঠান। ইসলাম ধর্ম বিষয়ক যে কোন বিষয়ের নীতি নির্ধারণ, বাজেট অনুমোদন, বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন এ প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত। শরীফ সাহেব বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর সুপরামর্শে ফাউন্ডেশনে নতুন নতুন অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং নতুন প্রকল্প চালু হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে জরুরি ফাতাওয়া ও মাসাইল প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত সনের ২৭ ফেব্রুয়ারি শরীফ সাহেবকে এ প্রকল্পের চেয়ারম্যান ও সম্পাদনা কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।[৭৩]

শরীফ সাহেব জাতির দিশারী হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করার প্রয়াস পান। বাংলা ভাষায় ইতোপূর্বে এ ধরনের ইসলামী আইনশাস্ত্রের পুস্তক প্রণীত বা সংকলিত হয় নি। শরীফ সাহেব আপ্রাণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন "অনেক বড় কাজ। আমার জীবনে হয়ত শেষ করতে পারব না। কিন্তু শুরু যেহেতু হয়েছে একদিন শেষ হবেই ইনশাআল্লাহ্।[৭৪]" ঠিক তা-ই হল। প্রকল্পের কাজ শুরু করে প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের পরিকল্পনা, রূপরেখা ও সূচিপত্র প্রণয়ন করার কিছুদিন পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তথাপি থেমে থাকে নি প্রকল্পের কাজ। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবকে চেয়ারম্যান করে ফিকহ সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলে। এ যাবত "ফাতাওয়া ও মাসাইল" নামে ৬ খন্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং জনসাধারণের মাঝে সমাদৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ফাতাওয়া ও মাসাইল প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের (একত্রে) দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক মোহাম্মাদ আবদুর রব গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেন, "দেশের কয়েকজন বিজ্ঞ আলিম ও ফকীহ এ গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব পান। এ ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রখ্যাত আলিম মাওলানা শরীফ আবদুল কাদির এ প্রকল্পের রূপ রেখা প্রণয়নসহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের আঞ্জাম দেন।"[৭৫]

দীনিয়াত প্রকল্পের উদ্যোক্তা ও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন

দীনিয়াত প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য ইসলামী আকীদা ও মৌলিক ইবাদতের প্রয়োজনীয় আলোচনা সম্বলিত পুস্তক রচনার জন্য এ প্রকল্প চালু করা হয়। এ প্রকল্পের অধীনে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'দীনিয়াত' নামক একটি গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়। মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকান্ড কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় তারই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে 'দীনিয়াত' গন্থে।

---

৭৩ শরীফ মুহাম্মদ মুনীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৭৪ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

৭৫ সম্পাদনা পরিষদ, ফাতাওয়া ও মাসাইল, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০১), পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের জন্য বাংলা ভাষায় এধরনের গ্রন্থ এটাই প্রথম। দীনিয়াত প্রকল্প চালু করা এবং এ বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক পুস্তক উপহার প্রদানের ক্ষেত্রে মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের অবদান অপরিসীম। ১৯৯২ সনের ৭ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এক পত্রের মাধ্যমে তাঁকে দীনিয়াত প্রকল্পের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়নের কথা অবগত করেন।[৭৬] তিনি পত্র পেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকল্পের চেয়ারম্যান হিসাবে যোগদান করে পূর্ণ উদ্যমে 'দীনিয়াত' নামক পুস্তক রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রকল্পের অন্যান্য সদস্যরা হলেন- মাওলানা মুফতী নূর হোসাইন কাসেমী, মাওলানা মুফতী ইসহাক ফরিদী, মাওলানা হাফিজ ওবায়দুল্লাহ ও মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ। আকাইদ, তাহারাত, নামাজ, রোজা, যাকাত, হাজ্জ, বিবাহ, তালাক, কুরবানী ও ওয়াক্ফ বিষয়ক বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত ৪৫২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ গ্রন্থখানি ১৯৯৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। খুব দ্রুত পুস্তকটি পাঠক মহলে সমাদৃত হয়। ফলে ২০০৪ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। এ প্রসঙ্গে প্রকাশক পুস্তকের সূচনা ভাগে লিখেছেন, 'দীনিয়াত' গ্রন্থটি বাংলাভাষী জনগণের জীবনে দ্বীন মেনে চলার পথ সুগম করতে সহায়ক হবে আশায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়। পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।"[৭৭]

আল বারাকা ব্যাংক লি. এর শরীআ কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম দেশ। এ দেশের বেশিরভাগ মানুষই ধর্মপরায়ণ। ইসলামী শরীআত মোতাবেক লেন-দেন ও অর্থনৈতিক অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালনায় এ দেশের মুসলমানরা আগ্রহী। সেহেতু এ দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বার বার আলোচনা-পর্যালোচনার বৈঠকে মিলিত হন। মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির এসব বৈঠকে উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন। এর সুফল স্বরূপ ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ব্যাংকের আশাতীত সাফল্য জনগণকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ লেন-দেনের প্রতি দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। এজন্য একাধিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। এরই ফলশ্রুতিতে ইসলামী ব্যাংকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৮৫ সালে আল বারাকা ব্যাংক লিমিটেড (বর্তমানে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড) নামে দেশের দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৮]

---

৭৬ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের ১৯৯২ সনের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে, "চিঠি নং ৫৩৩০, গবেষণা ৭/৩/৯২ (২২৪) মারফত দীনিয়াত প্রকল্পের চেয়ারম্যান মনোনীত।"

৭৭ সম্পাদনা কমিটি, দীনিয়াত, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪), পৃ. ৩।

৭৮ মোঃ আখতারুজ্জামান, ইসলামী ব্যাংক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪), পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে শরীআ কাউন্সিলের ভূমিকা অত্যধিক। দেশের শীর্ষস্থানীয় আলিম ও মুফতী মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯২ আল বারাকা ব্যাংকের শরীআ কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়।[৭৯] শরীফ সাহেবের দক্ষ পদক্ষেপ ও সুচিন্তিত নির্দেশনায় অল্প দিনের মধ্যে আল বারাকা ব্যাংক ইসলামী শরীআ মোতাবেক পরিচালিত হয়ে উন্নতির সোপান বেয়ে অগ্রসর হয়।

জাতীয় ঈদগাহে ইমামতির দায়িত্ব পালন

জাতীয় ঈদগাহ বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঈদের ময়দান। দেশের রাষ্ট্রপতিসহ বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, কুটনীতিক, রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ ময়দানে ঈদের সালাত আদায় করেন। মাওলানা শরীফ আবদুল কাদিরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ঈদগাহে ঈদুল আযহার নামাযের ইমামতির জন্য মনোনীত করেন। ১৯৯১ ও ১৯৯৩ সনে তিনি ঈদুল আযহার নামাযে খুতবাহ প্রদান করেন এবং ইমামতি করেন।[৮০] এটা একটি দুর্লভ সম্মানের বিষয়।

রেডিওতে ও টেলিভিশনে ইসলামী অনুষ্ঠানে আলোচনা

বাংলাদেশের উলামা সমাজের মধ্যে শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির একজন অত্যন্ত বিখ্যাত ও পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সে জন্য বিশেষ বিশেষ দিবসে রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে আহ্বান করা হত।

রেডিও বাংলাদেশ এ প্রচারিত তাঁর কয়েকটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক. অনুষ্ঠানের নাম : জীবনের আলো

আলোচনার শিরোনাম : মহানবী (স) এর চরিত্র মাধুর্য

প্রচার : ২১ নভেম্বর ১৯৯১, রাত ১০:৪৫

স্থিতিকাল : ১০ মিনিট

প্রচারে : রেডিও বাংলাদেশ

রেকর্ডিং : ৩ নভেম্বর ১৯৯১, সকাল ১১ টা

প্রচারের স্থান : জাতীয় বেতার কেন্দ্র, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।[৮১]

---

৭৯ শরীফ সাহেবের ১৯৯২ সনের ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে "১৯/০১/৯২ তারিখ আল বারাকা ব্যাংকের শরীআ কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত।"

৮০ শরীফ সাহেবের ১৯৯১ সনের ডায়েরিতে লিখিত আছে, জুন ২৪, ১৯৯১ জাতীয় ঈদগাহে ইমামতি এবং ১৯৯৩ সনের ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে, ২ জুন '৯৩ কুরবানীর ঈদ, চিঠি নং- মহাপরিচালক ১৮২৫/ইস.ফাউ. সাংস্কৃতিক ও দাওয়া ৩/৯৩/২৮১ (৫) এর মাধ্যমে জাতীয় ঈদগাহের ইমামতির জন্য মনোনীত।

৮১ শরীফ সাহেবের ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, চিঠি নং- ৬৮৯৭, ইস্যু ২০/১০/১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

খ. অনুষ্ঠানের নাম : পথ ও পাথেয়

আলোচনার শিরোনাম : পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অমুসলিমদের অভিমত।

রেকর্ডিং : ৩ নভেম্বর ১৯৯১, সকাল ১০ টা

রেকর্ডিং এর স্থান : জাতীয় বেতার কেন্দ্র ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রচার : ৯ নভেম্বর ১৯৯১।

স্থিতিকাল : ৫ মিনিট

প্রচারের স্থান জাতীয় বেতার ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।[৮২]

গ. অনুষ্ঠানের নাম : পবিত্র হজ্জের আহকাম ও আরকান

আলোচনার শিরোনাম : হজ্জের সময় হাজীদের বর্জনীয় কার্যাবলি

রেকর্ডিং : ০৩ জুন ১৯৯১, সকাল ১ টা

প্রচার : ০৫ জুন ১৯৯১, বিকাল ৫ টা

স্থিতিকাল : ১০ মিনিট

প্রচারের স্থান : জাতীয় বেতার ভবন, শেরে বাংলার নগর, ঢাকা।[৮৩]

ঘ. অনুষ্ঠানের নাম : পথ ও পাথেয়

আলোচনার শিরোনাম : পবিত্র কুরআন ও রসায়নশাস্ত্র

রেকর্ডিং : ০৩ জুন ১৯৯১, দুপুর ১২ টা

প্রচার : ১৪ ও ১৯ জুলাই ১৯৯১, সকাল ৬.০০ টা

স্থিতিকাল : ৫ মিনিট

প্রচাররের স্থান : জাতীয় বেতার কেন্দ্র ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।[৮৪]

---

৮২ শরীফ সাহেবের ডায়েরিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, চিঠি নং- ২১৫৫১, ইস্যু তারিখ ০৩.৬.১৯৯১।

৮৩ শরীফ সাহেবের ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত চিঠি নং -২১৫৫১, ইস্যু তারিখ ০৩/৬/১৯৯১।

৮৪ শরীফ সাহেবের ১৯৯১ সনের ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র, থেকে প্রাপ্ত চিঠি নং-২২৫৪২ এর মাধ্যমে অবগত হয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. অনুষ্ঠানের নাম : সাহরী ও ইফতার

আলোচনার শিরোনাম : সাহরী ও ইফতারের গুরুত্ব

রেকর্ডিং : ৭ মার্চ ১৯৯২, সকাল ১০টা

প্রচার : ২৯ মার্চ ১৯৯২, রাত ১০.০০ টা

স্থিতিকাল : ৩০ মিনিট

প্রচাররের স্থান : জাতীয় বেতার কেন্দ্র ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।[৮৫]

চ. অনুষ্ঠানের নাম : ইসলামী অনুষ্ঠান

আলোচনার শিরোনাম : Islam is a complete code of life.

রেকর্ডিং : ১৬ মার্চ ১৯৯১, সকাল ১০ টা

প্রচার : ১৯ মার্চ ১৯৯১, রাত ১০.৪৫ টা

স্থিতিকাল : ৭ মিনিট

প্রচাররের স্থান : বহির্বিশ্ব কার্যক্রম, রেডিও বাংলাদেশ, শাহবাগ, ঢাকা।[৮৬]

ছ. অনুষ্ঠানের নাম : পথ ও পাথেয়

আলোচনার শিরোনাম :জ্ঞান পিপাসু হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রেকর্ডিং : ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ খ্রি. বেলা ১১ টা

প্রচার : ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯১, সকাল ৬.০০ টা

স্থিতিকাল : ৭ মিনিট

প্রচাররের স্থান : জাতীয় বেতার কেন্দ্র ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।[৮৭]

---

৮৫ শরীফ সাহেবের ১৯৯২ সনের ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রেরিত চিঠির নম্বর ২৬০৫, ইস্যু তারিখ ২১.০২.১৯৯২ -এর মাধ্যমে আমন্ত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান।

৮৬ শরীফ সাহেবের ১৯৯১ সনের ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে, রেডিও বাংলাদেশ বহির্বিশ্ব কার্যক্রম, শাহবাগ, ঢাকা-এর আমন্ত্রণে Islam is a complete code of life বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ।

৮৭ শরীফ সাহেবের ১৯৯১ সনের ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে "আজ ২২ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টায় রেডিও বাংলাদেশের পথ ও পাথেয় অনুষ্ঠানে জ্ঞানপিপাসু হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শীর্ষক প্রবন্ধ প্রচার।"

Dhaka University Institutional Repository

জ. অনুষ্ঠানের নাম : জীবনের আলো

আলোচনার শিরোনাম : First arrival of Islam in Bangladesh

রেকর্ডিং : ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

প্রচার : ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

স্থিতিকাল : ৫ মিনিট

প্রচাররের স্থান : বহির্বিশ্ব কার্যক্রম, রেডিও বাংলাদেশ, শাহবাগ, ঢাকা।[৮৮]

ঞ. অনুষ্ঠানের নাম : ইসলাম জীবনের আলো

আলোচনার শিরোনাম : Influence of Muslim culture in medeaval Bengal.

রেকর্ডিং : ১ ডিসেম্বর ১৯৯১

প্রচার : ১৪ডিসেম্বর ১৯৯১

স্থিতিকাল : ৫ মিনিট

প্রচাররের স্থান : বহির্বিশ্ব কার্যক্রম, রেডিও বাংলাদেশ, শাহবাগ, ঢাকা।[৮৯]

বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা

মাওলানা শরীফ আবদুল কাদির বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষে নিমন্ত্রণে তাফসীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে পবিত্র কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর জাতির সামনে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন সময়। নিচে তাঁর কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিবরণ তুলে ধরা হল ।

ক) সূরা জুমুআর প্রথম তিন আয়াতের তাফসীর

রেকর্ডিং : ১৫ নভেম্বর ১৯৯২

প্রচার : ২০ নভেম্বর ১৯৯২ [৯০]

খ) সূরা জুমুআর ৪ ও ৫ নং আয়াতের তাফসীর

রেকর্ডিং : ১৭ নভেম্বর ১৯৯২

প্রচার : ২২ নভেম্বর ১৯৯২ [৯১]

---

৮৮ শরীফ সাহেবের ১৯৯২ সনের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের ডায়েরিতে উল্লেখ আছে, আজ রেডিও বাংলাদেশ বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের জীবনের আলো অনুষ্ঠানে First arrival of Islam in Bangladesh শিরোনামে আলোচনার রেকর্ডিং হয়েছে।

৮৯ শরীফ সাহেবের ১৯৯১ সনের ডায়েরি দ্রষ্টব্য।

৯০ শরীফ সাহেবের ১৯৯২ সনের ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে, ১৫/১১/৯২ তারিখ বিটিভিতে সূরা জুমআর প্রথম তিন আয়াতের তাফসীর প্রচারিত হয়েছে।

৯১ শরীফ সাহেবের ১৯৯২ সনের ডায়েরি দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

গ) সূরা আর-রহমান এর ৭ থেকে ১২ আয়াতের তাফসীর

রেকর্ডিং : ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

প্রচার : ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ [৯২]

ঘ) সূরা আর-রহমানের ৬০ থেকে ৬৪ আয়াতের তাফসীর

রেকর্ডিং : ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

প্রচার : ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ [৯৩]

ঙ) সূরা আর-রহমানের ৬৫ থেকে ৬৯ আয়াতের তাফসীর

রেকর্ডিং : ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

প্রচার : ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ [৯৪]

চ) সূরা মুলকের ৭ ও ৮ আয়াতের তাফসীর

রেকর্ডিং : ৯ নভেম্বর ১৯৯৩

প্রচার : ১১ নভেম্বর ১৯৯৩ [৯৫]

ছ) সূরা কলাম এর ৪৫ থেকে ৪৭ আয়াতের তাফসীর

রেকর্ডিং : ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩

প্রচার : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩ [৯৬]

জ) সূরা আল কলাম এর ৪৮ ও ৪৯ আয়াতের তাফসীর

রেকর্ডিং : ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৩

প্রচার : ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩ [৯৭]

---

৯২ শরীফ সাহেবের ১৯৯৩ সনের ডায়েরিতে ১২/৮ /৯৩ তারিখের পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, আজ বিটিভিতে সূরা আর রহমান-এর ৭ থেকে ১২ আয়াতের তাফসীর অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।

৯৩ শরীফ সাহেবের ১৯৯৩ সনের ডায়েরি দ্রষ্টব্য।

৯৪ শরীফ সাহেবের ১৯৯৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসের ডায়েরি দ্রষ্টব্য।

৯৫ শরীফ সাহেবের ১৯৯৩ সনের নভেম্বর মাসের ডায়েরি দ্রষ্টব্য।

৯৬ শরীফ সাহেবের ১৯৯৩ সনের ডিসেম্বর মাসের ডায়েরি দ্রষ্টব্য।

৯৭ শরীফ সাহেবের ১৯৯৩ সনের ডিসেম্বর মাসের ডায়েরি দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখতে পাই যে,

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রেডিও ও টেলিভিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গোটা জাতির সামনে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। রাজ প্রাসাদ থেকে শুরু করে গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ কৃষক-শ্রমিক জনতার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ায় ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। বাংলার মুসলমানের কান্ডারীর ভূমিকায় তিনি নিজেকে করেছিলেন নিবেদিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শরীফ সাহেবের অবদান

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ। সে জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও.আই.সি এর ফিক্‌হ একাডেমী তাঁকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করে। আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার শরীআতসম্মত সমাধানের জন্য ও.আই.সি-র ফিক্‌হ একাডেমী কাজ করে যাচ্ছে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পাল্টে যায় বিশ্বের পেক্ষাপট। কখনো কখনো উদ্ভব হয় নতুন সমস্যার। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে বিজ্ঞ আলিম ও ইসলামী গবেষকদের এ সব সমস্যার সুচিন্তিত সমাধানই বিশ্ববাসী মুসলমানদেরকে দিতে পারে পথের দিশা। ও.আই.সি-র ফিক্‌হ একাডেমী ইসলামী উলূম ও ফুনূনে পারদর্শিতার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সম্যক ধারণা পোষণকরীদের সমন্বয় ঘটিয়ে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী মুসলিম বিশ্বকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার উদ্দেশ্য যে মহান উদ্যোগে গ্রহণ করেছে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাতে অংশীদারিত্ব করার জন্য উচ্চমানের ইসলামী চিন্তাবিদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের মাধ্যমে সেই প্রয়োজন পূরণ করা হয়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলিম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) (১৯১৮ – ১৯৮৭) এর ইনতিকালের পরে ১৯৮৮ সালে ও.আই.সি-র ফিক্‌হ একাডেমীর বাংলাদেশের প্রতিনিধির পদটি শূন্য হয়। তখন একজন যোগ্য প্রতিনিধি অনুসন্ধান করা হয়। ১৯৮৮ সালে শরীফ সাহেবকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করে প্রেরণ করা হয়।[৯৮]

---

৯৮ মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র.), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪), পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

শরীফ সাহেব স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত পদে যোগদান করেন। ও.আই.সি-র ফিক্‌হ একাডেমীর পাঁচটি অধিবেশনে যোগদান করার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। সেগুলো হল-

১৯৮৮ সনে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ অধিবেশন

১৯৮৮ সনে কুয়েতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম অধিবেশন

১৯৯০ সনে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশন

১৯৯২ সনে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত সপ্তম অধিবেশন

১৯৯৩ সনে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত অষ্টম অধিবেশন

১৯৯৪ সনের ১০ এপ্রিল স্ট্রোকজনিত কারণে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন বিধায় ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত নবম অধিবেশনে তিনি যোগদান করতে পারেন নি। তবে উক্ত অধিবেশনের জন্য লিখিত প্রবন্ধটি তিনি ডাকযোগে প্রেরণ করেন এবং এর জন্য তিনি বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন। উল্লেখ্য, তিনি যতবার ও.আই.সি-র ফিকহ একাডেমীর অধিবেশনে যোগদান করেছেন এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন, প্রত্যেক বারই তিনি বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।[৯৯]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে অবদান

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির বহুমুখী খিদমতের মাধ্যমে ইসলাম ও মানবতার কল্যাণে অবদান রেখেছেন। শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসেবায় তাঁর অবদান অসমান্য। নিম্নে এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল-

মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

শরীফ সাহেব কেবল নিজে ইলম অর্জন করে চুপ করে বসে থাকেন নি, বরং মানুষের নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। নিজ বাড়িতে তিনি জীবনের ক্ষুদ্রাংশ অতিবাহিত করলেও সেখানে তিনি একটি ইবতেদায়ী মাদরাসা ও একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ঢাকাস্থ নিজ বাসভবন হল বাড়ি নম্বর ১১৯/বি, পূর্ব বাসাবো-ঢাকা। এখানে তিনি একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। এ পাঠাগারে প্রচুর সংখ্যক বাংলা, আরবি, উর্দু, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থ রয়েছে। সেখানে অবস্থান করে অথবা বই ধার নিয়ে সে সব মূল্যবান বই পড়ার সুযোগ রয়েছে যে কোন পাঠকের।

---

৯৯ মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

ইলমে হাদীসের খিদমত

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার প্রভাষক, মুহাদ্দিস ও অধ্যক্ষ থাকাকালীন বিরামহীনভাবে ইলমে হাদীসের দরস দিতেন। তাঁর নিকট অনেক ছাত্র সরাসরি হাদীসের দরস লাভ করে দেশের খ্যাতনামা আলিম হয়েছেন এবং বিভিন্ন মাদরাসায় প্রভাষক, মুহাদ্দিস, উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা থেকে সরাসরি তাঁর নিকট যারা হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাদের একটি তালিকা নিম্নরূপ :

সাল	নিয়মিত ছাত্র সংখ্যা
১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ	২ জন
১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ	৮১ জন
১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ	৯২ জন
১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ	৭৯ জন
১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ	৯২ জন
১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ	১০৫ জন
১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ	৭৮ জন
১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ	৮৫ জন
১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ	৭৮ জন
১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ	৬৬ জন
১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ	৭২ জন
১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ	৩৪ জন
১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ	৭৩ জন
১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ	৫৯ জন
১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ	৯০ জন
	সর্ব মোট ১০৮৬ জন[১০০]

এছাড়া ও তিনি বিভিন্ন মাদরাসায় হাদীসের প্রথম ছবক দিতেন। তিনি ছিলেন সমসাময়িক যুগের বাংলাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অন্যতম।

---

১০০ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার

শিশুরা জাতির ভবিষ্যত- এই মূল্যবান কথাকে সামনে রেখে মুসলিম বালক-বালিকাদের ইসলামী রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও সার্বিক ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেষ্ট ও যত্নবান। শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক সবুজ পাতাসহ অনেক পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও বার্ষিকীতে শিশুদের জন্য উপদেশমূলক গল্প, শিক্ষামূলক প্রবন্ধ ও কাহিনী তুলে ধরেছেন।[১০১]

নারী শিক্ষা

নারী শিক্ষার ব্যাপারে শরীফ সাহেব অত্যন্ত সচেতন ও তৎপর ছিলেন। আমাদের নারী সমাজকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে তিনি সরাসরি কোন নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান না করলেও এর চেয়ে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন। নারীদের জীবনযাপনে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে তিনি 'নারী জীবনের আদর্শ' ও 'ইসলামে নারীর মর্যাদা' নামক দুইটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থদ্বয়ে নারী জীবনের সকল দিক তুলে ধরা হয়েছে। যেন এই গ্রন্থ দুটি পাঠ করে যুগযুগ ধরে বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম নারীরা ইসলামের বিধানের আলোকে জীবনযাপন করতে পারে। তাঁর কন্যা শরীফা মাহবুবা খাতুনকে তিনি ইসলামী প্রাবন্ধিক হিসাবে গড়ে তুলেন। ছোট কন্যা শরীফা সাঈদা খাতুন কুরআনের হাফেজা কামিলে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং এম.এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। কঠোর পর্দা পালনের মধ্য দিয়ে কন্যাদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে নারী শিক্ষার প্রতি তাঁর তৎপরতা উপলব্ধি করা যায়।[১০২]

সাধারণ লোকদের শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান

শরীফ সাহেব সমাজের সকল নাগরিকের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত দরদী। সাধারণ মানুষকে কিভাবে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোতে আনা যায় সে চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হতেন। সময় পেলেই তিনি তাঁর কর্মস্থলের আশেপাশের খেটে খাওয়া মানুষকে ডেকে বিভিন্ন ধরণের উপদেশ দিতেন। বিশেষ করে তাদেরকে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করতেন। বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে তাদেরকে কল্যাণের পথে আহবান করতেন। কখনো কখনো উপদেশমূলক গল্প ও কাহিনী বলে তাদেরকে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করতেন।

---

১০১ ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, আল্লামা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির (রহ) : জীবন ও কর্ম (সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ), পৃ. ৭।

১০২ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

শরীফ সাহেবের নিজ গ্রাম রহমত পুরের অধিবাসী আবদুল আজীজ খান সাহেব বলেছেন, "মাওলানা সাহেবের একটি গল্প আজো মনে পড়ে। গল্পটি হলো :

একবার এক গ্রামে ভূমি অফিসার দাখিলা করতে এলেন। বিনা টাকায় তিনি দাখিলা লিখতে রাজি হচ্ছেন না। কিন্তু গ্রামবাসীরা অফিসারকে আটকিয়ে জোর করে বিনা টাকায় দাখিলা লিখতে চাপ প্রয়োগ করল। অফিসার জানতেন যে, গ্রামের লোকেরা পড়ালেখা জানেন না। তিনি দাখিলা না লিখে একটি সাদা কাগজে লিখে দিলেন "কচু ক্ষেতে গলা ঠেসে ধরে দাখিলা লিখিয়ে নিল, টাকা অনাদায়।" অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা এ কাগজখানাকে দাখিলা মনে করে খুব যত্নে রেখে দিল। পরবর্তীতে যখন থানা থেকে পুলিশ এল তখন তারা বুক ফুলিয়ে বলল, এই যে দেখুন দাখিলায় সব লেখা আছে। অফিসার সাহেবের নিজ হাতে লেখা। পুলিশ কাগজটা নিয়ে সকলকে পড়ে শুনান এবং অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেন। এভাবে পড়তে না জানার কারণে নিজেদের দেওয়া কাগজের মাধ্যমে পুলিশের কাছে তারা বিচারের সম্মুখীন হয়েছিল। এ গল্পটা বলার উদ্দেশ্য হলো, তিনি মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, মুর্খতা জাতির জন্য অভিশাপ।[১০৩]

শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য বিদেশ গমন

১৯৭৯ সালে তৎকালীন সরকার জাতীয় পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য শরীফ সাহেবকে মনোনীত করেন। বিভিন্ন দেশের ইসলামী শিক্ষানীতি যাচাই করে সুচিন্তিত মতামত প্রাদনের সুবিধার্থে শরীফ সাহেব ইসলামী শিক্ষা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও পারিবারিক কল্যাণ- এই তিনটি বিষয়ের উপর অনুসন্ধান চালানোর জন্য ১৯৭৯ সালের ৩০ মে থেকে পনের দিনের জন্য সরকারি সফরে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর গমন করেন। সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি উল্লেখিত দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের প্রতিফলনের বিষয়ে সরকারের নিয়োজিত শিক্ষা কমিশনের কর্মকর্তাদের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন।[১০৪]

জামিয়াতুল মুদাররেসিনের সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন

মাদরাসার শিক্ষকদের সরকারি বেতন-ভাতা সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া আদায়, মাদরাসা শিক্ষার উন্নতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সংগঠন "বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদাররেসীন" এর সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন যাবত দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন মাদরাসাসমূহের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ এবং মাদরাসার ছাত্রছাত্রীদেরকে সরকারিভাবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ অবদান রয়েছে।

---

১০৩ জনাব আবদুল আজীজ খান এর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংগৃহীত।

১০৪ ড. আ.র.ম আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

দাখিল ও আলিম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার জন্য তিনি কয়েক বার সরকারের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে আলোচানায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। দাখিল ও আলিম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার ক্ষেত্রে তিনিই সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন।[১০৫]

এহইয়ায়ে সুন্নাত ফান্ড পরিচালনা

ছারছীনার শায়খ মাওলানা মুহাম্মাদ নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) একটি মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দেশের আনাচে কানাচে অনেক মাদরাসার করুণ অবস্থা দেখে তিনি এর ভবিষৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। অনেক মাদরাসা আর্থিক দীনতার কারণে বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আবার অনেক মাদরাসা হতে ইলম ও আমল আশঙ্কাজনক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে দেখে তিনি এর প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যে সব মাদরাসা সুন্নতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণে পরিচালিত তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতার জন্য তিনি "এহইয়ায়ে সুন্নাত" নামে একটি ফান্ড গঠন করেন। এ ফান্ডকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা হয়। মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ছিলেন এ বোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি এ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে সমস্যা জর্জরিত দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। এর ফলে অনেক মাদরাসা অকালে বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং ইলমে ও আমলে উন্নতি লাভ করে।[১০৬]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বীনী তাবলীগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান

দ্বীনী তাবলীগ

ওয়াজ-নসীহত মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেই তিনি দ্বীন প্রচারের মহৎ কাজে ব্রতী হন। ছারছীনা শরীফের দাদা হুজুর হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) (১৮৭৩-১৯৫২) শরীফ সহেবের শ্বশুর ছিলেন। হুজুর শরীফ সাহেবকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি তাঁকে সফর সঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়াজ নসীহতের উদ্দেশ্য নিয়ে যেতেন। শরীফ সাহেবের মত বিজ্ঞ ও উচ্চ মানের আলিম ও মুফতী সাথে থাকার কারণে হুজুর স্বস্থি বোধ করতেন। কোন বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে শরীফ সাহেবকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করতেন।[১০৭]

---

১০৫ শরীফ মুহাম্মদ মুনীর এর সাথে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য।

১০৬ অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের (রহ) সান্নিধ্যে (অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পান্ডুলিপি), পৃ. ২।

১০৭ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

শরীফ সাহেবের নসীহত ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তিনি ছিলেন যেমন মিষ্টিভাষী তেমনি নির্ভরযোগ্য বক্তা। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য দলীল দিয়ে তিনি যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করতেন যে, শ্রোতারা তাদের কাঙ্খিত সমাধান লাভ করে আমলের জন্য নির্ভরতা পেতেন। কখনো কখনো তিনি যুক্তির অবতারণা করে মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করতেন। কখনো গল্পের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করে তুলতেন। ওয়াজ নসীহতে তিনি বিশুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করতেন। তাঁর ভাষা ছিল সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল।

দাদা হুজুরের ইনতিকালের পর তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ (১৯১৬ – ১৯৯০) এর সাথে তিনি ওয়াজ নসীহতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করতেন। ছারছীনা মাদরাসায় অধ্যক্ষ থাকাকালীন ও অবসর গ্রহণের পর মোট ৩০ বছর একাধারে তিনি ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজে অতিবাহিত করেন।[১০৮]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত পক্ষকালব্যাপী সীরাতুন্নবী (স) মাহফিলে তিনি আলোচক হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে ওয়াজ নসীহতে অংশ নেন। ১৯৯০ সনের ৩ ও ৪ অক্টোবর এবং ১৯৯১ সনের ২২ সেপ্টেম্বর তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত সীরাতুন্নবী মাহফিলে ওয়াজ নসীহত করেন।[১০৯] এছাড়া তিনি দেশের বিখ্যাত মাদরাসাসমূহ ও বড় বড় ময়দানে ওয়াজের প্রধান বক্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন।

তিনি তাওহীদ, আকাঈদ, রিসালাত, আখিরাত, দৈনন্দিন ইবাদাত, মুআমালাত ও মুবাশারাত সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সাধারণ মানুষের হৃদয়াঙ্গম করানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। দূরে কোথাও গমন করলে তিনি মাহফিলের পরবর্তী দিন সকাল পর্যন্ত অবস্থান করে স্থানীয় লোকদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতেন এবং সকল প্রশ্নের নির্ভরযোগ্য উত্তর দিতেন।[১১০]

শরীফ সাহেবের ওয়াজ নসীহত এত উচ্চ মানের ছিল যে, পরবর্তীতে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। এ গ্রন্থের নাম হাবীবুল ওয়ায়েজীন।[১১১]

---

১০৮ শরীফ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র শরীফ মুহাম্মদ মুনীর এর সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১০৯ শরীফ সাহেবের ১৯৯০ ও ৯১ সনের ব্যক্তিগত ডায়েরি দ্রষ্টব্য।

১১০ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

১১১ হাবীবুল ওয়ায়েজীন : হাবীবুল ওয়ায়েজীন মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ। ৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ গ্রন্থখানি দারুচ্ছালাম কুতুবখানা, বাকেরগঞ্জ থেকে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। এটি লেখকের ওয়াজের সংকলন। বিভিন্ন সময় লেখক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে নসীহত করতেন, পরবর্তীতে তিনি তাকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। শরীফ সাহেবের ওয়াজ-নসীহত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, যা এ বইটি পড়লেই উপলব্ধি করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অনৈসলামিক কার্যকালাপের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি

অনৈসলামিক কার্যকালাপ আমদের মুসলিম যুবশক্তিকে কুরে কুরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। সৃষ্টি করছে নৈতিক অবক্ষয়। ধ্বংস করছে মূল্যবোধ ও মানবীয় গুণাবলিকে। শরীফ সাহেব এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। যুবসমাজ যাতে অনৈসলামিক কার্যকলাপে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্য তিনি ছারছীনা মাদরাসার ছাত্র-যুবকদের মধ্যে সাপ্তাহিক ও মাসিক বক্তৃতা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের নিয়মিত আয়োজন করতেন। এসব অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় তিনি নিজেই নির্ধারণ করে দিতেন। যেমন কয়েকটি আলোচ্য বিষয়- ইসলামে নৈতিক দর্শন, সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম, ইসলামই একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, ইসলামের অনুপম আদর্শ, ইসলামী নৈতিকতা ও বর্তমান যুবসমাজ, মানবীয় উৎকর্ষ সাধনে ইসলাম ইত্যাদি। শরীফ সাহেব প্রধান অতিথি হিসাবে এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ছাত্রদেরকে উৎসাহ প্রদান করতেন এবং তিনি শেষে একটি করে চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি ছাত্রদেরকে অনুপ্রাণিত করতেন।[১১২]

এছাড়াও শরীফ সাহেব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও বার্ষিকীতে অনৈসলামিক কার্যকলাপের কুফল সম্পর্কে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ছড়া, কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান।

ওয়াজ নসীহত, সভা-সমাবেশ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেও শরীফ সাহেব ইসলামী আদর্শের মাহাত্ম্য এবং অনৈসলামিক কার্যকালাপের কুফল ও অসারতা জাতির সামনে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা

মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবীতে এদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ অনেক পূর্ব থেকেই আন্দোলন করে আসছিল। এরই ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে।

সিলেট অঞ্চল থেকে মুসলিম লীগের প্রার্থী জয়ী করা এবং সিলেট যেন আসামের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় সে লক্ষ্যে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছারছীনার শায়খ মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহঃ) তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ সূফী আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (১৯১৬ – ১৯৯০) এর নেতৃত্বে আটজন প্রতিনিধিকে সিলেট প্রেরণ করেন। মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁরা মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমির গুরুত্ব তুলে ধরে ব্যাপক গণসংযোগ করেন। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান কায়েম হল এবং সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল। এ ক্ষেত্রে মাওলানা শরীফ আবদুল কাদিরের ভূমিকাই ছিল মুখ্য।[১১৩]

---

১১২ আমি নিজে ১৯৮৮ সাল ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার ছাত্র ছিলাম। তখনকার সময় সাপ্তাহিক ও মাসিক জলসায় উক্ত বিষয়গুলো শরীফ সাহেব অধ্যক্ষ হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

১১৩ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নবগঠিত রাষ্ট্রের আইন কানুনকে ইসলামীকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে ছারছীনার শায়খ নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) এর উদ্যোগে ছারছীনা শরীফে নিখিল পাকিস্তানের খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ ও উলামা-মাশায়েখের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, মাওলানা আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী আল-কাদরী, মাওলানা আবদুল লতিফ (খুলনা), মাওলানা দোস্ত মুহাম্মাদ (চট্টগ্রাম), মাওলানা তাজাম্মুল হোসেন (প্রিন্সিপ্যাল, ছারছীনা মাদরাসা) প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত মনীষীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ মহাসম্মেলনে ৬০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। পাকিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ কমিটি সুপারিশ পেশ করে এবং শরীআত সম্মত পন্থায় শাসন পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা উপস্থাপন করে। মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির এ ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।[১১৪]

হজ্জ ও উমরা পালন

শরীফ সাহেবের প্রথমা স্ত্রী আয়েশা সিদ্দীকার ইনতিকালের পরের বছর ১৯৫৪ সালে তিনি পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। এরপর কয়েকবার তিনি উমরা পালন করেছেন।[১১৫]

ইনতিকাল

১৯৯৪ সালের ৭ এপ্রিল শরীফ সাহেব ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ক্বিরাত, আযান, হামদ ও নাত প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। হঠাৎ তিনি অসুস্থতা বোধ করলে তাঁকে তাঁর বাসাবোস্থ বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। বাসভবনে ক্রমশ তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানকার ডাক্তারগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানালেন যে তিনি স্ট্রোক করেছেন। ১০ এপ্রিল হাই প্রেসারের স্ট্রোকজনিত প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। কয়েক দিন যাবত তিনি অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে কাটান। এ সময় তিনি ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. হাবীবুর রহমান এল.সি.পি.এস; এম.ডি.-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাঁর প্রতিব্রতা স্ত্রী মজেদা বেগম ও কনিষ্ঠ পুত্র শরীফ মুনীর সার্বক্ষণিক তাঁর পাশে থেকে সেবা-যত্ন ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আঞ্জাম দিয়েছেন। শরীফ সাহেবের অসুস্থতার সংবাদ শুনে তাঁর শত শত ছাত্র, শুভানুধ্যায়ী ও আত্মীয়-স্বজন তাঁকে দেখার জন্য হাসপাতালে ভীড় জমাতে থাকেন। হাসপাতালে এক হৃদয় বিদারক শোকাতুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে শরীফ সাহেবের অবস্থার সামান্য উন্নতি হলে তাঁকে তাঁর বাসাবোস্থ বাসভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। বাকশক্তিহীন অবস্থায় তিনি জ্ঞানার্জনের মোহ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।

---

১১৪ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

১১৫ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূমের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

তাই তিনি নিজ বাসভবনে গড়ে তোলা লাইব্রেরি[১১৬] থেকে ইশারার মাধ্যমে বই আনিয়ে তা খুলে তাকিয়ে থাকতেন। অসুস্থ অবস্থায় এমনিভাবে সাতটি বছর কেটে গেল। ১৮ জুলাই ২০০১খ্রি. বুধবার তিনি শেষবারের মত লাইব্রেরিতে আসার ইচ্ছা পোষণ করেন। ভেতরের কক্ষ থেকে হুইল চেয়ারে তাঁকে লাইব্রেরিতে আনা হল। অপলক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন সারা জীবনের অমূল্য সংগ্রহ গ্রন্থরাজির দিকে। ক্রমে ক্রমে তাঁর চক্ষু বুজে এলো। প্রায় আধা ঘন্টা অতিবাহিত হল। অবশেষে ২টা ৩০ মিনিটে তিনি ইনতিকাল করেন।[১১৭] (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

সন্তান-সন্ততি

শরীফ সাহেবের দুই জন স্ত্রীর গর্ভে ৫ জন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তারা হলেন :

প্রথমা স্ত্রী আয়শা সিদ্দীকার গর্ভে

প্রথম ছেলে : শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম এম.এম; বি.এ (অনার্স); এম.এ।

দ্বিতীয় ছেলে : আবদুল মা'বুদ (১০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন)।

দ্বিতীয়া স্ত্রী মাজেদা খাতুনের গর্ভে

তৃতীয় ছেলে : শরীফ মুহাম্মদ নূর বি.এ (অনার্স); এম.এ।

প্রথম মেয়ে : শরীফা মাহবুবা খাতুন (ইসলামী প্রাবন্ধিক)।

দ্বিতীয় মেয়ে : শরীফা সাঈদা খাতুন হাফেজা-এ কুরআন; এম.এম ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট; এম.এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

ছোট ছেলে : শরীফ মুহাম্মদ মুনীর এম.এম; বি.এ (অনার্স); এম.এ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের চারিত্রিক গুণাবলি

শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ব্যক্তিগত জীবনে মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন আখলাক এবং উচুঁ মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। আমি (গবেষক) চার বছর যাবত খুব নিকটে থেকে তাঁর কথাবার্তা, চাল-চলন, আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করেছি। তাছাড়া তাঁর সহকর্মী ও নিকট জনদের কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করেছি। সে আলোকে তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি নিম্নরূপ।

---

১১৬ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের ঢাকাস্থ নিজস্ব বাড়ি ১১৯/বি, পূর্ব বাসাবো, ঢাকা-১২১৪। টিনসেড এ বাড়ির একটি কক্ষে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এক সুবিশাল লাইব্রেরী। বাংলা, আরবি, ইংরেজি, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় রচিত কুরআন, হাদীস, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য তথা প্রায় সকল বিষয়ের তিন সহস্রাধিক গ্রন্থ রয়েছে সেই লাইব্রেরিতে।

১১৭ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের কনিষ্ঠ পুত্র শরীফ মুনীরের সাথে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়া

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের প্রতিটি কাজ-কর্মে পরিপূর্ণ তাকওয়া ছিল লক্ষণীয়। কোন কাজ করার পূর্বে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিতেন। শরীআতের বিধানের আলোকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কার্য সম্পাদন করতেন। যে কোন কাজ সম্পন্ন করার পর তাঁকে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতে দেখা যেত।[১১৮] কোন কাজ করার পর কাঙ্খিত ফল লাভ না করলেও তাঁকে হতাশ হতে কিংবা মন খারাপ করতে দেখা যায় নি। বিপদাপদে তিনি সবরে জামিল অবলম্বন করতেন। কথাবার্তায় তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। অনাবশ্যক কোন কিছু বলা, হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, পরনিন্দা, আত্মপ্রশংসা তাঁর মুখে কখনোই শোনা যায় নি, কেউ তাঁর সামনে অন্যের দোষ বললে তিনি সদুপদেশের মাধ্যমে তাকে এ গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতেন। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত এমনকি মুস্তাহাব পালনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান।

হালাল হারাম তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরহেয করে চলতেন। বিধর্মী ও ইসলাম-বিদ্বেষী লোকদের সাথে তিনি আপোষ করেন নি। এমনকি যারা হালাল-হারামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং শরীআতের বিধিবিধান অনুসরণ করে না, তাদের সাথে ওঠা-বসা ও চলাফেরার ক্ষেত্রে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাদের বাড়িতে দাওয়াত গ্রহণ ও খাওয়া-দাওয়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন।[১১৯] তবে সতর্কতার সাথে তাদেরকে দ্বীন ও শরীআতের বিধানের প্রতি দাওয়াত দিতেন। যথাসময়ে সালাত আদায় করার জন্য তিনি সকল কাজের ওপর সালাতকে প্রাধান্য দিতেন। সালাতের জন্য তাঁকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত মনে হত। অধিকাংশ সময় তিনি ওযু অবস্থায় থাকতেন। প্রত্যেক সালাতের পূর্বে তিনি ওযু করতেন। এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁকে অপবিত্র অবস্থায় থাকতে দেখা যেত না। হয়তো ওযু না হয় তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করে দিন কাটাতেন। একবার অসুস্থ অবস্থায় তিনি কেবল 'নামায' 'নামায' বলতেছিলেন।[১২০] সালাতের প্রতি তাঁর হৃদয়ের তীব্র আকাঙ্খা ও মহব্বত এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে।[১২১]

---

১১৮ অধ্যক্ষ আ.খ.ম আবু বকর সিদ্দীক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গৃহীত।

১১৯ কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের এড়িয়ে চলা তাকওয়াবানদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেননা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন- فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين
স্মরণ হওয়ার পর আপনি জালিমদের (পাপাচারীদের) সাথে বসবেন না। আলকুরআন, ৬:৬৮।
আল্লাহ আরো বলেন : اذا سمعتم ايات الله يكفر بها فلا تقعدوا معهم
অর্থ : যখন আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ শোনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না। আল কুরআন, ৪:১০।

১২০ শরীফ মুহাম্মদ মনীরের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গৃহীত।

১২১ আমাদের প্রিয় নবী (স) যেমন সালাতের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করার কারণে ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্তে আস্‌সালাত আস্‌সালাত বলতেছিলেন তেমনি শরীফ সাহেব ও অসুস্থ অবস্থায় 'নামায' 'নামায' বলতেছিলেন। প্রকৃত দীনদার ও তাকওয়াবানদের কর্ম এমনই হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ সময় তাঁকে গভীর রাতে জেগে সালাত আদায় ও আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতে দেখা যেত।[১২২]

শরীফ সাহেব সুন্নতের পুরাপুরি অনুসারী ছিলেন। নিজে যেমনি সুন্নাত পালন করতেন এবং সুন্নতী পোশাক পরিধান করতেন তেমনি অন্যদেরকেও সুন্নতের পাবন্দ হওয়ার প্রতি নসীহত করতেন। একদা তিনি ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে বলেন, "তোমাদের পোশাক হল টুপী, জামা, লুঙ্গী, পাগড়ী। তোমরা সেসব ছেড়ে কোটপ্যান্ট আর নেকটাই পরে বিরাট সাহেব সেজেছ। আর বলছ শার্ট প্যান্টে কি আসে যায়, অন্তর যদি ঠিক থাকে। কিন্তু ভেবে দেখেছ কি কিভাবে দিল মরে যাচ্ছে।"[১২৩] আমলে-আখলাকে ও লেবাসে-পোশাকে, সীরাত সুরাতে তিনি ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পূর্ণ অনুসারী খাঁটি মুত্তাকী। তাঁর তাকওয়া সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র, ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ও মাসিক কুড়িমুকুলের সম্পাদক মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শরাফত আলী। তিনি লিখেছেন- "হুজুরের তাকওয়া প্রসঙ্গে একটি ঘটনা ক্ষুদ্র পরিসরে উল্লেখ না করলে আমাকে অপরাধী মনে হচ্ছে। রিটায়ারমেন্টের পর হুজুর তখন বাসায় থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমি ঢাকায় গিয়ে হুজুরের সঙ্গে দেখা করার মানসে সামান্য মিষ্টি নিয়ে বাসায় গেলাম। হুজুর তখন বাসায় ছিলেন না। পিছে আমার তাড়া থাকায় দেরী না করে মিষ্টির প্যাকেটটা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে চলে আসি। হুজুর বাসায় এসে সব শুনে সিদ্ধান্ত নিলেন কে কি জন্য মিষ্টি এনেছে তা নিশ্চিত না হয়ে এ মিষ্টি খাওয়া যাবে না। অগত্যা মিষ্টির প্যাকেটটি রেখে দিলেন। পরদিন সকালে হুজুরের সঙ্গে দেখা করার অদম্য আগ্রহ চেপে রাখতে না পেরে পুনরায় হুজুরের বাসায় যাই এবং গত দিন হুজুরকে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলার জন্য লজ্জিত হই। হুজুর তৎক্ষণাৎ মিষ্টির প্যাকেটটি এনে নিজে খেলেন এবং আমাকেও আপ্যায়ন করলেন।"[১২৪]

স্নেহ-মমতা

ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা ইসলামী আখলাকের অন্যতম উপাদান।[১২৫] মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদিরের মধ্যে স্নেহ-মমতার এ গুণ ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। ছারছীনা মাদরাসার ছোট-বড় সকল ছাত্রকে তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। মাঝে মাঝে তিনি ছাত্রদেরকে মসজিদে বসিয়ে দীর্ঘক্ষণ গল্পের মাধ্যমে নসীহত করতেন। ফলে ছাত্রদের মধ্যে যেমন আনন্দের সঞ্চার হত তেমনি তারা নেক-আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হত। শরীফ সাহেবের স্নেহ-মমতা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর স্নেহধন্যা নাতনী মাহমুদ ফিরদৌসীয়া কাদরী স্মৃতি চারণ করেন-

---

১২২ ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

১২৩ মোঃ আবু তাহের খান শামীম, আল্লামা শরীফ আবদুল কাদির (রহ)-এর এক গুচ্ছ বাণী, মাসিক কুড়ি মুকুল (পিরোজপুর : দারুস্‌সুন্নাত একাডেমী, সেপ্টেম্বর ২০০১ খ্রি.) পৃ. ১২।

১২৪ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শরাফত আলী, মানবতার মূর্ত প্রতীক মরহুম অধ্যক্ষ শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, মাসিক কুড়িমুকুল (পিরোজপুর : দারুস্‌সুন্নাত একাডেমী, জুলাই ২০০৩ খ্রি.) পৃ. ৬।

১২৫ রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন : من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়।

দ্র. জামে আত্‌তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

"একজন নানার সাথে তার নাত্নীর সম্পর্ক হয় শুধমাত্র নানা নাত্নীর। কিন্তু আমি এমনই একজন নানা ভাইকে হারালাম যিনি কেবলমাত্র নানাভাই-ই নন, তিনি ছিলেন আমার প্রিয় সাহিত্যিক, প্রিয় ব্যক্তিত্ব, প্রিয় কণ্ঠশিল্পী এবং শিক্ষার আলোয়ে উদ্ভাসিত সুন্দর জীবন গঠনের এক মহান অনুপ্রেরণাদাতা। একথা অনস্বীকার্য যে, নাত্নী হিসেবে তাঁর স্নেহাদর আমি যতখানি পেয়েছি ততখানি আর অন্য কারো ভাগ্যে জোটে নি। কারণ আমি ছিলাম তাঁর অতি আদরের একমাত্র নাত্নী। সে কারণেই তিনি আমার যে কোন আবদার পুরাতে সামান্যতম দেরী করতেন না। তিনি আমাকে আদর করতেন প্রাণভরে, দোয়া করতেন আন্তরিকভাবে। তাই নানাভাইকে হারিয়ে আমার হৃদয়ের মরুভুমিতে বইছে স্মৃতির সাইমুম ঝড়। সে ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে হৃদয় প্রান্তর, আছড়ে পড়ছে স্মৃতির পরে স্মৃতি। আমার এ ছোট্ট জীবনে যে সব স্মৃতির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল আমার নানাভাই। সে সব হাসি-আনন্দ ভরা স্মৃতিগুলোও আজ বেদনাবিধুর সাজে বিভ্রান্ত করে চলছে আমাকে। স্মরণের পাতায় চলমান ছবির মতোই চিত্রিত হচ্ছে নানা ভাইয়ের সাথে কাটানো স্মৃতিময় হারানো দিনগুলি।

আজ খুব বেশি মনে পড়ে সে সময়কার কথা। তখন আমি খুবই ছোট। খালামনির মাত্রাতিরিক্ত আদরের ফলে তাকে মনে হত আম্মুর চেয়েও বেশি। কিন্তু সেই খালামনিই যখন আমাকে রেখে দুবাই চলে গেল খালুর কাছে তখনতো আমি খালামনি খালামনি করে কাঁদতে কাঁদতে পাগল প্রায় "আমিও দুবাই যাব, আমাকে ও দুবাই পাঠিয়ে দাও!" এ কথা বলেই কাঁদতাম সারাক্ষণ। বহু চেষ্টা করেও কেউ যখন আমার সে কান্না থামাতে পারল না, তখন নানাভাই এলেন এক অভিনব বুদ্ধি নিয়ে। তিনি আমাকে নিয়ে বসালেন তার ড্রইং রুমে। সুমধুর কণ্ঠে শুরু করলেন তার প্রিয় নাত। ননাভাইয়ের অমীয় কণ্ঠের সুর সুধার আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণের মাঝেই কান্না ভুলে আমিও তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠলাম-

নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি আমার মুহাম্মদ রাসূল

কুল মাখলুকাতের গুল বাগে যেন একটি ফোটা ফুল।

সেদিন থেকেই শুরু হল নানাভাইয়ের সাথে আমার সুর সাধনা। এর পর প্রায় প্রতিটি বিকেলই আসত আমার ও নানাভাইয়ের জন্য সুরের আবহ নিয়ে। দুজনে মিলে এক সঙ্গে গাইতে গাইতে যখন আমি একা একাই সম্পূর্ণ গজলটি গাইতে শিখলাম, তখন নানাভাইয়ের খুশির আর সীমা রইল না। তিনি তাঁর খুশিটাকে স্থায়ী করার মানসে তখনই রেকর্ড করে রাখলেন আমার ও তাঁর কোরাস কণ্ঠে গাওয়া সে নাতটিকে। রেকর্ডকৃত ক্যাসেটটি পাঠিয়ে দিলেন আমার দুবাই প্রবাসীনী খালামনির কাছে।

আজ নানাভাই নেই! তিনি চলে গেছেন বহু দুরে। পৃথিবীর ওপারে। কিন্তু তার সেই সুর রয়ে গেছে আমার কণ্ঠে রয়ে গেছে আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে। আজো আমি ঢাকার বাসার সে রুমে দাঁড়ালে শুনতে পাই আজ থেকে বার তের বছর পূর্বের সেই সুর মুর্ছানা। এখনো যেন ইথরে

Dhaka University Institutional Repository

ভেসে ভেসে ধ্বনিতে হচ্ছে নানাভাইয়ের সেই মিষ্টি মধুর কণ্ঠস্বর! মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে, কেন নানাভাই তাঁর অত মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে গজল শিখাতেন? তবে কি নানাভাইর চাওয়া ছিল, তাঁর চলে যাওয়ার পরেও তার প্রিয় গজলগুলি হৃদয়ে আদর্শ সুরে নতুন প্রজন্মের সাথে মিশে থাকুক? হয়তোবা তাই। হতে পারে এ উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর সুর সুধাকে আমানত রেখে গেছেন আমার কণ্ঠে।

এখনো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, নানাভাই যখন তাবলীগের কাজে পীর সাহেব নানাভাই (হযরত মাওলানা শাহ্ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (র.) এর সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ নসীহতের জন্য যেতেন অথবা ছারছীনা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন বিধায় সেখানে অবস্থান করতেন তখন আমি তাঁকে না দেখতে পেয়ে ব্যাকুল হয়ে পরতাম। অধীর আগ্রহে বসে থাকতাম টেলিফোন সেটের পার্শ্বে। কখন তাঁর ফোন আসবে। কখন তাঁর সাথে কথা বলতে পারব, এই চিন্তায়ই উন্মুখ হয়ে রইতাম সারাক্ষণ। আব্বু-আম্মুর সাথে যখন যাত্রাবাড়িতে নিজেদের বাসায় (আব্বুর অফিস কোয়ার্টার) যেতে হত তখনও আমি নানা ভাইয়ের পথ চেয়ে জানালায় বসে থাকতাম। সেখানেও নানাভাই প্রায়ই আমাকে দেখতে যেতেন অনেক-অনেক কমলা, আপেল ও খেলনা নিয়ে। তাঁর পকেটের সুন্দর কলমটিও যেন আমার জন্যই নির্দিষ্ট থাকত।

শুধু কলমই নয়। নানাভাই ও.আই.সি.তে যোগদান উপলক্ষে বিদেশ সফরকালে প্লেনে যে টিফিনবক্স পেতেন সেটিও তিনি নিয়ে আসতেন আমার কথা মনে করে। বিদেশে অবস্থানকালে তাঁকে দেয়া সাবান সেম্পুসহ অন্যান্য সব প্রসাধনীও তিনি রেখে দিতেন আমার জন্য। এ ছাড়াও প্রায়ই নানাভাই আমাকে উপহার দিতেন ইসলামী মাইন্ডের বিভিন্ন শিশুতোষ বই ও পেপার পত্রিকা। যেগুলো নিয়ে গিয়ে তিনি আমাকে তার পাশে শুইয়ে জোরে জোরে পড়ে শুনাতেন, বুঝিয়ে বলতেন শিশু উপযোগী শিক্ষণীয় গল্প কবিতা। এমনকি কবিতার ছন্দপতন সম্পর্কে এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখনো সে কথা আমার মনে গেঁথে আছে।"[১২৬]

সাম্যের মূর্ত প্রতীক

প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে শরীফ সাহেব কখনোই নিজের পদমর্যাদার গৌরব দেখান নি। তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার সাদাসিদে একজন মাটির মানুষ। সকলের সাথে তিনি প্রফুল্লচিত্তে মিশতেন। মিষ্টি ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর সাথে আলাপ করলে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যে যে কেহ আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। কথা বলার সময় তিনি শ্রোতাদের জ্ঞান ও মানসিকতার প্রতি অতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর কাছে আশরাফ-আতরাফ, উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ ছিল না।[১২৭]

---

১২৬ মাহমুদা ফিরদৌসীয়া কাদরী, বেদনার পাহাড় (অন্তরঙ্গ নানা ভাই আল্লামা শরীফ আবদুল কাদির (রহ) এর স্মরণে), মাসিক কুড়িমুকুল (পিরোজপুর : দারুস্সুন্নাত একাডেমী, সেপ্টেম্বর ২০০১), পৃ. ১৬ -১৭।
১২৭ ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

একবার ছারছীনা মাদরাসার কেন্টিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাদরাসার শিক্ষক ও স্টাফদের দাওয়াত করা হয়। শরীফ সাহেব অধ্যক্ষ হিসাবে সকলের প্রতি নজর দিলেন। দেখলেন মাদরাসার দপ্তরিরা আসে নি। তিনি উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, দপ্তরিদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেছেতো? কেউ সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারছিল না। সকলের ধারণা, হয়তো তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে নি। সবাই নীরব। এমন সময় হঠাৎ একজন করনিক বলে উঠলেন, মানুষকে দাওয়াত দিলে জুতা কি বাদ পড়ে? শরীফ সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, মাওলানা অমুক সাহেব! ওখানে জুতা শব্দটা ব্যবহার না করে টুপি শব্দটা ব্যবহার করলে কেমন হতো? ওরাওতো মানুষ।[১২৮] শরীফ সাহেবের চরিত্রে সাম্যবাদের মহান আদর্শ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে তিনি 'ভাই' বলে সম্মোধন করতেন। কারো সাথে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করতেন না। শরীফ সাহেব যখন ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তখন উক্ত মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা আব্দুর রব খান। মাসিক কুঁড়িমুকুলের জুলাই ২০০২ সংখ্যাটি "শরীফ আবদুল কাদির (রহ) সংখ্যা" শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। এ সংখ্যায় শরীফ সাহেবের জীবন চরিতের উপর মাওলানা আব্দুর রব খানের একটি সাক্ষাৎকার ছাপানো হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন ইবনে আবদুর রহমান। ইবনে আবদুর রহমান প্রশ্ন করেন "আপনি দীর্ঘদিন তাঁর সাথে প্রশাসনিক কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আপনার সাথে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু বলুন। উত্তরে অধ্যক্ষ খান সাহেব বলেন, সে কত কথা, কয়টা আর বলা যায়! আমাকে কখনো অধস্তন হিসেবে তিনি দেখেন নি। দেখেছেন সহকর্মী সহযোগী হিসেবেই। কোনদিন এতটুকু রাগ, বিরক্তি তিনি প্রকাশ করেন নি আমার প্রতি। আর কারো প্রতিও নয়।[১২৯] আরেকটি ঘটনা। একবার ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদরাসার একজন দপ্তরি তাঁর বাড়িতে গেলেন। শরীফ সাহেব তাঁকে খুব যত্ন সহকারে মেহমানদারী করলেন। এমনকি অধ্যক্ষ হয়েও উক্ত দপ্তরির জন্য অজুর পানি এগিয়ে দিলেন। দপ্তরিতো লজ্জায় আর নেই। শরীফ সাহেব মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, আপনি এখন আমার মেহমান।[১৩০] আরেকবার একজন লোক তার কাছে এলো একজন লোককে খুঁজতে। শরীফ সাহেব অধস্তন কারো মাধ্যমে তাকে খুঁজে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। ভাবলেন, কাউকে বললে সে আবার কি মনে করে। তাই অফিস থেকে গিয়ে নিজেই তাকে খুঁজে দিলেন।[১৩১]

---

১২৮ আসমান, শরীফ সাহেব আসলেই শরীফ ছিলেন, মাসিক কুড়িমুকুল, (পিরোজপুর : দারুচ্ছুন্নাত একাডেমী, সেপ্টেম্বর, (শরীফ আবদুল কাদির (রহ) সংখ্যা)), পৃ. ১১।

১২৯ ইবনে আবদুর রহমান গৃহীত আল্লামা শরীফ আবদুল কাদির (র) সম্পর্কে স্মৃতিচারণে কুড়িমুকুলকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রব খান, মাসিক কুড়িমুকুল, (পিরোজপুর : দারুচ্ছুন্নাত একাডেমী, জুলাই, ২০০২), পৃ. ১৩।

১৩০ আছমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

১৩১ আছমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

বিনয় ও বিনম্রতা

বিনয় ও বিনম্রতা ছিল মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের চরিত্রের ভূষণ। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অধীনস্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সাথে কর্কশ ভাষায় তিনি কখনো কথা বলেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ কারণেই হয়তো তাঁর কথার তা'সীর অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল।[১৩২] শ্রেণীকক্ষে তিনি যখন পাঠ দান করতেন তখন কোন ছাত্র অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলেও তিনি বিরক্ত হতেন না।

অধ্যক্ষ থাকাকালীন কোন ছাত্র দরখাস্ত নিয়ে গেলে তিনি খুব খেয়াল করে তা পড়তেন। কোন ভুল থাকলে তিনি তা সেরে আনার জন্য বলতেন। একাধিকবার ভুল শোধরিয়ে দিতেন। কিন্তু ভুলের ওপর সই করতেন না এবং ভুলের কারণে সামান্যতম বিরক্ত হতেন না। তিনি অত্যন্ত মধুর ও কোমল ভাষায় ওয়াজ নসীহত করতেন। এর ফলে শ্রোতারা খুব নিবিষ্ট মনে তাঁর ওয়াজ নসীহত শুনতেন।[১৩৩] তাঁর বিনয় ও বিনম্রতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আছমান 'শরীফ সাহেব আসলেই শরীফ ছিলেন' শিরোনামে লিখেছেন, "তখন শরীফ সাহেব হুজুর ছারছীনা মাদরাসার প্রিন্সিপাল আমি একা তাঁর সাথে বসা। আমাকে বললেন, আঃ করিম! খুলনার অমুক লোকটাকে তুমি চেন? আমি বললাম, জী হুজুর, আমি তাকে চিনি। হুজুর মোলয়েম আওয়াজে বলতে লাগলেন, আমি তার কাছে কিছু টাকা (তৎকালীন সময়ের ১১০০ টাকা) পাব। তাকে দেখলে আমার কথা একটু স্মরণ করিয়ে দিও। জী হুজুর দেব, একথা বলে আমি যখন চলে যাচ্ছিলাম, অমনি হুজুর আমাকে ডাক দিলেন, আবদুল করিম! শোন। তাকে তোমার বলা লাগবে না। জিজ্ঞাসা করলাম কেন হুজুর? আপনি টাকা পান আর বলব না? হুজুর তখন একটু টেনে টেনে বললেন, তুমি কিভাবে বলবে, সে আবার কি বুঝবে? সে জানে 'আমি শরীফ'। মনে যদি কোন কষ্ট পায়! আমার শরীফ নামের যে কলঙ্ক হবে। তার চেয়ে দরকার নেই।"[১৩৪] এ থেকে শরীফ সাহেবের শরাফত সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। তাঁর সম্পর্কে মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান লিখেছেন, "এমন ভদ্র, নম্র, উদার, মিষ্টিভাষী, অমায়িক, প্রাণবন্ত, সদাহাস্য মুখ, স্নেহশীল, মার্জিত রুচির লোক জীবনে কমই দেখেছি। বহু বিচিত্র গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তার মাঝে। অথচ তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার বিনয়ী এক মাটির মানুষ। শরীফ সাহেব ছিলেন সত্যিকার অর্থেই শরীফ। তার শরাফাত উদাহরণযোগ্য।[১৩৫]

---

১৩২ মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

১৩৩ ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

১৩৪ আসমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

১৩৫ রুহুল আমীন খান, আল্লামা শরীফ আবদুল কাদির : একটি নক্ষত্রের পতন, দৈনিক ইনকিলাব, (ঢাকা : ৩ আগস্ট ২০০১), পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

মার্জিত স্বভাব ও রুচিবোধ

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির আমাদের দেশের আর দশজন আলেমের চেয়ে কিছুটা আলাদা প্রকৃতির ছিলেন। মাদরাসা ছাত্রদেরকে তিনি খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও শিক্ষা দিতেন যেন তারা তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারে পূর্ণাঙ্গ মানবরূপে। তার শিক্ষাদান ও মহান কর্মের মধ্যেই তাঁর মার্জিত স্বাভাব ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রুচিবোধ শিক্ষাদান সম্পর্কে মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শরাফত আলী লিখেছেন, "মসজিদে যুক্তিপূর্ণ ও কুরআন-হাদীসের দলীল দ্বারা ভরপুর হুজুরের নসীহত ছাত্রদের সম্মুখে প্রতিদিন ইলমে দ্বীনের এক একটি নব দিগন্ত উন্মোচিত করত। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, একদা হুজুর মানুষের রুচিশলীতার কথা বলছিলেন। দীর্ঘক্ষণ একজন সুরুচীবান মানুষ ও কুরুচিপূর্ণ মানুষের পার্থক্য বুঝায়ে অবশেষে বললেন, কতক ছাত্র ঢিলা নিয়ে হাটাহাটি করে। অবশেষে ওজুর স্থানে এসে লোক সম্মুখে কাচুমাচু হয়ে নিজ হাতটা ভিজায়ে ভিজা হাত দ্বার লজ্জাস্থান মসেহ করে থাকেন। এটা কতটুকু পবিত্রতা বা অপবিত্রতা সৃষ্টি করে তা বলার পূর্বে এতটুকু বলব যে, এটা কোন রুচিবান মানুষের কর্ম হতে পারে না।

যেমনিভাবে নবী করীম (স) সম্বন্ধে কাফিরদের তিরস্কার "তোমাদের নবীতো সব তুচ্ছ বিষয়-এমনকি বাহ্যক্রিয়ার কথাও শিক্ষা দেন। তাদের ভাষায় তোমাদের নবী কতই না তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট। সাহাবা কিরাম কাফিরদের এ তিরস্কার বেমালুম তোয়াক্কা না করে পান্ডিত্যপূর্ণভাবে পেশাব-পায়খানা হতে পবিত্র হওয়ার উপর ইসলামে অন্যতম শেয়ার নামাযের নির্ভরশীলতার কথা ঘোষণা করে প্রমাণ করেন যে, যে কথাটি কাফিররা তুচ্ছ মনে করে মূলত সে কথাটিই অত্যন্ত উচ্চ মার্গের শালীনতায় পরিপূর্ণ; যা ইসলামের সুমহান মহিমা কীর্তন করে। তেমনি মরহুম অধ্যক্ষ হুজুর ছাত্রদিগকে খুঁটিনাটি বিষয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন।"[১৩৬]

রস-রসিকতা

শরীফ সাহেব একজন উচুঁ মানের আলেম হওয়া সত্ত্বেও কেবল কিতাব নিয়ে পড়ে থাকেন নি। ছাত্রদের মনের খোরাক সম্পূর্ণরূপে দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পুরোপুরি সার্থক। ইবনে আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎকারে মাওলানা আবদুর রব খান সাহেব বলেছেন "একজন আলেম শুধুমাত্র কেতাবের বোঝা বয়ে বেড়াবেন, এ নীতিতে আমিও বিশ্বাসী নই। শরীফ সাহেব সবকিছু করে সাহিত্য চর্চা করেও যতটুকু ফিক্‌হী চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন এবং তাঁর ইল্‌মী মাহারাত যতটুকু ছিল, শুধুমাত্র উটের মতো, গাধার মত কিতাব বহন করে, কুপমন্ডুক হয়ে কে ততটুকু ইলমে মাহারাত অর্জন করতে পেরেছে?"[১৩৭] শরীফ সাহেব ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক ও প্রশাসক।

---

১৩৬ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শরাফত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১৩৭ ইবনে আবদুর রহমান গৃহীত মাওলানা আবদুর রব খানের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি শুধু কিতাব পড়িয়েই নয়, হাতে-কলমে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছেন। কখনো আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান আয়োজন করে, কখনো গল্পের মাধ্যমে। মাওলানা শরাফত আলী লিখেছেন, "ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় বাংলাদেশের সব অঞ্চল ও জেলার ছাত্র বিদ্যমান থাকার সুবাদে এখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের কারণে একটা জগাখিচুড়ি ভাষারূপ পরিগ্রহ করত। মাঝেমধ্যে এক দেশের বুলি অন্য দেশের গালি প্রবাদের নিরিখে পরস্পরের মধ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ , উপহাস এমনকি শান্তিভঙ্গের কারণ হয়েও দাঁড়াত। এ অবস্থা দৃষ্টে হুজুর একবার ছারছীনা শরীফে 'ভাষা সপ্তাহ' পালনের ঘোষণা দেন। প্রথমতঃ তিনি একদিন ছাত্র শিক্ষকে ভরা মজলিসে একটি গল্প নিজে বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় সকলকে শুনান। সাথে সাথে বিশুদ্ধ বাংলায় তা তরজমা করে সকলকে বোধগম্য করিয়ে দেন। তারপর একে একে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, যশোর প্রভৃতি অঞ্চলের ছাত্রদেরকে ডেকে তাদের একেকজনকে দিয়ে গল্পটিকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় শুনানোর ব্যবস্থা করেছিলেন; যাতে সবাই আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য বুঝতে পারে। শিক্ষাজীবনে আঞ্চলিক ভাষার ব্যাপক ব্যবহার কিরূপে বিশুদ্ধ ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কিভাবে অন্তরায় হতে পারে তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এই চিত্তাকর্ষক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরম্ভ হয় বিশুদ্ধ ভাষা সপ্তাহ। এ ভাষা সপ্তাহের নীতিমালায় হুজুর বলেছিলেন, কেহই অত্র ভাষা সপ্তাহে অশুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলবে না। কেহ কারো থেকে অশুদ্ধ উচ্চারণের কথা শ্রুত হলে জুনিয়র ভাই সিনিয়র ভাইকে সামান্য মুচকি হাসির মাধ্যমে তার ভুলের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আর সিনিয়র ভাই জুনিয়রকে আদর মাখা কথায় বিশুদ্ধ উচ্চারণটি বলে দিবে। হুজুরের এই অভিযান সর্বাঙ্গীন সার্থক হয়েছিল।"[১৩৮]

জ্ঞান সাধনা

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির ছিলেন একজন চৌকস প্রতিভা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। তাঁর জ্ঞানভান্ডার এমনিতে সমৃদ্ধ হয় নি। এজন্য তাকে কঠোর সাধনা করতে হয়েছে। জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি সর্বক্ষণ অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। প্রশাসনিক দায়িত্ব ও কর্মব্যস্ততা তাঁকে অধ্যয়ন থেকে একটু সময়ের জন্যও দূরে রাখতে পারে নি। তাঁর জ্ঞান সাধনা সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান লিখেছেন- "আসলে শরীফ সাহেব ছিলেন সত্যিকার অর্থেই এক মহান জ্ঞান সাধক। অধ্যয়নই ছিল যেন তার প্রধান কাজ, অন্যগুলো আনুষঙ্গিক। ঘরে-বাইরে, একামতে সফরে যানবাহনে কোথাও কোন অবস্থাতেই বই কিতাব ছাড়া তাকে কদাচিৎ দেখা যেত।

---

১৩৮ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শরাফত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

চোখ দুটো আঠার মতো লেগে থাকত বইয়ের পাতায়। কেবল কুরআন, হাদীস তথা ইসলামী উলূম ফুনুনের কিতাবপত্রই নয়; ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, শরীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, বিভিন্ন ভাষার পত্র-পত্রিকা তথা সব ধরণের সকল বিষয়ের বই-পুস্তক এমনকি পকেট পঞ্জিকার পাতা উল্টিয়েও তাঁকে পড়তে দেখেছি।[১৩৯] বিপদে-আপদেও তিনি পড়াশুনা থেকে বিরতি নেন নি। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শরীফ মুহাম্মদ মুনীর লিখেছেন, "স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আব্বা একটি ঘরে আটকা পড়েছিলেন। বাইরে প্রচন্ড গোলাগুলি। যারা ঘরের ভেতরে ছিল তারা যে যেখানে পেরেছে মাটিতে, খাটের নিচে শুয়ে পড়েছে। এক সময় আমার বড় ভাই দৌড়ে এসে আব্বাকে ডেকে ডেকে খুঁজছেন। আব্বা বললেন, আমি খাঁটের নিচে শুয়ে আছি। বড় ভাই বললেন, আব্বা আপনি কি করছেন? আব্বা বললেন, আমি একটি বই পড়ছি। সময় কাটাব কি করে, তাই পড়ছি।"[১৪০] তাঁর জ্ঞান সাধনা বর্ণনা প্রসঙ্গে মাওলানা রুহুল আমীন খান আরো লিখেছেন, "তিনি নিজ বাসগৃহে গড়ে তুলেছিলেন সুবিশাল এক ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। যেখানে যে দুর্লভ গ্রন্থ পেতেন তাতো সংগ্রহ করতেনই, পছন্দনীয় পুস্তকের অতিরিক্ত কপি না পেলে তা ধারে এনে হাতে লিখে বা লিখিয়ে যত্নের সাথে বাঁধাই করে সংগ্রহ করতেন। '৫৮ সালে মাদরাসার প্রথম পাবলিক পরীক্ষা জামাতে হাফতমে অংশগ্রহণ করে ফলাফল প্রকাশের দীর্ঘ অবকাশকালীন সময় তাঁর সঙ্গে কিছুদিন কাঠানোর সৌভাগ্য আমার হল। তিনি বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহ) প্রণীত 'সিররুল আসরার' নামের একখানা কিতাব হাতে দিয়ে পুরোটা নকল করে দিতে বললেন আমাকে। দীর্ঘদিন বসে সে কাজ সমাধা করলাম। শুনেছি তাঁর লাইব্রেরিতে সেখানা নাকি এখনো সুরক্ষিত আছে।"[১৪১] জ্ঞান অর্জন ও তাঁর জন্য পুস্তক সংগ্রহ করাই তাগিদে তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তার পুত্র শরীফ মুহাম্মদ মুনীর লিখেছেন, "জ্ঞানের যে কত বড় সাধক ছিলেন তিনি তার একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই – তখন তিনি ও.আই.সি.'র ফিকহ একাডেমীর বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি। সম্মেলন শেষ করে জেদ্দা থেকে ফিরেছেন। আমরা সবাই তাঁকে বিমানবন্দরে রিসিভ করতে গেলাম। দেখি আব্বা বড় বড় ব্যাগ ভর্তি করে কি যেন নিয়ে আসছেন। আমরা খুব খুশী। কাছে এসে তিনি আদরের কণ্ঠে বললেন, বাবারা একটু অপেক্ষা কর। আরো একটি কার্টুন আছে। আব্বা সেটি আনতে গেলেন। আমি সবার ছোট, যার লোভ সামলাতে পারলাম না। বলেই ফেললাম, আব্বা এর ভিতরে আমার জন্য কি আছে? তিনি উত্তরে বললেন, বই। অনেকগুলো বই নিয়ে এসেছি। ওখানে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসাবে রিওয়ার্ড মানি যা পেয়েছি তা দিয়েই অনেক বই নিয়ে এসেছি। সবই তোমাদের জন্য।"[১৪২]

---

১৩৯. রুহুল আমীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ.১১।

১৪০. শরীফ মুহাম্মাদ মুনীর, নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান সাধক অধ্যক্ষ শরীফ আবদুল কাদির, দৈনিক ইনকিলাব (ঢাকা : আরকে, মিশন রোড, ৩১ আগস্ট ২০০১) পৃ. ৮।

১৪১ রুহুল আমীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

১৪২ শরীফ মুহাম্মাদ মুনীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্য প্রতিভা

শরীফ সাহেব ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। গদ্য ও পদ্য লেখায় তিনি সমানভাবে পারদর্শী ছিলেন। আরব কবি ইবনুল ফারিদের 'দিওয়ান'কে তিনি কাব্যানুবাদ করে 'অশ্রু সরোবর' নামে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থ পড়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ দেশবরেণ্য মনীষীরা বিমুগ্ধ হয়েছেন এবং প্রশংসামূলক মন্তব্য করেছেন। শেখ সা'দীর 'কারীমা'কে তিনি ফার্সি ছন্দের সুরে বাংলা ভাষায় কাব্যানুবাদ করেছেন। 'কারীমা'র কাব্যানুবাদের একটি নমুনা নিম্নরূপ-

সুবিচার প্রভাবে দেশে হয় আরাম
সুবিচা - রে দেশের পুরে মন-কাম
সুবিচার দিয়ে দেশ যশে ধন্য কর,
খুশী রাখ তাদেরে যারা চায় বিচার[১৪৩]

ছারছীনার পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (র) এর জীবন-চরিতকে তিনি দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি এর শিরোনাম দিয়েছেন 'নেছার-চরিত কাব্য'। বিভিন্ন উপশিরোনামে তিনি পীর সাহেবের জীবনী ফুটিয়ে তুলেছেন।

'অবতরণিকা' উপশিরোনামে তিনি এভাবে শুরু করেছেন-

ভাই-বোন তোরা সকলে আয়
পীর নেছারের মধুর-কাহিনী শুনিবি, আয়
তৃষ্ণাতুরের যাতনায় মধু দানিল যে
পীড়িতের মুখে শেফার পীযুষ ঢালিল যে।

'চিরন্তনী' উপশিরোনামে যে দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন তার নমুনা নিম্নরূপ :

এক এক নবীর উম্মত যবে হয়েছিল পথহারা
আরেক নবীর আগমন হয়ে পথ পেয়ে গেছে তারা
ধরম ব্যাপারে উম্মত যদি ঘুমায় অলস নিদ
জাগাতে তাদেরে যুগের মাথায় আসে গো মুজাদ্দিদ।

---

১৪৩ মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, কাব্যানুবাদ কারীমা (রবিশাল : শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬). পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

'সমাজ-মঞ্চ' উপশিরোনামে তিনি যে দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন তার নমুনা নিম্নরূপ :

গান-বাজনার মন্ডপে আজি বেশিই মুসলমান
অথচ ওয়াজ মাহফিলে আসে বৃদ্ধ দু'চার জন
- -
- -
কবুল করিলেন খোদা-বিশ্ব পালক করতার
পাঠালেন তাই ছারছীনা ভূঁয়ে সাধক পীর নেছার।[১৪৪]

এমনিভাবে উদয়ন, নাম-মহিমা, শৈশব, যৌবন ইত্যাদি উপশিরোনামে প্রায় ছয় শত শ্লোকে তিনি পীর নেছার উদ্দীন আহমদ (র) এর জীবনীকে কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তার এ 'নেছার-চরিত কাব্য' ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'পীর নেছারুদ্দীন আহমদ (র)' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

ছারছীনা মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন, ওয়াজ নসীহতের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন, ইসলামী পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে তিনি সময় পেলেই কবিতা লিখতেন। সে সব কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও পুস্তকে প্রকাশ পেত। তাঁর পুত্র আবদুল মা'বুদের মৃত্যুর পরে তাকে স্মরণ করে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতার নাম 'বেহেশত পুরে' কবিতাটির কিয়দংশ নিম্নরূপ :

তেরশ আটষট্টির মধু মাস হেরি
তুইও ছু টিলি হায় মায়েরে স্মরি
পুরা দশ বছরও রবি না ভবে
জানিলে কে তোরে শাসাত কবে?
দাদী তোর কাঁদে দেখে অঝোর নয়নে
আমি পি তা কাঁদি শয়ন-স্বপনে।[১৪৫]

তাঁর এ কবিতাটি কারীমা'র ছন্দ-অনুযায়ী লিখিত। এটি কারীমা'র সূচনাভাগে স্থান পেয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে তিনি কবিতা লিখতেন। কবিতার মাধ্যমে তিনি বিশেষ বিশেষ সময়কে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

---

১৪৪ মুহাম্মদরফীকুল্লাহ নেছারাবাদী সংকলিত ও সম্পাদিত, পীর নেছারুদ্দীন আহম্মদ (রা), (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০২) পৃ. ১০৭-১২২।

১৪৫ মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, কাব্যানুবাদ কারীমা (বরিশাল : শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬) পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

'অশ্রু সারাবর' কাব্যগ্রন্থ রচনার পর তিনি উক্ত গ্রন্থকে উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখেন :

ছয় শতকের সূফী কুল-মণি
ইবনুল ফারিদের
কবিতাগুলোরে নূতন করেছি
ছাঁচে ফেলে বংগের।
এই শতকের সূফী কুল-মণি
হে মোর পীর নেসার
তোমারেই দেই কারগো কবুল
শরীফের এ আবদার।[১৪৬]

শরীফ সাহেব বিদায়ী ছাত্র, নতুন আগন্তুক মেহমান, নবাগত ছাত্র, শিক্ষকমন্ডলী, গুণীজন এবং বন্ধুদের উদ্দেশে অনেক কবিতা লিখেছেন। তাঁর উস্তায আল্লামা নিয়াজ মাখদুম আল খোতামী আত তুর্কিস্তানী (রহ) এর ইনতিকালের পর তিনি যে শোক কবিতা রচনা করেন তার কিয়দংশ নিম্নরূপ :

দীর্ঘ শরীরী, আয়ত লোচন চাঁদ হাসা মুখখানি
কাঁচা সোনা যেনো জ্বলজ্বল করে অধরে মধুর বাণী
.....
.....
খোতানী হুজুর ধন্য করেছে বাংলার যমীনেরে
নিয়াজ দানিয়ে সরস করেছে হাদীসের বাগানেরে
মাখদুম তিনি বংগ ভুবনে হাজারো মুহাদ্দিস
তাঁরই তাকবীর আওড়ায় সবে দরমেস অহর্নিশ।[১৪৭]

সর্বোপরি, কবিতা লেখায় তাঁর হাত ছিল দক্ষ। ইসলামী ভাবধারায় বাংলা কবিতা রচনাকারীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন।

---

১৪৬ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, অশ্রু সরোবর (বরিশাল : শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬) পৃ. ৬
১৪৭ মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়াজমাখদুম আল খোতানী আততুর্তিস্তানী (রহ) (ঢাকা : সবুজ মিনার প্রকাশনী, জানুয়ারি ১৯৯৪), পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী হিসেবে শরীফ সাহেব

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের মধ্যে শরীফ সাহেব ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন ইসলামী আইনশাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী মুফতী। ছারছীনার মরহুম দাদা পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (র) ও তৎপরবর্তী পীর শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ সাহেব তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে মাহফিলে গমন করতেন। বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রোতাদের নিকট থেকে যত প্রশ্ন আসত, তিনিই সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। শরীফ সাহেব পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় 'ফতোয়ায়ে দারুচ্ছুন্নাত' নামক একটি বিভাগ আছে। অধিকাংশ সময়ই শরীফ সাহেব উক্ত বিভাগে পাঠানো পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত দীনিয়াত প্রকল্পের তিনি উদ্যোক্তা ও পরিচালক ছিলেন। উক্ত প্রকল্পের অধীনে 'দীনিয়াত' নামক যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তিনি তার সম্পাদনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। ছারছীনার দাদা হুজুর সংকলিত 'তরীকুল ইসলাম'[১৪৮] ও 'ফতোয়ায়ে সিদ্দীকিয়া'[১৪৯] গ্রন্থদ্বয় সংকলন ও মাসআলা নির্ধারণে শরীফ সাহেব পীর সাহেবকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন। শরীফ সাহেব নিজে 'চারি মাসআলার ফয়সালা' নামক একখানি ফতোয়ার গ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফতাওয়া ও মাসাইল বোর্ডের তিনি চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ও.আই.সি.'র ফিকহ একাডেমীর তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে শরীআতের বিভিন্ন মাসআলার সমাধান প্রদানে ভূমিকা পালন করেন।

মোটকথা, শরীফ সাহেব ছিলেন বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত মুফতী।

---

১৪৮ 'তরীকুল ইসলাম' একখানা বৃহৎ ফতোয়ার কিতাব। ছার ছীনার দাদা হজুর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ(র) এ গন্থখানি সংকলন করেন। দুই খন্ডে পকাশিত এ গ্রন্থখানি ৮২০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ছারছীনা মুসলিম স্টোর কর্তৃক এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ ২০০০ সনে এ গ্রন্থটির দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছ।

১৪৯ ফতোয়ায়ে সিদ্দীকিয়া ছারছীনার দাদা হুজুর (রহ) সংকলিত একখানা ফতোয়ার কিতাব। ৪১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ গ্রন্থটি ছারছীনা মুসলিম স্টোর কর্তৃক ১৯৮৯ খিস্টাব্দে সর্বশেষ প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আরবি সাহিত্যে অবদান

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আরবি ভাষা ও সাহিত্যে সুপন্ডিত ছিলেন। বাংলাদেশের সুবৃহৎ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন কালে পাঠদানের মাধ্যমে তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। লেখক হিসাবেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আরবি ভাষায় পুস্তক রচনা, প্রবন্ধ ও আরবি সাহিত্যের পুস্তক বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে তিনি আরবি সাহিত্যে অবদান রাখার প্রয়াস পেয়েছেন।এ অধ্যায়ে লেখকের আরবি গ্রন্থাবলি ও প্রবন্ধাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হল। এ অধ্যায়টি দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে লেখকের মৌলিক রচনাবলি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনূদিত রচনাবলি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৌলিক রচনাবলি

লেখকের মৌলিক রচনাবলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হল।

ক. মৌলিক পুস্তক

খ. মৌলিক প্রবন্ধ

ক. মৌলিক পুস্তক

নিম্নে শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত মৌলিক পুস্তক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

এক. বঙ্গানুবাদ বার চান্দের খুৎবাহ (خطبات اثنا عشر شهرا مترجمة بنغلة)

'বার চান্দের খুৎবাহ' মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির কর্তৃক আরবি ভাষায় রচিত জুমুআ ও ঈদের সালাতের খুৎবাহ সংকলন। ২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ গ্রন্থটি ছারছীনা প্রকাশনী, ৫৮/১ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০ কর্তৃক ১৯৪৯ সালে প্রথম এবং সর্বশেষ সংশোধিত ও অঙ্গসজ্জা করে একই প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থটি আরবিতে রচিত। পাঠক ও শ্রোতাদের সুবিধার্থে গ্রন্থকার প্রতিটি খুৎবাহ এর সাথে তার বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে মোট

Dhaka University Institutional Repository

৫৬টি জুমুআর, দুইটি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার, দুইটি বিবাহের, একটি ছানী খুৎবাহ ও একটি জুমুআর সংক্ষিপ্ত খুৎবাহ রয়েছে।[১]

জুমুআ'র সালাত[২] মুসলমানদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। প্রত্যেক স্বাধীন সুস্থ বালেগ মুসলমানের উপর জুমুআর সালাত আদায় করা ফরয[৩]। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

হে ঈমানদারগণ! জুমুআর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিকরের (সালাতের) দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা অনুধাবন কর।[৪]

জুমুআর সালাতের জন্য খুৎবাহ পাঠ করা আবশ্যক। এটা জুমুআর সালাত আদায় হওয়ার জন্য শর্তও বটে[৫] । জুমুআর সালাত জোহরের সালাতের পরিবর্তে আদায় করা হয়। জোহরের সালাতের ফরয চার রাকাআত। অথচ জুমুআর ফরয সালাত দুই রাকাআত। বাকি দুই রাকাআতের পরিবর্তে খুৎবাহ্ পাঠ করতে হয়। মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির বাংলাদেশের মসজিদসমূহের ইমামদের সুবিধার্থে বার চান্দ্র মাসের প্রত্যেক সপ্তাহের জন্য একেকটি আলাদা খুৎবাহ সম্বলিত একখানা পুস্তক রচনা করেন। জুমুআর খুৎবাহ আরবিতে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশের মসজিদের

---

[১] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, বঙ্গানুবাদ বার চান্দের খুৎবাহ, (ঢাকা: ছারছীনা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী- ২০০২,) বইয়ের ইনার পৃষ্ঠা।

[২] جمعة শব্দটির মীমের উপর পেশ দিয়ে এবং সুকূন দিয়ে- দুই ভাবে পড়া যায়। আবুস সউদ আল মিসরী বলেন , মীমের উপর পেশ দিয়ে পাঠ করাই অধিক শুদ্ধ। হিজাযবাসীদের এই উচ্চারণ। পবিত্র কুরআন মাজীদে জুমুআ (الجمعة) শব্দটি উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ সাত কিরাআত অনুযায়ী এ ধরণের পড়াই অধিকতর বিশুদ্ধ। তবে মীম অক্ষরে সুকুন দিয়ে পড়ারও বিরল রেওয়াজ আছে। জুমুআ অর্থ হচ্ছে একত্রিত করা, সমাবেশ ও সমন্বয় সাধন। পরিভাষায়, প্রতি শুক্রবার জোহরের ফরয সালাতের পরিবর্তে খুৎবাহ্ সহকারে যে দুই রাকাআত সালাত আদায় করা হয় তাকে জুমুআর সালাত বলে। দ্র. শায়খুল হাদীস মাওলানা মুজীবুর রহমান, জুমুআর ফাযায়েল ও মাসায়েল , (ঢাকা: দারুল কিতাব, মে ১৯৯৬), পৃ. ৭-৮।

[৩] বুরহান উদ্দীন আলী ইবন্ আবূ বকর (র), আলহিদায়া , তরজমা: মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ, (ঢকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম খন্ড, জানুয়ারি ১৯৯৮), পৃ. ১৫৬।

[৪] আল কুরআন, ৬২:৯।

[৫] শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবূ বকর আল ফারগানী আল মারগীনানী (রহ.) আল হিদায়া (মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ অনূদিত) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , প্রথম খন্ড, জানুয়ারি ১৯৯৮), পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ ইমামই আরবি ভাষায় নিজেদের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে সক্ষম নন। সুতরাং কোন না কোন পুস্তকের সহযোগিতায় তাঁদের খুৎবাহ দিতে হয়। মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আমাদের দেশের সম্মানিত ইমামগণের প্রয়োজন পূরণের জন্য এ মহতী কাজে হাত দেন। এ পুস্তকের ভূমিকায় 'আরয' শিরোনামে তিনি উল্লেখ করেছেন "দুঃখের বিষয়, বাংলার বৃহত্তম জনসংখ্যা আজও আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকার কারণে জুমুআর অতি প্রয়োজনীয় ওয়াজ-নসীহত সম্বলিত খুৎবাহগুলি বুঝতে পারেন না। বাংলার মুসলমানগণের এই দুঃখ দূর করার মানসে এই ক্ষুদ্র কিতাবটি পেশ করা হল।"[৬]

পুস্তকের শুরুতে তিনি জুমুআর সালাতের জরুরি মাসাইল বর্ণনা করেছেন যেন ইমাম সাহেবগণ মাসআলা-মাসাইল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং মুসল্লীদেরকে অবহিত করতে পারেন। তিনি জুমুআর খুৎবাহ এর চারটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। ১. খুৎবাহ জুমুআর ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে। ২. খুৎবাহ নামাযের পূর্বে হতে হবে। ৩. খতীব ছাড়া কমপক্ষে তিন জন পুরুষ খুৎবাহ শ্রবণ করতে হবে। ৪. এতটুকু জোরে পড়তে হবে যেন কাছের লোকেরা শুনতে পায়।[৭] এ খুৎবাহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি ঈমান-আকীদা, আমল, ইবাদত, হালাল-হারাম, পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য, আখলাক, পর্দা , বিশেষ দিবস ও রাত্রির মর্যাদা, সুন্নাত ও বিদআতের পার্থক্য, আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়াবলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর খুৎবাহ পর্যালোচনা করলে আমরা নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

০১

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত বার চান্দের খুৎবাহ (خطبات إثنا عشر شهراً) গ্রন্থে মোট ৬১টি খুৎবাহ আছে। এর প্রতিটি নিম্নোক্ত ইবারাতটি দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و نشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله بالحق بشيراً و نذيراً بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى.

অর্থাৎ , সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তার সাহায্য কামনা করি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের অন্তরের যাবতীয় মন্দ এবং আমাদের কর্মের সকল অনিষ্ট

---

[৬] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, বার চান্দের খুৎবাহ এর ভূমিকা।

[৭] মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পুস্তকের ভূমিকা (পৃষ্ঠা নম্বরবিহীন)

Dhaka University Institutional Repository

থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি যাকে পথ দেখান তাঁকে বিপথগামী করার কেউ নেই, আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) কে মান্য করল সে জ্ঞানীর কাজ করল, আর যে ব্যক্তি তাঁদের নাফরমানী করল সে বোকামী করল। এই পদ্ধতিতে খুৎবাহ শুরু করা রাসূল (স)এর আদর্শ।[৮]

আমরা দেখতে পাচ্ছি লেখক প্রতিটি খুৎবাহ এর সূচনাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন:

- আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা।
- সকল অন্যায় ও প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা ।
- "আল্লাহই একমাত্র হিদায়াতদাতা, তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য পথপ্রদর্শক নেই" একথার স্বীকারোক্তি।
- তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান।
- মহানবী (স) এর প্রতি দরূদ পাঠ।
- "কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন" একথা উল্লেখকরণ। অর্থাৎ, খতমে নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি।
- সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য রাসূলের (স) অনুসরণের আবশ্যকতা।

খুৎবাহর সূচনা যেমনি মহানবী (স) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে হয়েছে তেমনি এর সমাপ্তিও হয়েছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে। লেখক প্রতিটি খুৎবাহ কুরআন মাজীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের মাধ্যমে শেষ করেছেন।

০২

আকাইদ বা ইতিকাদ মুসলমানদের জীবনের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ই'তিকাদ সঠিক না হলে কোন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না। সঠিক ইতিকাদ ব্যতীত সকল সৎকর্ম মূল্যহীন।

---

[৮] ইবন কুতায়বা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) এর অনেকগুলো খুৎবাহ অনুসন্ধান করেছি। তাঁর অধিকাংশ খুৎবাহর সূচনা এভাবে الحمد لله نحمده و نستعينه ونؤمن به و نتوكل عليه و نستغفره ونتوب إليه و نعوذ بالله من شـــرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
দ্র. ইবন কুতায়বা, উয়ূনুল আখবার, (কায়রো: দারুল কুতুব , ২য় খন্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মুসল্লীগণের ইতিকাদ পরিশুদ্ধ করা এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে লেখক তাঁর রচিত খুৎবাহতে ইতিকাদের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি চারটি জুমুআর খুৎবাহতে ইতিকাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা ইতিকাদে মুসল্লী ও শ্রোতাদের বিশ্বাস দৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। চারটি খুৎবাহ হল ক. মুহাররম মাসের চতুর্থ খুৎবাহ; খ. সফর মাসের প্রথম খুৎবাহ; গ. সফর মাসের ৩য় খুৎবাহ; ঘ. সফর মাসের চতুর্থ খুৎবাহ।

এসব খুৎবাহতে আকাইদের নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি দিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শ এবং কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত । নিচে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয়কে কুরআন হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যতা দেখানো হলো:

- الله خالق الأفعال للعباد كلها আল্লাহ তাআলা বান্দার সকল কাজের স্রষ্টা।[৯]

- أفعال اختيارية يثابون بها و يعاقبون عليها للعباد বান্দাহ নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে এবং কর্ম অনুসারে সওয়াব ও শাস্তি প্রাপ্ত হয়।[১০]

- الاستطاعة مع الفعل কার্যের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বান্দার কর্মক্ষমতা সৃষ্টি করে দেন।[১১]

---

[৯] লেখক আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাকে সাধারণ মুসলমানদের অবহিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো:

الله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان

দ্র. আবুল বারাকাত আন নাসাফী, শরহে আকাইদ, (ঢাকা : আশরাফিয়া লাইব্রেরি, জানুয়ারী ১৯৯৫), পৃ. ১।

উক্ত আকীদার স্বপক্ষে দলীল الله خلقكم وما تعملون

দ্র. আল-কুরআন, ৩৭:৯৬।

الله خالق كل شيء فاعبدوه

দ্র. আল-কুরআন, ৩৯:৬২।

[১০] এই মতবাদের স্বপক্ষে দলীল এই যে, বান্দার জন্য যদি কর্মের স্বাধীনতা না থাকে তাহলে পরকালে পুরস্কার ও শাস্তি লাভ যুক্তিসঙ্গত হয় না। অথচ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বান্দার কৃতকর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যেমন: جزاءً بما كانوا يعملون

দ্র. আল-কুরআন, ৩২:১৭।

إنما تجزون ما كنتم تعملون

দ্র. আল-কুরআন, ৫২:১৬।

[১১] এর সমর্থনে কুরআনের দলীল হলো: ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

দ্র. আল-কুরআন, ১১:২০।

إنك لن تستطيع معى صبراً

Dhaka University Institutional Repository

❖ لا يكلف العبد بما ليس في وسعه বান্দার ক্ষমতার বাইরে কোন কাজে বাধ্য করা হয় না।[১২]

❖ لا صنع للعبد في تخليقه আল্লাহর সৃষ্টি কার্যে বান্দার কোন হাত নেই।[১৩]

❖ المقتول ميت باجله নিহত ব্যক্তি নির্ধারিত সময় মৃত্যুবরণ করে।[১৪]

❖ القرآن كلام الله غير مخلوق কুরআন আল্লাহর বাণী, সৃষ্ট নয়।[১৫]

❖ الحلال والحرام كلاهما رزق হালাল ও হারাম উভয়ই রিযক।[১৬]

❖ كل يستوفي رزق نفسه প্রত্যেকে নিজ নিজ রিযক পানাহার করে থাকে ।

❖ التنعيم والتعذيب في القبور و سؤال منكر و نكير فيه واقع

কবরের মধ্যে আরাম ও আযাব এবং মুনকার ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সংঘটিত হয়।[১৭]

দ্র. আল-কুরআন, ১৮:৬৭

[১২] শরীফ সাহেব তাঁর খুৎবাহতে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এ মতবাদটির পক্ষে কুরআনের দলীল হলো :

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

দ্র. আল-কুরআন, ২:২৮৬।

[১৩] এ বিশ্বাসের পক্ষে কুরআনের দলীল হলো:

يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير

দ্র. আল-কুরআন, ৫:১৭।

[১৪] এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কয়েকটি বাণী রয়েছে। যেমন - لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

দ্র. আল-কুরআন, ৩:১৪৫।

[১৫] কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহর বাণী। এটা কোন মানুষের সৃষ্ট নয়। এ বিষয় সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য দলীল রয়েছে। যেমন-

وإنه لتنزيل من رب العالمين

দ্র. আল-কুরআন, ২৬:১৯২।

تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين

দ্র. আল-কুরআন, ৩২:২।

[১৬] আল্লাহ বলেন قل أرأيتم ما أنزل الله إليكم من رزق فجعلتم منه حلالا و حراماً

দ্র. আল-কুরআন, ১০: ৫৯।

[১৭] কবরের সওয়াল –জওয়াব ও আরাম কিংবা আযাব এর সত্যতার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের অনেক বাণী রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন - النار يعرضون عليها غدوا و عشيا

দ্র. আল-কুরআন, ৪০: ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

❖ البعث والوزن والكتاب والسوال والحوض والصراط والنار كلها حق

বিচারের জন্য পুনর্জীবন লাভ, মানদন্ডের পরিমাপ, আমলনামা, আল্লাহর জিজ্ঞাসাবাদ, হাওজ, পুলসিরাত, জান্নাত , জাহান্নাম সব সত্য।[১৮]

❖ الكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الايمان ولا تدخله في الكفر

কবিরা গুনাহ মুমিন বান্দাকে বেঈমান করে না, কুফরীতে প্রবেশও করায় না।

❖ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহকে ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্য যে কোন গুনাহ তিনি ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমা করে থাকেন।[১৯]

❖ يجوز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة إذا لم تكن عن الاستحلال

সগীরা গুনাহের কারণেও আযাব হতে পারে। আবার হালাল না জেনে কবিরা গুনাহ করা হলে তা মাফ হতে পারে।

❖ الشفاعة ثابتة لأهل التقي والإيقـــان আল্লাহভীরু ও মুত্তাকী লোকগণ কিয়ামতের দিন শাফাআত লাভ করবে।

❖ الإيمان هو التصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله والإقرار به للقضاء والعمل به للانام

আল্লাহ তাআলার নিকট হতে মহানবী (স) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসের নাম ঈমান। মুমিন হিসেবে খ্যাত হওয়ার জন্য এর স্বীকারোক্তি প্রয়োজন এবং ঈমানের পূর্ণতার জন্য তদানুযায়ী আমল করা প্রয়োজন।

❖ المؤمن لا يخلد في النار মুমিন ব্যক্তি আবহমান কাল দোযখে থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-

إذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيسئلان عن ربه و د ينه و نبيه .

[১৮] আল্লাহ বলেন و إن الساعة آتية لا ريب فيها و إن الله يبعث من في القبور

দ্র. আল-কুরআন, ২২:৭।

আল্লাহ আরো বলেন

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كـــانوا بآيتنا يظلمون .

দ্র. আল-কুরআন, ৭:৮-৯।

[১৯] আল্লাহ বলেন إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

দ্র. আল-কুরআন, ৪:৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

❖ الأعمال تتزايد في نفسها والإيمان لا يزيد و لا ينقص

আমল বাড়তে কমতে পারে কিন্তু ঈমান বাড়েও না, কমেও না।

❖ الإيمان والإسلام واحد ঈমান ও ইসলাম এক।

❖ السعيد قد يشقى والشقي قد يسعد নেককার লোক কখনো কখনো বদকার হতে পারে। আবার বদকার লোক কখনো নেককার হতে পারে।

❖ أيد الله تعالى أنبيائه بالمعجزات الناقضة للعادات আল্লাহ তাআলা রাসূলগণকে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত অলৌকিক শক্তি দান করে প্রচার কার্যে সাহায্য করেন।

❖ سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين হযরত মুহাম্মদ (স) রাসূলগণের সর্দার। তিনিই সর্বশেষ নবী।[২০]

❖ فمن أدعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كافر لعين মহানবী (স) এর পরে যে ব্যক্তি নবুওয়তী দাবী করবে সে অভিশপ্ত কাফির।

❖ الملائكة عباد الله و عاملون بأمره ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ফেরেশতাগণ আল্লাহর আজ্ঞাবহ বান্দা। তারা পুরুষও নন নারীও নন।[২১]

❖ ولله كتب أنزلها على أنبيائه و بين فيها أمره و نهيه ووعده ووعيده و أخرها القرآن.

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীগণের প্রতি আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করে তাতে তাঁর আদেশ-নিষেধ, ওয়াদা ও শাস্তির বর্ণনা প্রকাশ করেছেন।[২২]

403543

❖ المعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بشخصه إلى السماء و إلى ما شاء الله حق

রাসূলুল্লাহ (স) এর জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে আসমান পর্যন্ত এবং তথা হতে আল্লাহর ইচ্ছা মত স্থান পর্যন্ত মিরাজ গমন সত্য।[২৩]

---

[২০] আল্লাহ বলেন ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين

দ্র. আল-কুরআন ৩৩: ৪০।

[২১] আল্লাহ বলেন عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون

দ্র. আলকুরআন, ৬৬:৬।

[২২] আল্লাহ বলেন وَ أنزلنا إليك الكتاب بالحق

দ্র. আল-কুরআন ৫: ৪৮।

[২৩] আল্লাহ বলেন: سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي الذي باركنا حوله لنريه من ايتنا انه هو السميع البصير

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

❖ كرامات الأولياء حق و لا يكون العبد ولياً إلا أن يكون محقا في ديانته

আউলিয়াগণের কারামাত সত্য। কোন ব্যক্তি ইসলামে স্থিরচিত্ত না হয়ে ওলী হতে পারেন না।

❖ أفضل البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة الأول মুহাম্মদ (স) এর পরে প্রথম চার খলিফা হলেন শেষ্ঠ মানব।

❖ الخلافة ثلثون سنة ثم بعدها ملك و أمامة খিলাফত ত্রিশ বছর চলেছে। অত:পর রাজ্য ও রাজত্ব চলছে।

❖ المسلمون لا بد لهم من إمام لمحافظة الدين ظاهراً لا مخفياً و منتظراً

দ্বীনের হিফাযতের জন্য মুসলমানদের একজন প্রকাশ্য ইমাম থাকা প্রয়োজন । ইমাম গোপনীয় বা অপ্রত্যাশিত হলে চলবে না।

❖ العبد لا يكلف عن ذكر الصحابة إلا بالخير বান্দাগণ সাহাবীদের কেবল সুসমালোচনাই করবে।

❖ لا يبلغ العبد إلى درجة الأنبياء বান্দা কখনো নবীগণের সমমর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না।

❖ لا يصل العبد ما دام عاقلاً بالغاً إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي বয়স্ক বান্দার যতক্ষণ জ্ঞান বহাল থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার থেকে শরীআতের আদেশ-নিষেধ বাতিল হয়ে যায় না।

❖ النصوص تحمل على ظواهرها والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن الحاد و كفر

কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থই নিতে হবে । বিদআতী ফকীরগণের মত জাহেরী অর্থ ছেড়ে দিয়ে মনগড়া বাতিনী অর্থ লওয়া ধর্মনাশক ও কুফরী।

❖ رد النص و استحلال المعصية والاستهانة بها والاستهزاء على الشريعة والياس من الله والأمن من الله و تصديق الكاهن كلها كفر.

কাতয়ী অখন্ডনীয় দলীল অমান্য করা, গুনাহের কাজকে হালাল মনে করা, গুনাহের কাজ তুচ্ছ মনে করে সম্পাদন করা, শরীআতকে ঠাট্টা করা, আল্লাহর দয়া হতে নিরাশ হওয়া, অন্তরে আল্লাহর ভয় না রাখা এবং গণককে বিশ্বাস করা কুফরী।

❖ من اشراط الساعة من خروج الدجال و دأبة الأرض و يأجوج و مأجوج و نزول عيسى عليه السلام والمهدي و طلوع الشمس من مغربها فكلها حق .

দাজ্জাল বের হওয়া, দাব্বাতুল আরদ ও ইয়াজুজ মাজুজ বের

দ্র. আল-কুরআন, ১৭: ১।

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া, হযরত ঈসা (আ) ও ইমাম মাহদীর (রহ) অবতরণ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণিত এসব কিয়ামতের নিদর্শন সত্য।

❖ رسل البشر أفضل من رسل الملائكة و رسل الملائكة أفضل من عامة البشر و عامة البشر أفضل من عامة الملائكة . ফেরেশতা রাসূল (দূত) হতে মানব রাসূল উত্তম, ফেরেশতা-রাসূল সাধারণ মানুষ অপেক্ষ উত্তম, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। এগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা। মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আকীদার এই উপাদানগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আকীদা ঠিক রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাঁর ঈমানী চেতনার বহি:প্রকাশ ঘটেছে। তিনি মুসলমানদের ঈমান-আকীদাকে যথাযথ করা ও সংরক্ষণের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর রচিত খুৎবাহ-তে উপরিউক্ত বিষয়গুলে সংযোজনের মাধ্যমে।

০৩

আল্লাহ তাঁর রাসূলের (স) প্রেম ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার পূর্বশর্ত। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরিচয় জানা প্রতিটি মুমিনের জন্য একান্ত অপরিহার্য। সে জন্য মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির তাঁর খুৎবাহতে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর যাত ও সিফাতের বিবরণ, রাসূলুল্লাহ (স) এর ফযীলত, তাঁর গুণাবলি, তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর ইনতিকাল এবং তাঁর উম্মতের মর্যাদা প্রসঙ্গে কয়েকটি খুৎবাহতে আলোচনা করেছেন। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) যথার্থ পরিচয় না জানলে মানুষ শিরক ও বিদআতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন

❖ الله الواحد القديم إلحى القادر العليم السميع البصير الشائي المريد. আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, আবহমান হতে আছেন ও থাকবেন, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা এবং তিনি নিজ ইচ্ছায় স্বাধীন।[২৪]

---

[২৪] শরীফ সাহেব প্রদত্ত আল্লাহর পরিচয় কুরআন ও হাদীসের দলীল ভিত্তিক। যেমন, আল্লাহ এক ও আবহমান এ কথা দ্বারা তাওহীদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন, قل هو الله أحد বলুন আল্লাহ এক।

দ্র. আল-কুরআন, ১১২:১।

আল্লাহ আরো বলেন, كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام

দ্র. আল-কুরআন, ৫৫:২৬।

আল্লাহ চিরঞ্জীব। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة و لانوم

Dhaka University Institutional Repository

- المنزه عن جسم وجوهر و تصوير و تعديد তিনি শরীরী নন, পরনির্ভরশীল নন, ব্যাস পরিধির আধার নন, আকৃতিবিশিষ্ট নন, গণনার আয়ত্বে নন।
- و تبعيض و تجزي و تركيب و تناهي و تحديد তিনি টুকরা হওয়ার মত নন, অংশ হওয়ার মত নন, কোন কিছুর মিলিত রূপ নন, তাঁর কোন শেষ বা সীমা নেই।
- لا يوصف بالماهية و لا بالكيفية لا يتمكن في مكان و لا يجري عليه زمان و لايشبهه شيء তাঁর কোন মাহিয়াত (কি বস্তু তার বিবরণ) নাই, কোন কাইফিয়াত (তিনি কেমন) নাই, তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত নন, তিনি কাল ও সময়ে উর্ধ্বে। কোন কিছু তাঁর সাথে তুল্য নয়।

আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে তিনি লিখেছেন

- فلله صفات أزلية قائمة بذاته وهي العلم والقدرة و الحيوة والقوة والسمع والبصر والارادة والمشيئة وفعل التخليق والترزيق অনাদিকাল হতে আল্লাহ তাআলার বহু সিফাত তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত আছে। তাহল: ইলম, ক্ষমা, আয়ু , শক্তি, শ্রবণ, দর্শন, ফলবান ইচ্ছা, সৃষ্টি করা, রিযক দেওয়া।
- والكلام بغير الحروف والأصوات এবং বিনা অক্ষরে ও বিনা স্বরে কথা বলা।
- والله يضل من يشاء و يهدي من يشاء বান্দাহ গোমরাহীর ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং সৎ পথ লাভের ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাকে সৎপথ দেখান।[২৫]

শরীফ সাহেবের লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি প্রেম ও ভক্তি ফুটে উঠেছে। রাসূল (স) এর ফযীলত, সৌন্দর্য ও তাঁর শান বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কুরআন ও হাদীসের বাণী উপস্থাপন করেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের (স) উচ্চ মর্যাদা , ঈমানরে পূর্ণতার জন্য তাঁদের মহব্বতের আবশ্যকতা তুলে ধরেছেন।

রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম খুৎবাহতে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এভাবে "অদ্য আমি আপনাদেরকে আল্লাহর বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (স) এর কথা বর্ণনা করব, যার সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন, হে মুহাম্মদ (স)! আপনাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না থাকলে আমি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করতাম না।"[২৬]

দ্র. আল-কুরআন, ২:২৫৫। প্রতিটি কথার ব্যাপারে এরূপ অনেক দলীল বিদ্যমান রয়েছে।

[২৫] আল্লাহ বলেন من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل الله فأولئك هم الخاسرون

দ্র. আল-কুরআন, ৭:১৭৮।

[২৬] فاذكركم اليوم بذكر حبيب الخلاق الذي قال الله تعالى لولاك لما خلقت الأفلاك

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর তিনি কুরআন মাজীদের একটি আয়াতের ও একটি হাদীসের দ্বারা মহানবী (স) এর প্রতি ভালবাসার আবশ্যকতা বর্ণনা করেছেন, তা হল-

আল্লাহ বলেন, মহানবী (স) মুমিনদের নিকট তাদের নিজ নিজ জীবন হতে প্রিয় এবং তাঁর বিবিগণ মুমিনগণের মা।[২৭]

তিনি মহানবী (স) এর বাণী উল্লেখ করেছেন, "যতক্ষণ আমি তোমাদের কারো নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুগণের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।"[২৮]

মহানবী (স)এর মর্যাদা বর্ণনায়ও তিনি অনুরূপভাবে কুরআন ও হাদীসের বাণী উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর বাণী "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সমস্ত মানবকুলের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে পাঠিয়েছি। কিন্তু বহুলোক তা বুঝে না।"[২৯]

মহানবী (স) এর বাণী "কিয়ামত দিবসে আমি সমস্ত মানুষের সরদার হব।"[৩০]

মহানবী (স)এর বাণী "আমি আল্লাহর দৃষ্টিতে পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এতে আমার কোন অহঙ্কার নেই।"[৩১]

লেখক মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আল্লাহর রহমত লাভের জন্য মহানবী (স)এর প্রতি অধিক পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছেন।[৩২]

তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলি ও তাঁর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন যথক্রমে রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খুৎবাহতে। তিনি মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, "যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে আর যা কিছু সৃষ্টি হবে সকলের মাশুক (প্রিয়) রাসূলুল্লাহ (স)-এর

---

[২৭] النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم

দ্র. আল-কুরআন, ৩৩:৬।

[২৮] لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩।

[২৯] قال الله تعالى و ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا و نذيراً

দ্র. আল-কুরআন, ৩৪:২৮।

[৩০] وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة (رواه مسلم)

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩।

[৩১] أنا أكرم الأولين والآخرين و لا فخر (رواه الترمذي)

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

[৩২] তিনি লিখেছেন- فأوصيكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من أكبر الوسائل لجلب رحمة الله للأنام

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

সৌন্দর্য দেখার হে অভিলাষীগণ! হুজুর (স)এর গুণাবলি মনোযোগ দিয়ে শুনুন।"[৩৩] শ্রোতাদেরকে তিনি রাসূলুল্লাহ (স) এর সৌন্দর্য দেখার অভিলাষী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রত্যেক রাসূল-প্রেমিকই রাসূল (স) এর সৌন্দর্য দেখার অভিলাষী। তিনি খুৎবাহ-এর মধ্যে রাসূল (স) এর সৌন্দর্য এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেন পাঠক ও শ্রোতা তা শুনে নিজেদের ভাবাবেগ হৃদয় সিক্ত করতে পারেন এবং এর মাধ্যমে রাসূলের (স) প্রতি তাদের ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পায়। এর পরের খুৎবাতে তিনি লিখেছেন "রাসূলুল্লাহ (স) এর সৌন্দর্যের হে আশিকগণ! আজ আমি আপনাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স)এর সৌন্দর্যাবলির কিয়দাংশ বর্ণনা করব।"[৩৪] এ খুৎবাহতে তিনি পাঠক ও শ্রোতাদেরকে রাসূলের (স) আশিক বলে সম্বোধন করেছেন।

০৪

আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৩৫] আর কতিপয় বিশেষ ইবাদাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা একান্ত অপরিহার্য। যেমন সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি। মুসলমানদের জীবনে ইবাদাতের গুরত্ব অপরিসীম। মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির গুরুত্বের বিবেচনায় কয়েকটি খুৎবাহতে ইবাদাতের গুরুত্ব ও ফযীলত, ইবাদতের বিধি-বিধান এবং পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৩৬] রবিউস সানী মাসের চতুর্থ খুৎবাহতে তিনি সালাতের ফযীলতকে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যেমন হযরত নবী করীম (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে, কিয়ামাতের দিন নামায তাঁর জন্য নূর, তাঁর ঈমানের দলীল ও তাঁর মুক্তির কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করে না কিয়ামতের দিন নামায তার জন্য নূর, ঈমানের দলীল ও মুক্তির কারণ হবে না। বরং সে কিয়ামতের দিন কারুন, ফিরাউন ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে।[৩৭] (আহমদ)

---

[৩৩] তিনি লিখেছেন فيا ايها المشتاقون الي رؤية جماله صلي الله عليه وسلم محبوب ما كان وما يكون استمعوا مناقبه

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

[৩৪] তিনি লিখেছেন فياايها الخلان العاشقون بنور جماله صلي الله عليه وسلم ــ امتعكم اليوم ان شاء الله تعالي بعض محاسنه صلي الله عليه وسلم

[৩৫] আল্লাহ বলেন, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

দ্র. আল-কুরআন, ৫১: ৫৬।

[৩৬] তাঁর খুৎবাহ এর রবিউস সানী এর চতুর্থ খুৎবাহ-এর শিরোনাম الخطبة الرابعة لشهر الربيع الثاني في الصلاة

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

[৩৭] রবিউস সানী মাসের চতুর্থ খুৎবাহতে নামাযের গুরুত্ব বর্ণনায় তিনি নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণণা করেছেন قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً و نجاتاً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً و لا برهاناً و لا نجاتاً و كان يوم القيامة مع قارون و فرعون و أبي ابن خلف (رواه أحمد)

Dhaka University Institutional Repository

এ খুৎবাহতে তিনি এশরাক ও আওয়াবীনের নামাযের ফযীলত সম্পর্কিত দুইটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন।[৩৮]

রবিউস সানী মাসের পঞ্চম খুৎবাহতে তিনি জুমআর আদব বর্ণনা করেছেন।[৩৯]

জুমাদাল উলা মাসের প্রথম খুৎবাহতে যাকাতের গুরুত্ব এবং যাকাতের বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। যাকাতের ফযীলত বর্ণনায় তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।[৪০] তিনি যাকাতের বিধান সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তা হলো: ধন-দৌলতের উপর যাকাত তখনই ফরয হয়, যখন তা এক বছর কারো মালিকানায় থাকে। (তিরমিযী)[৪১]

রমযান মাসের প্রথম খুৎবাহতে তিনি রমযান ও সাওমের ফযীলত বর্ণনা করেছেন। সাওমের ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীসে কুদসী ও কয়েকটি হাদীস তিনি উল্লেখ করেছেন।[৪২] খুৎবাহ এর শেষে তিনি সাওম ফরয হওয়া সম্পর্কিত কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

---

[৩৮] . এশরাকের নামায সম্পর্কিত হাদীসের দলীলটি হল:

قد جاء في الخبر من صلي الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتي تطلع الشمس ثم صلي ركعتين كانت له كاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة (رواه الترمذي)

আওয়াবীন সম্পর্কিত হাদীসের দলীলটি হল -

وقال صلي الله عليه سلم من صلي بعد المغرب عشرين ركعة بني الله له بيتا في الجنة (رواه الترمذي)

وايضا فيه رواية بست ركعات عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।

[৩৯] রবিউস সানীর দ্বিতীয় খুৎবাহ এর শিরোনাম: الخطبة الخامسة لشهر الربيع الثاني في اداب الجمعة

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

[৪০] যাকাতের ফযীলত সম্পর্কিত উল্লেখিত হাদীসগুলোর মধ্যে একটি হল:

وعنه عليه السلام ما منع قوم الزكوة الاحبس الله عنهم المطر (رواه الطبراني)

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

[৪১] যাকাতের বিধান সম্পর্কিত হাদীস হল -

وقد جاء في الحديث من استفاد مالا فلا زكوة فيه حتي يحول عليه الحول (رواه الترمذي)

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

[৪২] তাঁর উল্লেখিত হাদীসে কুদসী হল-

قال النبي صلي الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الي سبع مأة ضعف قال الله الا الصوم فانه لي وانا اجري به يدع شهوته وطعامه من اجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه (رواه الشيخان)

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

[৪৩] সাওম ফরয হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم تعلكم تتقون

দ্র. আল কুরআন, ২: ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

রমযান মাসের দ্বিতীয় খুৎবাহতে তিনি রমযানের আদব এবং সাওম পালনকালে করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি সিয়াম পালনকারীদেরকে আল্লাহর মেহমান হিসাবে আখ্যায়িত করে রমযানে পাপাচার থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। রমযানের সাওম পালনকালে পাপাচার বর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন- রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও অন্যায় আচরণ ছাড়ল না তার পানাহার ত্যাগ করে রোযা রাখায় আল্লাহর কোন সন্তুষ্টি নেই (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪]

মহানবী (স) আরো বলেছেন, এমন বহু রোযাদার আছে যাদের রোযায় উপবাস ছাড়া কোন উপকার হয় না এবং এমন বহু রাত্রে জাগ্রত হয়ে সালাত আদায়কারী আছে যাদের রাত্রি জাগরণ ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না। (দারামী)[৪৫]

রমজান সম্পর্কিত খুৎবাহ এর শেষভাগে তিনি ইতিকাফের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা করেচেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মহানবী (স) এর নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হুজুর (স) বলেছেন, ইতিকাফকারী গুনাহ থেকে দূরে থাকার কারণে তার আমলনামায় অন্যান্য নেককারের সমস্ত নেকের সমান সওয়াব লেখা হয়। (মিশকাত)।[৪৬]

জিলহজ্জ মাসের প্রথম খুৎবাহতে হজ্জের ফযীলত আলোচিত হয়েছে।[৪৭] লেখক হজ্জ সম্পর্কিত অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করত হজ্জ করার উপকারিতা এবং হজ্জ না করার পরিণাম আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ:

মহানবী (স) বলেছেন, তোমরা হজ্জ ও ওমরাহ কর। কেননা এ দুটি ইবাদাত দারিদ্র ও পাপকে এমনভাবে বিদূরীত করে যেমনভাবে যাতা লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লাকে বিদূরীত করে। আর কবুল

---

[৪৪] পাপাচার বর্জন সম্পর্কিত হাদীস হল -

قال النبي صلي الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه (متفق عليه)

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

[৪৫]মহানবী (স) বলেছেন: كم من صائم ليس له من صيامه الاالظماء وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر (رواه الدارمي)

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

[৪৬] ইতিকাফ সম্পর্কিত খুৎবাহতে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগুলোর মধ্যে একটি হলো:

قال عليه السلام المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزي له من الحسنات كعامل الحسنات كلها (نقله في المشكوة)

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

[৪৭] জিলহজ্জ মাসের প্রথম খুৎবাহ এর শিরোনাম - الخطبة الاولي لشهر ذي الحجة في فضيلة الحج

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জের একমাত্র বিনিময় হল জান্নাত (তিরমিযী)।[৪৮] এ সব খুৎবাহ পর্যালোচনা করলে আমরা লেখকের মধ্যকার বুদ্ধিমত্তা ও প্রকৃত পথপ্রদর্শকের বাস্তব রূপ দেখতে পাই। কুরআন ও হাদীসের বাণী চয়নের ক্ষেত্রে তিনি সকল দিকই রক্ষা করেছেন। ইবাদাতের গুরুত্ব ও ফযীলত এবং ইবাদাতের মাসআলা সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস বর্ণনার মাধ্যমে তিনি মুসল্লীদের ইবাদাত পালনে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি তাদেরকে ইবাদাত পালনে পারদর্শী করার প্রয়াস পেয়েছেন। রবিউস সানী মাসের খুৎবাহতে তিনি পাক-পাকিজা শিরোনামে ওযূ, গোসল, পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি ও গুরুত্ব আলোচনার মাধ্যমে মুসল্লীদের এসব বিষয় অবহিত করার চেষ্টা করেছেন।[৪৯]

ইবাদাতের জন্য তাহারাতের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-

عليكم بالطهارة فان كثيرا من العبادة موقوفة علي الطهارة والنظافة

অর্থাৎ, আপনারা পাক-পাকিজা ইখতিয়ার করুন। কেননা অধিক সংখ্যক ইবাদাত পাক-পাকিজার উপর নির্ভরশীল। আর রুচিশীলতার ভিতর দিয়েই বরকত ও সৌভাগ্য লাভ হয়।[৫০]

এ খুৎবাহতে লেখক কুলুখের ব্যবহার ও তায়াম্মুমের বিধি-বিধানও আলোচনা করেছেন। এর ফলে পবিত্রতার সকল দিকই অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে।

০৫

আখিরাতে বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম অঙ্গ। আখিরাতে বিশ্বাসের কারণেই মানুষ পার্থিব জগতে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে এবং সৎকর্ম সাধন করে। লেখক শাবান মাসের দ্বিতীয় খুৎবাহতে নেককারগণের মৃত্যুর অবস্থা,[৫১] তৃতীয় খুৎবাহতে বদকারগণের মৃত্যুর অবস্থা,[৫২] চতুর্থ খুৎবাহতে

---

[৪৮] হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে

عن النبي عليه الصلوة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة (رواه الترمذى)

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

[৪৯] রবিউস সানী মাসের দ্বিতীয় খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الثانية لشهر الربيع الثاني في الطهارة والنظافة

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

[৫০] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩।

[৫১] শাবানের দ্বিতীয় খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الثانية لشهر شعبان في احوال موت الصالحين

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০ -১১৩।

[৫২] শাবান মাসের তৃতীয় খুৎবাহর শিরোনাম الخطبة الثالثة لشهر شعبان في احوال موت الاشقياء

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

কবরের অবস্থা,[৫৩] শাওয়াল মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় খুৎবাহতে কিয়ামতের অবস্থা,[৫৪] তৃতীয় খুৎবাহতে হিসাব-নিকাশ,[৫৫] জিলহাজ মাসের তৃতীয় খুৎবাহতে বেহেশতের পরিচয়[৫৬] এবং জিলহাজ মাসের চতুর্থ খুৎবাহতে দোযখের আজাবের বিবরণ তুলে ধরেছেন।[৫৭] এসব খুৎবাহতে অন্যায় ও অসৎ কর্ম পরিহার করে মুসল্লীদেরকে সৎকর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আখিরাতের বিভিন্ন স্তরের বিবরণ দিয়ে তিনি সতর্ককারীর দায়িত্ব পালন করেছেন। কবরের কঠোর আযাব, মুমিনদের কবরে জান্নাতের সুখ লাভ, সৎকর্মশীলদের মৃত্যুকালীন কষ্টহীনতা, পাপীদের মৃত্যুতে কষ্ট, কিয়ামতের ভাহবহ চিত্র, নেক ও পাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবগ্রহণ, জান্নাতের আনন্দ, নিয়ামতরাজি এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তির বাস্তবচিত্র তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে কুরআন ও হাদীসের দলীলসহ অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

০৬

সমাজ সংস্কারকের মহৎ কর্মের মধ্যে অন্যতম হল সমাজের সদস্যদের চরিত্র গঠন, পারস্পরিক অধিকার আদায়ে উদ্বুদ্ধকরণ, হালাল-হারামের বিধান মেনে চলার প্রতি উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান, অনৈসলামিক ও বিদআতী কাজ থেকে সর্বসাধারণকে বিরত রাখা ইত্যাদি। মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের খুৎবাহতে এ দিকগুলোর স্বার্থক উপস্থিতি লক্ষণীয়।

রজব মাসের তৃতীয় ও চতুর্থ খুৎবাহ এবং শাবান মাসের প্রথম খুৎবাহতে সচ্চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৫৮] সচ্চরিত্রকে লেখক দ্বীন ইসলামের অলঙ্কার হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি লিখেছেন-" فيا معشر الحاضرون حسنوا اخلاقكم فان الخلق الحسن زينة الدين"

শাওয়াল মাসের দ্বিতীয় খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الثانية لشهر شوال في احوال القيامة

[৫৩] শাবান মাসের চতুর্থ খুৎবাহর শিরোনাম الخطبة الرابعة لشهر شعبان في احوال القبر

দ্র. প্রাগুক্ত , ১২০।

[৫৪] শাওয়াল মাসের প্রথম খুৎবাহর শিরোনাম الخطبة الاولي لشهر شوال في احوال القيامة

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

[৫৫] শাওয়াল মাসের তৃতীয় খুৎবা এর শিরোনাম الخطبة الثالثة لشهر شوال في يوم الحساب

দ্র. প্রাগুক্ত, ১৪২।

[৫৬] জিলহজ মাসের তৃতীয় খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الثالثة لشهر ذي الحجة في صفات الجنة

[৫৭] জিলহজ মাসের চতুর্থ খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الرابعة لشهر ذي الحجة في عذاب النار

[৫৮] রজব মাসের তৃতীয় খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الثالثة لشهر رجب في حسن الخلق

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯.

রজব মাসের চতুর্থ খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الرابعة لشهر رجب في الاخلاق

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, হে উপস্থিত ভ্রাতৃমন্ডলী! আপনাদের চরিত্র সুন্দর করুন। কেননা, সুন্দর চরিত্র দ্বীনের অলঙ্কার।[৫৯] তিনি রাসূললুল্লাহ (স) এর চারিত্রিক মাধুয বর্ণনা করে মসল্লীদেরকে রাসূলের (স) আদর্শে আদর্শবান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।[৬০] তিনি উত্তম চরিত্র দ্বারা মীযানের পাল্লা ভারী করার উপদেশ দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে দলীল পেশ করেছেন। লেখক নিন্দনীয় স্বভাব বর্জন করার উপদেশ দিয়েছেন এবং হাদীস উল্লেখ করে এর কুফল মুসল্লীদের সামনে তুলে ধরেছেন।[৬১] পারস্পরিক অধিকার আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে লেখক জমাদিউস সানী মাসের দ্বিতীয় খুৎবাহতে পিতামাতার হক,[৬২] তৃতীয় খুৎবাহতে সন্তানের হক[৬৩] চতুর্থ খুৎবাহতে পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের হক,[৬৪] রজব মাসের প্রথম খুৎবাহতে মুসলমানদের হক[৬৫] এবং দ্বিতীয় খুৎবাহতে স্বামী-স্ত্রীর হক[৬৬] অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনা করেছেন। মুসলমানদের জীবনে হালালকে গ্রহণ এবং হারামকে বর্জন অত্যাবশ্যক।

দ্র. মাওলানা শারীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

শাবান মাসের প্রথম খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الاولي لشهر شعبان في حسن الخلق ايضا

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

[৫৯] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

[৬০] রাসূল (স) এর চারিত্রিক মাধুর্য সম্পর্কে শরীফ সাহেব নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন -

لماكسرت رباعيته صلي الله عليه وسلم وشج وجهه يوم احد شق ذالك علي اصحابه شقا شديدا وقالو لودعوت عليهم فقال اني لم ابعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৯।

[৬১] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৯।

[৬২] জমাদিউস্ সানী মাসের দ্বিতীয় খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الثانية لشهرجمادي الثانية في حقوق الوالدين

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

[৬৩] জমাদিউস্ সানীর তৃতীয় খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الثالثة لشهر جمادي الثانية في حقوق الاولاد

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

[৬৪] জামাদিউস সানীর চতুর্থ খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الرابعة لشهر جمادي الثانية في حقوق الجيران وذي القربي

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

[৬৫] রজব মাসের প্রথম খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الاولي لشهر رجب في حقوق المسلمين

দ্র. প্রাগুক্ত , পৃ. ৯১ ।

[৬৬] রজব মাসের দ্বিতীয় খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الثانية لشهر رجب في حقوق الزوجين

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

শরীফ সাহেব সে জন্য জমাদিউস সানী মাসের প্রথম খুৎবাহতে হালাল হারামের বিধান আলোচনা করেছেন।[৬৭] এ বিষয়গুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য। কারণ, চারিত্রিক মাধুর্যই ইসলামী জীবনের অলঙ্কার। আর সে জন্য পারস্পরিক অধিকার আদায় করা প্রকৃত মুসলমানদের কর্তব্য। বিদআত সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে জিলকাদ মাসের দ্বিতীয় খুৎবাহতে।[৬৮]

০৭

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের খুৎবাহ এর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ভাষার ছান্দিকতা ও শৈলীর উৎকর্ষ। লেখক আরবি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন বিধায় তিনি প্রায় প্রতি দুই বাক্যের অন্তমিল রেখে কাব্যিক ভঙ্গিতে খুৎবাহ রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন-

فيا ايها الخلان

رحمكم الله في الدهوروا الاوان

انبئكم اليوم بصفاته تعالي خالق الاكوان [৬৯]

زكوا انفسكم باخلاص قبل الفوت

وزينوا اعمالكم بالعبادة قبل الموت [৭০]

فيا ايها المؤمنون

وفقكم الله فانتم امنون [৭১]

فياايها الراجون الي الله الغفران

---

[৬৭] জামাদিউস সানী মাসের প্রথম খুৎবাহ এর শিরোনাম الخطبة الاولي لشهررجماي الثانية في الحلال والحرام
দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

[৬৮] যিলকাদ্দ মাসের দ্বিতীয় খুৎবাহ এর শিরোনাম। الخطبة الثانية لشهر ذي القعدة فى ثم البدعة
দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

[৬৯] এখানে দেখা যাচ্ছে الخلان ، الاوان ، الاكوان শব্দাবলি একই অক্ষরের সমাপ্ত বিধায় অন্তমিল রয়েছে।
দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

[৭০] এখানে দেখা যাচ্ছে الفوت এবং الموت প্রায় সমচ্চারিত শব্দ। এর লাইন দু'টি যেন একটি কবিতা।
দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

[৭১] এই দুই লাইনের শেষ শব্দ যথাক্রমে المومنون এবং امنون এর ফলে দুই লাইন মিলে কাব্যিক রূপ ধারণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

رحمكم الله بعسيم الاحسان [৭২]

فياايها الخلان

رحمكم الله المنان

سياتيكم ليلة القدر فادواحقها بالايقان [৭৩]

এভাবে প্রায় সম্পূর্ণ পুস্তটিই কাব্যময়। এর ফলে মসল্লীগণের নিকট খুতবাহগুলো আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর হয়েছে।

০৮

শরীফ সাহেবের বার চান্দের খুতবাহ পুস্তকটি ১৯৪৯ সাল থেকে অদ্যবধি বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতি শুক্রবার পঠিত হচ্ছে। এছাড়া মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতের খুৎবাহ থাকাতে এটি প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে পঠিত হচ্ছে। লেখক বিয়ের খুতবাহও সংযোজন করেছেন তাঁর গ্রন্থে। শ্রোতামন্ডলী ও মুসল্লীদের সুবিধার্থে লেখক প্রতিটি খুতবাহ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এটিই বাংলা ভাষায় অনূদিত প্রথম খুতবাহ। অনুবাদ থাকার ফলে সাধারণ মুসলমানরা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞান খুব সহজেই অর্জন করতে পারছেন কেবল জুমুআর খুৎবাহ আলোচনা শ্রবণ করে। খুৎবাহগুলো সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে লিখিত। প্রত্যেক চান্দ্র মাসের অধীনে যে সব গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম পর্ব রয়েছে, লেখক সেগুলো সম্পর্কে তার পূর্বের খুৎবাতে আলোচনা করেছেন। এর ফলে সাধারণ মুসল্লিরা উক্ত পর্ব সম্পর্কে অনায়াসে অবগত হয়ে সঠিকভাবে আমল করতে পারছেন। সর্বোপরি, শরীফ সাহেব রচিত বার চান্দ্রের খুতবাহ বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। যে সময় বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য ভান্ডার ছিল শূন্য প্রায়, তখন শরীফ সাহেব আরবি-বাংলায় এমন একখানি খুতবাহ পুস্তক উপহার দিয়েছেন, যা দীর্ঘ দিনের চাহিদা যেমন পূরণ করেছে পাশপাশি এদেশের মানুষের জন্য ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ।

খ. মৌলিক প্রবন্ধাবলি

---

[৭২] এখানে العفران এবং الاحسان শব্দদ্বয় দ্বারা কবিতার ন্যায় হয়েছে।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

[৭৩] এখানে الخلان ، المنان এবং الايقان শব্দত্রয় শেষে الف ও نون হওয়ার কারণে এটি কাব্যিক রূপ নিয়েছে।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির আরবি ভাষার কতিপয় প্রবন্ধ লিখেছেন। তার কোন কোনটি দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা ও জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তার রচিত আরবি প্রবন্ধাবলির পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো :

এক. زراعة الاعضاء وحكمه في الشريعة الاسلامية

এটি মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত একটি গবেষণা প্রবন্ধ। এটি مجلة مجمع الفقه الاسلامي এর الدورة السادسة এর অর্ন্তগত العدد السادس এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় মানুষের অঙ্গে অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে অঙ্গ সংযোজনের শরয়ী হুকুম আলোচিত হয়েছে। লেখক কুরআন, হাদীস এবং এতদুভয়ের ব্যাখ্যাকারদের বাণী ও মতামত উল্লেখ করত আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে যুগোপযোগী ও কল্যাণকর রায় প্রদান করেছেন এবং তার রায়ের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। শুরুতেই লেখক ৪টি বিষয়কে প্রধান মাপকাঠি ধরে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। তা হলো:

ক. মানুষ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্মান।

খ. মানুষ নিজে তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক কি না।

গ. শরীআতের দৃষ্টিতে শরীরের অঙ্গ কর্তন ও তা সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা।

ঘ. কর্তিত অঙ্গ পাক কি না পাক? এবং এ প্রেক্ষিতে তা সংযোজন জায়েজ কি না।

লেখক কুরআন ও হাদীসের দলীলকে সামনে রেখেই মত পেশ করেছেন। লেখক আল্লামা হামাভীর কর্মের পঞ্চ ধাপ সূত্র অনুযায়ী অঙ্গ সংযোজন জায়েয কিংবা না-জায়েয হওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছেন। কর্মের পঞ্চ ধাপ হলো ঃ (১) অতিরিক্ত (২) সৌন্দর্য (৩) উপকার (৪) প্রয়োজন (৫) জরুরত।[৭৪] লেখকের মতে, প্রথমোক্ত চারটি অবস্থায় অঙ্গ সংযোজন জায়েয নয়। কেননা কুরআন, হাদীস ও এতদুভয়ের ব্যাখ্যা দ্বারা অঙ্গ সংযোজন জায়েয এবং না জায়েয উভয়ই প্রমাণিত হয়।

না জায়েয হওয়ার কারণগুলো হলো ঃ

ক. মানুষ ও তার শরীরের সম্মান (كرامة الانسان وجسده)

আল্লাহতাআলা মানুষের আত্মা ও শরীরের সম্মান দান করেছেন। আল্লহ বলেন -

ولقد كرمنا بني ادم

আমি আদম সন্তানগণকে বিরাট সম্মান দিয়েছি।[৭৫]

---

[৭৪] الشريف محمد عبد القادر , زراعة الاعضاء وحكمه في الشريعة الاسلامية ، مجلة مجمع الفقه الاسلامي (الدورة: جده: السادسة، الجزء الاول) صفحة : ١٧٦٤

[৭৫] আল কুরআন, ১৯:৭০।

Dhaka University Institutional Repository

علم الانسان ما لم يعلم

মানুষ যা জানত না আল্লাহ তা মানুষকে জানিয়েছেন।[৭৬]

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم

আমি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।[৭৭]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা মানুষের সম্মান প্রমাণিত হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তনের ফলে মানুষের সম্মানের হানি হয়। সুতরাং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা হারাম।

মানুষের শরীরের সম্মান সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন- كسر عظم الميت ككسره حيا

কোন মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা কোন জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার শামিল।[৭৮]

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم لعن الواصلة والمتوصلة والواشمة والمستوشمة

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) অঙ্গ কর্তণকারী এবং বিনষ্টকারীর উপর লানত দিয়েছেন।[৭৯]

উপরিউক্ত দলীলের মাধ্যমে প্রতীয়মান হল যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা না জায়েয।

খ. নিজের শরীরের মালিকানা (ملكية الانسان لجسده)

লেখক হাদীস ও তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক সে নয়।[৮০] সুতরাং স্বাভাবিক প্রয়োজনে মানুষ নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন বা বিক্রয় করতে পারবে না।

অঙ্গ সংযোজন জায়েয হওয়ার পক্ষে যুক্তি।

ক. শরীরের অঙ্গ কর্তন ও তার সংযোজনের প্রয়োজনীয়তাকে লেখক দুইট পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। সাধারণ প্রয়োজন এবং বিশেষ জরুরত। বিশেষ জরুরত বলতে তিনি যুদ্ধাহত মুমূর্ষু অবস্থাকে বুঝিয়েছেন। লেখকের মতে, সাধারণ প্রয়োজনে অঙ্গ কর্তন ও সংযোজন জায়েয নয়। তবে বিশেষ জরুরতে তিনি অঙ্গ সংযোজনের বৈধতার পক্ষে।

---

[৭৬] আল কুরআন, ৯৬:৫।

[৭৭] আল কুরআন, ৯৫: ৪।

[৭৮] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬৬।

[৭৯] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬৭।

[৮০] ইবন হাজর আসকালানী রাসূল (স) এর বাণী - من قتل نفسه এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গের মালিক সে নয়। সুতরাং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে বিক্রি বা কাউকে দান করতে পারবে না।
দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

লেখক এ ক্ষেত্রে যুক্তি অবতারণা করেন, প্রকৃতিক দুর্যোগে বা যুদ্ধে অনেক সময় মানুষ জ্যান্ত মরা হয়ে পড়ে। তখন তাদের সুস্থতার জন্য শরীরের অঙ্গ সংযোজন করা শরীআত পালনে অক্ষম হয়ে থাকার চেয়ে ভাল। এক্ষেত্রে লেখক الضرورة تبيح المحذورات (অতীব প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে) নীতিকে সমর্থন করেছেন।

খ. মানুষের অঙ্গ পাক কিংবা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে তিনি লিখেছেন, যদিও মানুষের কর্তিত অঙ্গ নাপাক কিন্তু যখন শরীরে সংযোজন করা হয় তখন তাতে রক্ত চলাচল করলে তা আর নাপাক থাকে না।

অনুসিদ্ধান্তে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন, সৌন্দর্য বৃদ্ধি, সামান্য উপকার বা সাধারণ প্রয়োজনে অঙ্গ সংযোজন করা জায়েয নয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কিংবা শরীআতের স্বার্থে অঙ্গ সংযোজন করা জায়েয হতে পারে। লেখক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, যুগের প্রয়োজনে অনেক বিষয় জায়েয হতে পারে, যা পূর্বে জায়েয ছিল না। যেমন প্রাথমিক যুগে কুরআন শরীফের সূরাসমূহের তারতীব দেওয়া অনুচিত মনে করা হত। কিন্তু পরে হযরত আবু বকর (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা) এর শাসনামলে তারতীব দেওয়া হয়েছে।

দুই تنظيم النسل وتحديده

এটি মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত একটি দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধ। এটি مجلة مجمع الفقه الاسلامي এর الذروة الخامسة এর অর্ন্তগত العدد الخامس এর الجزء الاول এ প্রকাশিত হয়। লেখক এ প্রবন্ধে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। লেখক প্রথমে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব কুরআন ও হাদীসের আলোকে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক দুটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

১. تنظيم النسل (বংশধারার পরিকল্পনা/পরিবার পরিকল্পনা)

২. تحديد النسل (বাংশধারা সীমিতকরণ/জন্মনিয়ন্ত্রণ)

প্রথমে লেখক পরিবার পরিকল্পনার সুফল্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা করেছেন। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত লেখকের বক্তব্যের একটি সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- পরিবার পরিকল্পনা একটি ব্যাপক বিষয়। এর দ্বারা পরিবারকে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং পরিবারের সদস্যদেরকে যথাযথ শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করণের মাধ্যমে তাদের আদর্শ

Dhaka University Institutional Repository

ও চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাকে বুঝায়। সুন্দরভাবে পরিকল্পিত পরিবার গঠন আল্লাহতাআলার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন,

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذالك لايت لقوم يتفكرون

অর্থাৎ, তার নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি হলো, তিনি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তার (নারীর) সাথে বসবাস করতে পার আর তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতি স্থাপন করেছেন।[৮১] আল্লাহ আরো বলেন- هن لباس لكم انتم لباس لهن

অর্থাৎ, তোমরা তাদের ভূষণ এবং তারা তোমাদের ভূষণ।[৮২]

- পরিবার পরিকল্পনা বলতে পিতামাতা কর্তৃক সন্তনদেরকে উত্তমভাবে লালন-পালন করা এবং তাদের অধিকার আদায় করাকে বুঝায়। এটা পিতামাতার উপর ওয়াজিব। যেমন- আল্লাহ বলেন- والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين

  মাতাগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধপান করাবে।[৮৩]
- পরিকল্পিতভাবে সন্তনদেরকে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে খাঁটি মুসলমান বানানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলিম পিতামাতার জন্য আবশ্যক। মহানবী (স) বলেছেন-

  كل مولود يولد علي الفطرة فابواه يهودانه اوينصر انه او يمجسانه

অর্থাৎ, প্রত্যেক মানব সন্তান ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে হয়তো ইয়হুদী, কিংবা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসক বানায়। মহানবী আরো বলেছেন-

الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

জেনে রেখ, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

- বংশবৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত পরিবার গঠনের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন- انكحوا الايمى منكم

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পন্ন করে দাও।[৮৪] রাসূল (স) বলেছেন

---

[৮১] আল কুরআন, ৩০:১১।

[৮২] আল কুরআন, ২:১৮৭।

[৮৩] আল কুরআন, ২:২৩৩।

[৮৪] আল কুরআন, ২৪:৩২।

Dhaka University Institutional Repository

النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني

বিবাহ আমার সুন্নত। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নাত থেকে বিরত থাকল সে আমার দলভুক্ত নয়।[৮৫]

- সন্তানদেরকে হালাল পন্থায় উপার্জনক্ষম হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে প্রকৃত দ্বীনদার বানানো আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। রাসূল (স) এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন।[৮৬]

প্রবন্ধের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হলো : জন্ম সীমিতকরণ (تحديد النسل) । বর্তমান বিশ্বে যে জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি চালু রয়েছে লেখক তাকে সমর্থন করেন নি। এক্ষেত্রে তিনি নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো দেখিয়েছেন,

- যে চিন্তায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হয় তা হলো, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীতে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিবে। এটা ভুল ধারণা। কেননা আল্লাহতাআলা বলেন-

وما من دابة في الارض الا علي الله رزقها

পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযক আল্লাহ সৃষ্টি করেন নি।[৮৭]

ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين

নিশ্চয়ই আল্লাহ রিযিকদাতা এবং অপরাক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী।[৮৮]

لا تقتلوا او لادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم

তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না। আমি তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও রিযক দিই।[৮৯]

- আদম (আ) থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত দিন দিন পৃথিবীর লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে মানুষের অভাব-অনটন বাড়ে নি। বরং আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য ফসল উৎপাদনের নতুন পন্থা খুলে দিয়েছেন। ফলে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মানুষ খাদ্যে বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ।[৯০]

---

[৮৫] বুখারী ও মুসলিম

[৮৬] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, তানযীমুন নাসল ওয়া তাহদীদুহ, মাজাল্লাহ আল ফিক্হিল ইসলামী, কুয়েত: আল ফিকহুল ইসলামী, ৫ম সংখ্যা, ১ম খন্ড, ১৯৮৮) পৃ.৪৫৭।

[৮৭] আল কুরআন, ১১: ৬।

[৮৮] আল কুরআন, ৫১: ৫৮।

[৮৯] আল কুরআন, ৬: ১৫১।

[৯০] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বাসস্থানের অভাবের যে আশঙ্কা করা হয় তা সঠিক নয়। আল্লাহর রহমতে দিনের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিস্কার করে অল্প জমির উপর অধিক তলা বাসস্থান নির্মাণ করে সুন্দরভাবে বসবাস করছে। ফলে আগের তুলনায় বর্তমানে মানুষ ভালভাবে বসবাস করতে পারছে।[৯১]
- জন্মনিয়ন্ত্রণের ধারণাটি ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের দেয়া। এটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের গভীর ষড়যন্ত্র। মুসলিম প্রধান দেশে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চাপিয়ে দিয়ে মুসলমানদের সংখ্যাকে হ্রাস করার অপকৌশল হাতে নিয়েছে। পক্ষান্তরে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান প্রধান দেশে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জন্মহার বাড়ানোর নীতি চালু রেখেছে। এর ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে এবং বিধর্মীদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

  সর্বোপরি, লেখক পরিবারকে সুন্দরভাবে গঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে ইসলাম বিরোধীদের চক্রান্ত থেকে মুসলমানদের হুশিয়ার থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিন. حديث اذاعي خاص عن ليلة البراءة

এটি মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত লাইলাতুল বরাত সম্পর্কিত প্রবন্ধ। ২ মার্চ ১৯৯১ তারিখ এ প্রবন্ধটি অধ্যাপক আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খান[৯২] রেডিও বাংলাদেশ বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করেন। লেখক বরাতের অর্থ লিখেছেন

معني البرأة التخلص وقطع العلاقة والصلة ــ وايضا معناها النجاة والحظ والقدر

অর্থাৎ, বরাত অর্থ একনিষ্ঠতা, সম্পর্ক ছিন্ন করা, মুক্তি, ভাগ্য ইত্যাদি। যেহেতু এই রাতে একনিষ্ঠভাবে ইবাদাতের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় এবং সৌভাগ্য অর্জন করা যায়, সে কারণে এ রাতকে ليلة البرأة নামকরণ করা হয়েছে।[৯৩] প্রবন্ধে লেখক কুরআনের আয়াতের তাফসীর দ্বারা প্রমাণ করেছেন ليلة البرأة হলো ليلة مباركة।[৯৪] লেখক ليلة البرأة এর ফযীলত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে এর মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে, বরাতের

---

[৯১] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮।

[৯২] **অধ্যাপক আ.ন. ম. আব্দুল মান্নান খান:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক।

[৯৩] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, হাদীস ইযাই খাস আন লাইলাতিল বারায়াত (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, ২ মার্চ ১৯৯১ তারিখে রেডিও বাংলাদেশ বহির্বিশ্ব কার্যক্রম থেকে প্রচারিত) পৃ. ১।

[৯৪] লেখক উল্লেখ করেছেন

روي عن عكرمة وغيره من المفسرين ان المراد بليلة مباركة في الاية الخامسة والعشرون من سورة الدخان (انا انزلناه في ليلة مباركة) هو ليلة البرأة

দ্র. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন এবং পরবর্তী এক বছরের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ করেন।[৯৫] লেখক মুসলমানদেকে বিদআতী কাজকর্ম পরিহার করে নফল ইবাদাত করার প্রতি আহ্বান জানিয়ে তার প্রবন্ধ সমাপ্ত করেন।

চার حديث اذاعي خاص عن ميزات المعراج

এটি মিরাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ। মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির এ প্রবন্ধটি আরবি ভাষায় রচনা করেন। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ তারিখ এটি রেডিও বাংলাদেশ বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে উপস্থাপন করেন মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ। তিন পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ প্রবন্ধটিতে লেখক মহানবী (স) এর সশরীরে মিরাজ সংঘটিত হওয়াকে কুরাআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।[৯৬] লেখক মিরাজের প্রতি শ্রোতাদের বিশ্বাস দৃঢ় করার আহ্বান জানিয়ে তার প্রবন্ধ সমাপ্ত করেন।

---

[৯৫] লেখক যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে একটি হল

روي عن ابي موسي (رضـــ) قال النبي صلعم ان الله تعالي ليطلع في ليلة النصف من شعبان ليغفر لجميع خلقه الا المشرك

অন্য একটি হাদীস হলো

روي البيهقي عن عائشة رضي الله عنها حيث نعلم ان النبي صلعم اخبرها عن ليلة النصف من شعبان بانه يكتب فيها عدد الذين يولدون في السنة القادمة وعدد الذين يتوفون منهم وترفع الاعمال الصالحة لعباد الله الي السماء وتقدر ارزاق العباد واسبابها ووسائلها

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

[৯৬] سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصى

আল্লাহ বলেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিকালে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়েছেন ।

দ্র. আল কুরআন, ১৭:১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনুবাদকর্ম

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আরবি ভাষার অমূল্য রত্নকে বাংলাভাষী পাঠকদের স্বাদাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি আরবি ভাষায় রচিত দু'টি গ্রন্থকে বাংলায় অনুবাদ করছেন। গ্রন্থ দু'টি সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

এক.অশ্রু সরোবর

'অশ্রু সরোবর' মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের বিখ্যাত অনুবাদগন্থ। আরবি কবি ابن الفارض [৯৭] এর দিওয়ান তিনি কাব্যানুবাদ করেন এবং 'অশ্রু সরোবর' নামকরণ করেন। নামকরণ অনুবাদকের নিজস্ব। দিওয়ান শব্দের অর্থ অশ্রু সরোবর নয়।[৯৮]

---

[৯৭] **ইবনুল ফারিদ** (ابن الفارض) : শরফুদ্দীন আবুল কাসিম উমর ইবন আলী ইবনুল ফারিদ হামভী আল মিসরী আস সাদী একজন বিখ্যাত সূফী কবি। তিনি ৫৫৬ হিজরিতে মতান্তরে ৫৬৫ হিজরিতে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মিশরের কোর্টে দায়ভাগের বিচারক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন বিধায় তিনি আল ফারিদ (উত্তরাধিকারের অংশ বিতরণকারী) হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাল্যকালে তিনি হাদীসশস্ত্র ও শাফিঈ ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অত:পর তিনি ইলমে তাসাউফ চর্চা শুরু করেন এবং নির্জনে ইবাদত-বন্দেগিতে বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। তিনি এ সময় কায়রোর পূর্ব দিকের পাহাড়ী অঞ্চলে, মরুভূমিতে এবং বনজঙ্গলে ঘোরাফেরা করতেন। অবশেষে তিনি হিযাযে নি:সঙ্গ সাধকের জীবনযাপন করেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) কে স্বপ্নে দর্শন করেন। এর পর থেকে তিনি আল্লাহর প্রেমে ধ্যানমগ্ন থাকতে শুরু করেন। তিনি স্বীয় শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর নিকট হতে প্রেরণা লাভ করে ফানা ফিশ শায়খ, ফানা ফির রসূল ও ফানা ফিল্লাহর উচ্চতর সোপানে আরোহন করেন। তবে তিনি একটি বিষয়ে তাঁর শায়খের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তা হলো তার শায়খ ছিলেন ওয়াহদাতুল ওজুদ পন্থী। অর্থাৎ, তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক মনে করতেন। কিন্তু ইবনুল ফারিদ স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে আলাদা মনে করতেন। ইবনুল ফারিদের বুজর্গীর কথা সমগ্র মিশরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি যখন শহরে বের হতেন তখন তাঁর সাথে করমর্দন ও করচুম্বন করার জন্যে লোকেরা ভীড় করত। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সূফী কবি। তিনি হাকীকতে মুহাম্মদী ও মাকাতাতে মুহাম্মদী নিয়ে কবিতা রচনা করতেন। সূফী-সমাবেশে তার দিওয়ান সুর দিয়ে গাওয়া হয়। কবি ইবনুল ফারিদ ৬৩২ হিজরিতে কায়রো শহরে ইনতিকাল করেন। তাঁকে তার ইচ্ছানুযায়ী আরীয নামক স্থানে দাফন করা হয়। দূর দুরান্ত থেকে লোকজন এসে তার কবর যিয়ারত করে থাকে।

দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ খন্ড, মে ১৯৮৮), পৃ. ৩৩৩।

[৯৮] (ديوان) অর্থ কাব্য সংকলন, তথ্য পুস্তক, বিবরণী, দফতর, বিভাগ, বেঠকখানা।

দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবি-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ,ডিসেম্বর ১৯৯৯), পৃ. ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এই ইবনুল ফারীদের এই ديوان [৯৯] এর মধ্যে অনুবাদক শরীফ মুহাম্মাদ অবদুল কাদির খুঁজে পেয়েছেন কবির হৃদয়ের তীব্র প্রেম দহন।

---

[৯৯] ديوان ابن الفارض : ইবনুল ফারিদের দিওয়ান তিনটি বৃহৎ কবিতার সংকলন। তিনটি কবিতায় কবি মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাঁর প্রেম, রাসূলের (স) প্রতি তাঁর হৃদয়ের তীব্র আকর্ষণ এবং তার পীর (শায়খ) এর প্রতি ভালবাসার টান (ফানা ফিশ শায়খ) ফুটিয়ে তুলেছেন।
প্রথম কবিতায় কবি সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিকে সুন্দরী নারীর সাথে তুলনা করেছেন। আর আল্লাহ তাআলাকে সুন্দরীদের উটের বহরের চালক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কবিতাটির প্রথম চরণ -

سائق الاظعان يطوي البيدطي * منعما عرج علي كشبان طي

সুন্দরীদের উটের বহর,
মরু পাড়ি দিয়ে যায়
থামাও চালক বহর তোমার
'তাই' এর আঙ্গিনায়

নারীগণ কোথায়ও যেতে উটের পর্দা ঘেরা হাওদায় বসে থাকে আর চালক তাদেরকে চালিয়ে নিয়ে যায়। হাওদার ভিতরে অবস্থানকারী নারীরা বুঝতে পারে না তাদেরকে কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টিজগত তেমনি আল্লাহর কুদরতের পর্দায় ঘেরা। আল্লাহ এর পরিচালক। তিনি প্রকৃতিকে কোন দিকে পরিচালিত করবেন তা কারো জানা নেই এবং এ বিষয়ে কারো কোন ইখতিয়ারও নেই।
'তাই' বলতে লেখক মাকামাতে মুহাম্মাদীয়া অথবা তাঁর শায়খ মুহিয়ুদ্দীন ইবনুল আরাবী (৫৬০-৬৩৮হি.) দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেননা হযরত মুহাম্মদ (স) এর নূর থেকেই সমগ্র সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেনন। তাই বালুভূমির অগণিত বালু কণার মত সমস্ত মাখলুকই মাকামে মুহাম্মদী।
দিওয়ানের প্রথম কবিতাটিতে ২৫১ টি বায়াত (চরণ) রয়েছে। আল্লাহপ্রেম, রাসূলপ্রেম ও শায়খের প্রতি আসক্তির বহি:প্রকাশ ছাড়াও এ কবিতায় 'সিদ্ধিপ্রাপ্ত ওলীয়ুল্লাহগণের প্রসঙ্গে,' 'বন্ধুদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত' 'বন্ধুদের প্রতি অহ্বান,' 'সহযাত্রীদের সম্পর্কে,' 'বিরহের ক্রন্দন' ইত্যাদি শিরোনামে কবিতা রয়েছে।
দ্বিতীয় কবিতাটিতে ৫২টি শে'র রয়েছে। কবি এ কবিতায় আল্লাহ তাআলার তদীয় রসূল (স) ও কবির শায়খের প্রেমে নিজেকে নিমজ্জিত করার কথা তুলেন ধরেছেন। তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণাকে পদদলিত করে আল্লাহর প্রেমকে বিজয়ী করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। দ্বিতীয় কবিতাটি কয়েকটি উপশিরোনামে বিভক্ত। যেমন- খোদার প্রতি তাশবীব, কুপ্রবৃত্তির প্রতি, সতীর্থদের সম্পর্কে, স্বকীয় অবস্থা সম্পর্কে ইত্যাদি।
তৃতীয় কবিতাটি ১০৩টি শে'রে সমাপ্ত। এ কবিতায় কবি আল্লাহর নূরের মহিমাকীর্তন করেছেন। কবির ভাষায় চাঁদের যেমন কক্ষপথ আছে তেমনি আল্লাহর সৌন্দর্য ও নৈকট্য লাভের জন্যও কক্ষপথ আছে। সে পথে অগ্রসর হলেই আল্লাহর প্রেমের স্বাদাচ্ছাদন করা যাবে। কবি - انكم لترون ربكم كما ترون البدر এই হাদীসের মাধ্যমে অবগত হয়ে আল্লাহর দর্শন লাভের তীব্র আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এ কবিতাটিও অনেকগুলো উপশিরোনমে বিভক্ত। তম্মধ্যে কয়েকটি উপশিরোনাম হলো: ভোরের বাতাস অবলম্বনে, কাফেলা অবলম্বনে ও স্বীয় অবস্থার বর্ণনা।
দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, অশ্রু সরোবর (বরিশাল: শরীফ পাবলিকেশন্স, আগষ্ট ১৯৬৬), পৃ. ১৩-১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

কবি 'ফানা ফিশ শায়খ' ও ফানা ফির রাসূল' থেকে 'ফানা ফিল্লাহ'র সোপানে আরোহণ করার অদম্য চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। শায়খ, রাসূল (স.) ও আল্লাহর প্রতি কবির গভীর প্রেমকে তিনি তাঁর কবিতার চরণে চরণে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন নিম্নোক্ত দুটি পংক্তি-

وهو العادة عمري عادة * يجلب الشيب الي الشاب الاحي

نصبا اكسبني الشوق كما * تكسب الافعال نصبا لام كي

জানের কসম! চারু তরুণীর
ইশকের মাদকতা
সরস নবীনে ধুকায়ে ধুকায়ে
দান করে প্রবীণতা।
লামে কাই যথা যবরের বোঝা
চাপায় মুযারি পরে
ইশক তেমনি বেদনার বোঝা
চাপাল আমার শিরে।[১০০]

পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের জন্য কবির আকাঙ্খা অপরিমেয় ও অসীম। আর সেই আকাঙ্খা পূরণ না হওয়ার বেদনা অথৈ সরোবরের ন্যায় গভীর ও কূল কিনারাহীন। অনুবাদক শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির কবির বেদনাকে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে স্বার্থকভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর সঙ্গত কারণেই তিনি এর নামকরণ করেছেন 'অশ্রু সরোবর'। বেদনার বহি:প্রকাশ হল অশ্রু। এ কাব্যগ্রন্থের নাম 'অশ্রু সরোবর' না দিয়ে 'ইবনুল ফারিদের দিওয়ান' দেওয়া হলে সাধারণ পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় নাও হতে পারত। কারণ কোন ধরনের দিওয়ান তার ইঙ্গিত পাঠকের নিকট না থাকাতে তারা পাঠে আগ্রহী কম হতেন। তাই 'অশ্রু সরোবর' নামকরণ সার্থক ও যথার্থ হয়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আরবি ভাষায় যথেষ্ট দখল থাকার কারণে শরীফ সাহেব দিওয়ান ইবনুল ফারিদের বঙ্গানুবাদকরণ ও তাকে কাব্যিক রূপ দান করতে সক্ষম হন। অশ্রু সরোবর পুস্তকের শুরুতে তিনি 'কৈফিয়ৎ' শিরোনামে উল্লেখ করেন, "আমার মত অযোগ্য লেখকের পক্ষে 'দিওয়ান ইবনুল ফারিদ' এর মত মহান কাব্যের পদ্যানুবাদ করতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র; বিশেষত; কবিতা লিখতে যে সব গুণের প্রয়োজন তা যখন আমার মধ্যে নেই। একাজে হাত দেওয়ার উপযুক্ত ছিলেন তারাই - যারা জন্মগত কবি, যারা ভাষার

---

[১০০] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ামক, যারা প্রেম-দরিয়ার ডুবুরী। পকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রাচীন ইসলামী সাহিত্য ও কবিতার দিকে দেশের সুধীমন্ডলীর আকর্ষণ বেড়ে গেছে। এটা আমাদের সাহিত্য শিল্পের উন্নতির একটি বিশেষ লক্ষণ। আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে আগ্রহী সুধীসমাজের আগ্রহের কিঞ্চিতমাত্রও যদি মিটাতে পারি - এ আশায় এ দু:সাহস।"[১০১]

শরীফ সাহেব নিজেকে সার্থক কবি হিসাবে স্বীকার না করলেও আমরা তার কাব্যনুবাদে যথার্থতা খুঁজে পাই। উচ্চমানের পন্ডিত, গুণীজন ও মহৎ ব্যক্তিরা নিজেদেরকে ছোট হিসাবে লোক সমাজে উপস্থাপন করে থাকেন। এটা বিনয়ের অংশ। শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির অনুরূপভাবে নিজেকে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তাঁর অযোগ্যতা প্রমাণিত হয় নি। প্রকৃত কথা হল - "লোকে যাকে বড় বলে, বড় সেই হয়"। শরীফ সাহেবের 'অশ্রু সরোবর' কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ,[১০২] জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান[১০৩] সহ দেশবরেণ্য মনীষীগণ[১০৪] যথার্থ ও সার্থক পদ্যানুবাদ বলে উল্লেখ করেছেন।

---

[১০১] মাললানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।

[১০২]প্রখ্যাত মনীষী ও বহু ভাষাবিদ পন্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শরীফ সাহেবের 'অশ্রু সরোবর' পড়ে নিম্নোক্ত বাণীটি প্রদান করেন "মৌলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির সাহেবের 'অশ্রু সরোবর' বিখ্যাত আরবী কবি ইবনুল ফারিদের কাব্যের পদ্যানুবাদ। পুস্তকখানিতে মূল আরবী আছে। তাঁহার বাংলা ভাষা ও ছন্দের উপর অধিকার অতি চমৎকার। এই অনুবাদে মূলের রসাস্বাদ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে ইহা একটি মূল্যবান অবদানরূপে গণ্য হইবে। আমি এই নবীন গ্রন্থকারের সাফল্যময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৭।

[১০৩]জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, "শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আরবি কবিতাকে বাংলায় রূপদানে সিদ্ধহস্ত। সুবিখ্যাত কবি ইবনুল ফারিদের দিওয়ানকে তিনি 'অশ্রু সরোবর' নামে কাব্যানুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছেন। 'অশ্রু সরোবর' বাংলা সাহিত্যে যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা।"

দ্র. সৈয়দ আলী আহসান, 'অশ্রু সরোবর' পুথিপত্র, দৈনিক ইত্তেফাক (ঢাকা: মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর, ১৯৬৯), পৃ. ২।

[১০৪] আবদুল মতিন আল মুজাহিদ লিখেছেন,"জনাব শরীফ আবদুল কাদিরের 'অশ্রু সরোবর' একখানি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। কবি হিসাবে তিনি পাকাহস্ত। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় কবিতা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কবিতার ভাষা ছন্দ ও প্রবাহে যে মন্থর-ভাব দৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক তা তিনি কন্টক-শাখা বিদীর্ণকারী প্রস্ফুটিত গোলাপের মত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। জনাব শরীফ আবদুল কাদির সাহেবের 'অশ্রু সরোবর' পেয়ে আমরা বাস্ত বিকই আনন্দিত। আশা করি আগামী দিনে তার হতে এমনি আরো সুরভিত আরবি অনুবাদ লাভ করব। বইটির ছাপা ও বাধাই খুবই উত্তম। প্রচ্ছদও বেশ। আমরা জোর দিয়েই বলছি, বাংলাভাষীদের জন্য এটি একটি অমূল্য অবদান।

দ্র. আবদুল মতিন আল মুজাহিদ, অশ্রু সরোবর পর্যালোচনা, দৈনিক পয়গাম, (ঢাকা : ২২ নভেম্বর, ১৯৬৮), পৃ. ৮-৯।

Dhaka University Institutional Repository

আরবি ভাষার মত বাংলা ভাষা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নয়। সে কারণে আরবিকে পুরাপুরি অনুরূপভাবে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপিও যতদূর বাংলা ভাষায় সুন্দর ও সার্থক ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব, লেখক আবদুল কাদির সে চেষ্টায় সফল হয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "কবি ইবনুল ফারিদের কবিতায় 'আরাবিয়াত' এর যে বৈশিষ্ট্য আছে তা আমরা বাংলা ভাষায় কোথায় পাব? তবুও চেষ্টায় ত্রুটি করি নি।। দূর অতীতের আরবি কাব্য শৃঙ্খলের সঙ্গে বাংলা কাব্যের একটি কড়া সংযোজিত করে দূর-ব্যবধানকে নিকট সম্বন্ধে পরিণত করার চেষ্টা যে করতে পেরেছি এতেই আমার সান্ত্বনা"।[১০৫]

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির বাংলা ভাষায় আরবির রসাস্বাদন করানোর প্রচেষ্টায় বাঙালি পাঠকদের নিকট উপস্থাপন করেছেন আরবি কবিতার বঙ্গানুবাদ পংক্তিমালা। লেখকের ভাষা ব্যঞ্জনাময় ও ছান্দিক। লেখক হুবহু দিওয়ান ইবনুল ফারিদকে বাংলা ভাষায় কাব্যানুবাদ করে আরবি শিক্ষিত এবং আরবিতে অনভিজ্ঞ উভয় শ্রেণীর পাঠকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "অনুবাদের নিম্নে মূল আরবি শে'রগুলিও সন্নিবিষ্ট করেছি। এতে আমার কোন কোন বন্ধু আশ্চান্বিত হয়েছেন। আমি তাঁদের নিকট বিনীতভাবে আরয করতে চাই, আমার এ খেয়ালিপনা যদি আরবি শিক্ষিত বাঙালি ভাইদেরকে কিছু আনন্দ দিতে পারে অথবা বাঙালি শিক্ষিত সমাজকে আরবির সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে পারে তাতে এমন ক্ষতির কি আছে? এরূপ যোগাযোগই তো আমাদের ধর্মীয় এবং জাতীয় জীবনে কাম্য"।[১০৬]

মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন, "অনুবাদক মাওলানা শরীফ আবদুল কাদির ইবনুল ফারিদের ন্যায় একজন তাসাউফপন্থী। বাংলা সাহিত্যে তাঁর হাত যথেষ্ট শক্তিশালী। ভক্তের আকুতি লইয়া তিনি মূল আরবি হইতে বইটির কাব্যানুবাদ করিয়াছেন। বাংলা কাব্যে যথেষ্ট দখল থাকায় তাঁহার অনুবাদ রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। দিওয়ানে ইবনুল ফারিদের ন্যায় আরো অনেক সমৃদ্ধ কাব্যগ্রন্থ আরবি সাহিত্যের ভান্ডার পুর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এই সবের কোন তরজমা প্রকাশিত হয় নাই। ইতোপূর্বে আরবি ক্লাসিক্যাল কবিতার বাংলা অনুবাদ করিবার দু একটি ব্যর্থ প্রয়াস আমরা করিয়াছি। তবে অশ্রু সরোবরই বোধ হয় সর্বপ্রথম বই, যাহা মূলের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করিয়া রসোত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছে। আমরা অনুবাদকের এই শুভ প্রচেষ্টার প্রতি মুবারকবাদ জানাই। তাঁহার এই শ্রমের ফলে আমাদের শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূত্রপাত হইয়াছে বলা চলে। বইটি বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।"

দ্র. মুহিউদ্দীন খান, অশ্রু সরোবর (পর্যালোচনা), মাসিক মদীনা, (ঢাকা: এপ্রিল, ১৯৬৭, সংখ্যা-১৩), পৃ. ৩৭-৩৮।

[১০৫] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬।

[১০৬] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

শরীফ সাহেব কবিতার ইঙ্গিত, গতি ও ভাব স্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্য বইয়ের শেষভাগে কাব্য কুঞ্চিকা সংযোজন করেছেন। তিনি লিখেছেন "কবির প্রতি অবিচার হতে পারে এ ভয়ে আমি পুস্তকের শেষভাগে সংক্ষিপ্ত 'কাব্য কুঞ্চিকা' সংযোজন করে কিছু সংখ্যক কবিতার ভাব প্রকাশ করেছি। আশা করি, সংক্ষিপ্ত কাব্য-কুঞ্চিকার আলোকে পাঠকগণ কবি ও তাঁর কবিতাগুলির ইঙ্গিত, ভাব ও গতি বুঝতে পারবেন।"

'অশ্রু সরোবর' এর কতিপয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির এর অশ্রু সরোবর গ্রন্থের প্রধান পধান বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

১. আরবি কবিতার হুবহু বাংলা কাব্যানুবাদ

অশ্রু সরোবর আরবি কবি ইবনুল ফারিদের দিওয়ানের সরাসরি বাংলা ভাষায় কাব্যানুবাদ। কবি মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির তাঁর নিজের ভাষায় একে অনুবাদ করেছেন।। আরবি কবিতার প্রতিটি পংক্তিকে তিনি আলাদা আলাদা ভাবে কাব্যানুবাদ করেছেন। এতে শরীফ সাহেবের আরবি ও বাংলা ভাষায় অসাধারণ পান্ডিত্য প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ইবনুল ফারিদের কবিতাংশ

مظهرا ما كنت اخفي من قدى * م حديث صانه مني طي

এর কাব্যানুবাদ করা হয়েছে -

তাই নন্দন যে গোপন কথা
বুঝায়ে বলে নি হায়
বুঝা হয়ে গেলে গোপনে রাখি নু
আসু প্রচারিল তায়।[১০৭]

قسما بمن فيه اري تعذيبه * عذبا وفي استذلا له استلذذا

এর অনুবাদ করা হয়েছে

শাস্তিরে যার সুধা বলে পিই
লাঞ্ছনে মানি সুখ
তাহার কসম! বলি ওগো শোন
হৃদয়ের কথাটুক।[১০৮]

---

[১০৭] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫১।

[১০৮] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

امسي بنا رحوي حشت احشائه * منها يري الايقاد لا الانقاذا

এর অনুবাদ করা হয়েছে-

কলেজা পোড়ানী ইশকের আগুন
আশিকের আকিঞ্চন
জ্বলনেই সুখ- আশিক কখনও
চায় না নির্বাপণ।[১০৯]

এসব কাব্যানুবাদের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা অনুবাদকের আরবি ও বাংলা ভাষায় পরিপূর্ণ দখল এবং তাঁর অসাধারণ কাব্য প্রতিভা উপলব্ধি করতে পারি।

২. যথার্থ ছন্দ-মিল

অনুবাদের ক্ষেত্রে শরীফ সাহেব ছন্দমিল রাখার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সার্থকতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। অশ্রু সরোবর কবি ইবনুল ফারিদের তিনটি বৃহৎ কবিতার কাব্যানুবাদের সমন্বিত রূপ। প্রথম কবিতাটি ১৫১ শে'র বিশিষ্ট, দ্বিতীয় কবিতাটি ৫১শে'র বিশিষ্ট এবং তৃতীয় কবিতাটি ১০২ শে'র বিশিষ্ট। সবগুলো শে'রের কাব্যানুবাদে মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির যথার্থ অন্ত্যমিল রাখতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন কয়েকটি শে'র এর অনুবাদ নিম্নরূপ-

প্রথম কবিতার ৬৪ নং শে'রের কাব্যানুবাদ

প্রেয়সীর সেই উন্নত দেশ
শুখা বা রসাল তা-ই
ভূলোকের পাওয়া স্বর্গ আমার
দুইটির আসটাই[১১০]

প্রথম কবিতার ৬৫ নং শে'রের কাব্যানুবাদ

নব পরিণীতা দুলহানি হেন
য়ামনী চাদরে সাজা
কিংখাব করা ওড়না খুআইর

---

[১০৯] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৭।

[১১০] جنة عندى رباها اخلت * ام حلت عجلتها من جنتى

Dhaka University Institutional Repository

মরি মরি কিবা মজা[১১১]

প্রথম কবিতার ৬৬ নং শে'রের কাব্যানুবাদ

নিত্য ভবন, - আমার ধারণা
যারা তথা পৌছায়
গাফলত কিছু হলেও তাদের
নাই বিতাড়ন ভয়[১১২]

প্রথম কবিতার ৬৭ নং শে'রের কাব্যানুবাদ

বন্ধুর পথ-ক্লিষ্ট যে জন
অংগন সীমা পায়
তার শুধু সুখ। হায়, মোরে যদি
ডাক দিত বলি "আয়!"[১১৩]
-------------- ইত্যাদি।

৩. গভীর অর্থ ও ভাবাবেগপূর্ণ কবিতা

কবি ইবনুল ফারিদ তাঁর কবিতায় বিভু-প্রেমের অনাবিল সৌন্দর্য সুরভিত পুষ্পের মত ফুটিয়ে তুলেছেন। চিন্তাশীল পাঠক পাঠ করলেই অবলোকন করতে পারেন- কাব্যের গুলিস্তানের মত রূপের লালায়িত ছন্দ ভোরের হাওয়ায় দোলায়িত পুষ্প-পত্র-শাখা ও পিযুষ পল্লবিত সুরে বিমোহিত বুলবলির নৃত্য তালের এক অপূর্ব আনন্দ। শরীফ সাহেব আধ্যাত্মিকতার সোপানে আরোহণ করে মনের মাধুরী দিয়ে ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন,- ইবনুল ফারিদের সুরে সুরে-

সোবে সাদিকের কোমল চাদরে
জড়ায়ে ঝিমেল তনু
মিঠেল সুরের শিশ দিতে দিতে
চলে যায় রুনুঝুনু[১১৪]

মদীনায় যবে মাশুকের সনে

---

১১১ كعروس حليت في حبر * صنع صنعاء ديباج خوي

১১২ دار خلد لم يدرني خلدي * انه من بنا عنها يلق غي

১১৩ اي من وافى حزينا حزنها * سرلو روح شرري سراى

১১৪ مهينمة بالروض لدن ردائها * لها مرض من شانه برء عليّ

Dhaka University Institutional Repository

গাঁথিনু মিলন মালা
ভাবিনি কখনো পোয়াতে হবে
এমনি বিরহ জ্বালা।[১১৫]

অশ্রু সরোবর কাব্যগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে কবি মানসের রস নিংড়ানো বহিঃপ্রকাশ-

মনে হয় যেন মরু বাগিচায়
ননী লতিকার শিরে
ঘন কালো রাতে আলোকচন্দ্রিকা
বিশ্ব রেখেছে ঘিরে।[১১৬]

প্রেমের মধুময় পবিত্র গোপন পত্রে কবি একেঁছেন বিমোহিত রূপলীলার এক ছন্দময় পরিবেশ-

তথাকার শ্যাম-ঘন ছায়াতলে
আরাম লয়েছি কত
আজ শুধু সেই পুরানো স্মৃতির
ধ্যান যোগে আছি রত
কোন পথে তার হবে অভিসার
করতে পারি নি ঠিক্
বাসনায় ভরা চোখ দু'টো মেলে
তাকাই নির্নিমিক।[১১৭]

'অশ্রু সরোবর' গ্রন্থের কবিতাগুলো গভীর প্রেম ও ভক্তি নিয়ে রচিত। এর প্রতিটি চরণই ব্যাপক বিশ্লেষণের দাবীদার। কবির ভাষায়-

প্রেম গাথা মোর উপরে উপরে
মোলায়েম- বেশ মোটা
ভিতরে রয়েছে গভীর অর্থ
মুশকিল বুঝে উঠা।[১১৮]

---

[১১৫] وما دار هجر العبد عنها بخاطري * لديها يوصل القرب في دار هجرتي

[১১৬] أن تشت فقضيب في نقا * مثمر بدردجي فرع ظمى

[১১৭] اي عيش مرلي في ظله * اسفي اذ صار حظي منه اى

Dhaka University Institutional Repository

৪ সূফী সাধনার বহিঃপ্রকাশ

গ্রন্থের মূল রচয়িতা কবি ইবনুল ফারিদ সূফী সাধনায় নিয়োজিত হয়ে ফানাফিল্লাহ থেকে বাকাবিল্লাহ'র পর্যায়ে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁরই বহিঃপ্রকাশ তার কবিতায় ফুটে উঠেছে। অনুবাদক কবি শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরও সে পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন পরমাত্মার সন্ধানে। যেমনটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে নিম্নোক্ত চরণে।

উচ্চাভিলাষী! কর্মের দাবী
ছেড়ে দাও আজ হতে
মন্ত্রই শুধু নেবে না তোমায়
রোকেয়ার সাক্ষাতে।[১১৯]

সর্বোপরি, শরীফ সাহেব অনূদিত অশ্রু সরোবর কাব্য গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য আরবি কাব্য গ্রন্থের স্বাদাচ্ছাদনের দুয়ার খুলে দিয়েছে। দৈনিক পয়গাম পত্রিকার ২২ নভেম্বর ১৯৬৮ তারিখের 'পুস্তক ও পত্রিকা' কলামে সে কথাই লেখা হয়েছে, "বাংলা ভাষাভাষী পাঠক ও সূধী সমাজ আজ যে সওগাত উপহার লাভ করিলেন, তা এক অপূর্ব অবদান। 'অশ্রু সরোবর বইটি আমাদের আনন্দ দান করিয়াছে এই দৃষ্টিতে যে, আরবি কাব্যের ফুল বাগিচায় বাংলাভাষী বুলবুলিরা অসঙ্কুচিত চিত্ত নিয়েই বিচরণ করিতে পারিয়াছে। ইসলামী চিন্তাবিদ শরীফ আবদুল কাদির সাহেবের এই কাব্যানুবাদের সাধনা বেশ বেগবান ও প্রতিশ্রুতিশীল। তাঁহার এই অনুবাদ সাধনা আগামী দিনের পূর্বপাকিস্তানের অনুবাদ সাহিত্যে এক উজ্জ্বল স্থান দখল করিবে।"[১২০]

---

[১১৮] رقت ودقت فناسبت مني النسي * ب وذاك معناه اشجاد فحاذا

[১১৯] خاطب الخطب دع الدعوي فما * بارقي ترقي الي وصل ر قي

[১২০] আবদুল মতিন আল মুজাহিদ , প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. এক নজরে সীরাতুন্নবী (স)

'এক নজরে সীরাতুন্নবী (স)' মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির অনূদিত একখানা সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ। এর মূল রচিয়তা শরীফ সাহেবের উস্তায সাইয়েদ মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ)।[১২১]

---

[১২১] মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান: মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দেদী আল বারাকাতী ২৪ জানুয়ারি ১৯১১ সালে বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জেলার পাচান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সাইয়েদ আবদুল মান্নান এবং মাতার নাম সাইয়েদা সাজেদা। পিতা মাতা উভয় সূত্রেই তিনি মহানবী (স) এর অধস্তন পুরুষ। তাঁর পিতা কলিকাতায় এসে জালিয়াটুলী মহল্লায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি সেখানে একটি মসজিদ, একটি দাওয়াখানা ও একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই মুহাম্মদ আমীমুল ইহসানের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা। এখানে তিনি তাঁর চাচা আবদুদ দাইয়ানের নিকট আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন।

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা : সাইয়েদ আমীমুল ইহসানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে। এখানে ভর্তি হয়ে তিনি উক্ত মাদরাসার হেড মৌলভী মাজেদ আলী জৌনপুরীর নিকট আরবি ব্যাকরণ, ফিকহশাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা, আবদুল মাজীদ মুরাদাবাদীর নিকট আরবি সাহিত্য, আবদুর রহমান কালুবীর নিকট উসূল এবং আবদুর রহমান খাঁ ও সাইয়েদ ফজলুর রহমানের নিকট সুন্দর হস্তলিপি শিক্ষা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি তার নিকটাত্মীয় আবদুল করীমের নিকট ইংরেজি ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন।

কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ১৯২৩ সালে তিনি মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যান। ১৯২৬ সালে তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৯ সালে তিনি আলিম (Lower standard) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৩১ সালে তিনি ফাজিল এবং ১৯৩৩ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর তিনি শামসুল উলামা ইয়াহইয়া সাহারামীর ও মুশতাক আহমদ আল কানপুরীর নিকট জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিগত জ্ঞান অর্জন করেন এবং মুফতী সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন : মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান ১৯৩৪ সালে কলিকাতার কুলুটোলাস্থ নাখোদা মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসায় প্রধান মুদাররিস হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী বছর তিনি ঐ মসজিদের মুফতী ও ইমাম নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি কলিকাতায় কাজী (বিচারক) পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে সরকার তাঁকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নিযুক্ত করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় মুদাররিস হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর যখন কলিকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। মাদরাসার মুদাররিস হিসেবে তখন তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান সরকার তাঁকে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। একই সাথে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার শিক্ষকতাও চালিয়ে যান। ১৯৫৪ সালে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার হেড মাওলানা পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন। ১৯৬৪ সালে তিনি বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ মসজিদের খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইনতিকাল : মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান ২৭ অক্টোবর ১৯৭৪ সালে ঢাকাস্থ নিজ বাস ভবনে ইনতিকাল করেন।

রচনাবলি : তাঁর রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো : ফিকহস্ সুনান ওয়াল আসার, মানাহিজুস সোয়াদ, হুসনুল খিতাব, উমদাতুল মাজানী, হাকীকাতুল ইসলাম, আত্তানবীর আত্তামজীদ, রদ্দু রাওয়াফিয,

Dhaka University Institutional Repository

৪৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ গ্রন্থটি ১৯৬২ সনে হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, নেছারাবাদ, ঝালকাঠী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বইটির পরিবেশক আব্বাসিয়া লাইব্রেরি, ৬৫ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মূল গ্রন্থটি আরবি ভাষায় রচিত। এর নাম اوجز السير।[১২২] শরীফ সাহেব একে নিজের ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং মূল লেখকের অনুমতিক্রমে এর সাথে কিছু সংযোজনও করেছেন। অনুবাদক লিখেছেন, "অনুবাদকালে মুফতী সাহেব জীবিত ছিলেন। আমি কোন কোন বিষয় আরো একটু পরিষ্কার করার

আদাবুল মুফতী, আউজাজুস সিয়ার, আত্তাশাররুফ লি আদাবিত তাসাউফ, তারীখুল ইসলাম, তারীখু উলূমিল হাদীস, তারীখু ইলমিল ফিক্হ, তরীকাতুল হাজ্জ, মীযানুল আখবার, মশকু ফরাইয, হাদিয়াতুল মুসাল্লীন ইত্যাদি।

দ্র. ড. এ. এফ. এম. আমীনুল হক, মুফতী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০২), পৃ. ১৭ – ১৬৭।

[১২২] اوجز السير : মূল গ্রন্থখানি ১৯৪৫ সালে লেখকের উদ্যোগে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। লেখক গ্রন্থের শুরুতে নাতিদীর্ঘ পরিসরে আল্লাহ তাআলার হামদ এর রাসূলুল্লাহ (স) এর নাত পেশ করেন। তিনি একটি কবিতাংশ উল্লেখ করে হযরত রাসূলে আকরাম (স) এর মর্যাদাও মাহাত্ম তুলে ধরেন এভাবে-

محمد سيد الكونين و الثقلين * والفريقين من عرب ومن عجم

نبينا الامر النهي فلا احد * ابر في قول لامنه ولا نعم

অনুবাদ

দীন দুনিয়া, জ্বিন-ইনসান, আরব এবং আজমের
যিনি হলেন নেতা মহান- মুহাম্মদ সে আরবের
নবী মোদের আদেশকারী, নিষেধকারী, কেহ তার
চাইতে বড় নয়, একথায় করি মনে অথবা কর।

অতঃপর লেখক মহানবী (স) এর বংশের লতিকা বর্ণনা করে গ্রন্থের মূল অংশে প্রবেশ করেন। এরপর লেখক রাসূল (স) এর জন্ম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। রাসূল (স) এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে লেখক চারটি মতামত উল্লেখ করেন। তা হলো : রবিউল আউয়াল মাসের ২, ৮, ৯, কিংবা ১২ তারিখ। এর ফলে রাসূলের (স) জন্ম তারিখ সম্পর্কিত সকল ঐতিহাসিক মতামত পাঠকদের সামনে স্পষ্ট হলো। জন্মের উল্লেখের পরপরই তাঁর আগমনে পৃথিবীর সৌভাগ্য লাভের কথা একটি কবিতার চরণের মাধ্যমে তুলে ধরেন :

انت لما ولدت اشرقت الارض * واضائت بنورك الافق

অনুবাদ,

তুমি যখন জন্ম নিলে এ দুনিয়ার পরে
দিক দিগন্ত উজ্জ্বল হল তোমার দেহের নূরে,

মূল গ্রন্থটিকে লেখক ১৯টি শিরোনামে বিভক্ত করেছেন। তা হলো : বংশ পরিচয়, হুজুর (স) এর জন্ম ও শৈশব, নবুওয়াত প্রাপ্তি, হাবশায় হিজরত, মদীনায় হিজরত, প্রথম হিজরির ঘটনাবলি, দ্বিতীয় হিজরির ঘটনাবলি, তৃতীয় হিজরির ঘটনাবলি, চতুর্থ হিজরির ঘটনাবলি, পঞ্চম হিজরির ঘটনাবলি, ষষ্ঠ হিজরির ঘটনাবলি, সপ্তম হিজরির ঘটনাবলি, অষ্টম হিজরির ঘটনাবলি, নবম হিজরির ঘটনাবলি, দশম হিজরির ঘটনাবলি, খুতবাতুল বিদা, একাদশ হিজরির ঘটনাবলি, হিলিয়া শরীফ, হুজুর (স) এর চরিত্র, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য অন্যান্য কিতাবেরও কিছু সাহায্য নিয়েছি।"[১২৩] মূল গ্রন্থখানি যেমন নির্ভরযোগ্য তেমনি এর অনুবাদকও বিশ্ববিখ্যাত আলেম। সে কারণে 'এক নজরে সীরাতুন্নবী (স)' গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর মূল্য তুলনামূলক বেশি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী বৃহৎ পরিসরে আলোচনার দাবীদার। তা সত্ত্বেও লেখক খুব সংক্ষিপ্তভাবে এ পুস্তকে হযরত রাসূলে খোদা (স) এর জীবনের সকল দিক ও ঘটনাকে তুলে ধরেছেন। একে বিন্দুতে সিন্ধু বললে অত্যুক্তি হবে না। অনুবাদক মূল গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, "গ্রন্থটি যেন ক্ষুদ্রাকৃতি পাত্রে মহাসমুদ্রের অবস্থান।"[১২৪] আওজাযুস সিয়ার গ্রন্থে রাসূল (স) এর জীবনের প্রতিটি সাল অনুযায়ী তাঁর জীবনেতিহাস তুলে ধরেছেন লেখক। ফলে পাঠকগণ সহজেই হযরত রাসূলে আকরাম (স) এর জীবনের যে কোন ঘটনা খুঁজে বের করতে পারেন। অনুবাদক গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন, "মরহুম মুফতী সাহেব 'আউজাযুস সিয়ার' নামে আরবি ভাষায় যে কিতাবটুকু লিখে গেছেন তাতে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। হুজুরের (স) জীবনের ঘটনাবলি সালওয়ারী এরূপ সংক্ষেপে লিখিত কিতাব খুব কম দৃষ্ট হয়।"[১২৫]

০১

'এক নজরে সীরাতুন্নবী (স)' গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে রাসূলুল্লাহ (স) এর জীবনের সকল দিকের আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, রাসূল (স) বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে "মহানবী (স) এর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমার (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত যুবাইর (রা), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা), সাঈদ বিন যায়েদ (রা), আবূ উবায়দা (রা), আবূ যার (রা), মিকদাদ (রা), হুযাইফা (রা), ইবন মাসউদ (রা), বিলাল (রা), আম্মার (রা), সালমান (রা), আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা), জাবির (রা), আবূ আইউব (রা), উবাই বিন কা'আব (রা), মুআয (রা), যায়েদ বিন সাবিত (রা), আবূ তালহা (রা), সাআদ বিন উবায়দা (রা), উসাইদ বিন হুযাইর (রা), উব্বাদ বিন বাশার (রা) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে দেখা যাচ্ছে যে লেখক রাসূল (স) এর সাথে রক্তের সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্কের সকল আত্মীয়স্বজনকে খুঁজে বের করে তাঁদের তালিকা পেশ করেছেন। অনুরূপভাবে রাসূল (স) এর আযাদকৃত দাসদের তালিকা,[১২৬] মুয়াজ্জিনগণের তালিকা,[১২৭] কবিগণের তালিকা[১২৮] এবং দেহ

---

[১২৩] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, একনজরে সীরাতুন্নবী (স), (ঝালকাঠী : হিযবুল্লাহ দারুত্তাহনীফ, ১৯৬২), পৃ. ৩।

[১২৪] মুহাম্মদ বদর বিন জালাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

[১২৫] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

[১২৬] রাসূল (স) এর আযাদকৃত দাসগণ হলেন : আনাস (রা), রিবাকা (রা), আসমা (রা), যায়েদ বিন হারিসা (রা), আসলাম (রা), আবু কাশব (রা), ফাযালা (রা), আবু মুয়াযহাবা (রা), রাফি (রা), সাফীনা (রা), উম্মে আয়মন (রা), রাযওয়া (রা), মারিয়া (রা) ও রুকানা (রা)।

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষীগণের[১২৯] পূর্ণাঙ্গ তালিকা পেশ করা হয়েছে এ গ্রন্থে। এমনকি কুরআনের যে আয়াত[১৩০] নাযিল হওয়ার পর তিনি আর দেহরক্ষী রাখেন নি, তাও লেখক উল্লেখ করেছেন।

হুজুর (স) এর চরিত্র সম্পর্কে লেখক মহানবী (স) সকল সদগুণকে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি কাযী আইয়াজ এর 'শিফা' গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে একটি হাদীস বর্ণনার মাধ্যমে রাসূলের (স) চরিত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি তুলে ধরেছেন স্বয়ং রাসূল (স) এর হাদীসের মাধ্যমেই।[১৩১] মোট কথা, আকারে ছোট হলেও রাসূল (স) এর জীবনের কোন দিকই বাদ পড়ে নি লেখকের আলোচনা থেকে।

০২

অতি সংক্ষিপ্ত এ কিতাবে লেখক বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে হুজুর (স) এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিকে দলীলভিত্তিক এবং বিশ্বাসনির্ভর করতে সফল হয়েছেন। যেমন 'তাদবীর' গ্রন্থের ২৫৬ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে তিনি লিখেছেন- "হুজুর (স) হযরত আলী (রা) কে বলেছিলেন 'লেখ' পঞ্চম হিজরিতে এই লিখন লেখা হলো। এর দ্বারা বুঝা যায়, হুজুর (স) ই হিজরি সন প্রবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।"

অর্থাৎ, 'এক নজরে সীরাতুন্নবী (স)' গ্রন্থে রাসূল (স) এর জীবনীকে এত নিখুঁত ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে যে, রাসূল (স) এর অবদান সম্পর্কিত যে সব বিষয় সম্পর্কে অবগতি না থাকার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্পষ্টতা ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে গেল। গ্রন্থটির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য লেখক রাসূল

---

[১২৭] মুয়াজ্জিনগণ হলেন : বিলাল (রা), আমর বিন উম্মে মাকতূম (রা), সায়াদুল কারয (রা) ও আবূ মাহযূরা (রা)।

[১২৮] রাসূলের (স) কবিগণ হলেন : হাসসান বিন সাবিত (রা), কাআব বিন মালিক (রা) ও ইবনে রাওয়াহা (রা)।

[১২৯] তাঁর দেহরক্ষীগণ হলেন : সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস, সাআদ বিন মাআয (রা), মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা), যাকওয়ান (রা), যুবাইর (রা), উব্বাদ (রা), আযরা (রা), আবু রায়হানা (রা), আবু আউয়ুব (রা) ও আব্বাস (রা)।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

[১৩০] আয়াতটি হলো :- والله يعصمك من الناس

আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে মুক্ত করেছেন।

দ্র. আল কুরআন, ৫:৬৭।

[১৩১] রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, মারফিত আমার মূলধন, বিকের আমার ধর্মের মূলনীতি, প্রেম ও মহব্বত আমার ভিত্তিমূল, আকাঙ্খা আমার সওয়ারী, যিকরুল্লাহ আমার প্রিয় সঙ্গী, বিশ্বস্ততা আমার ভান্ডার, ভীতিমূলক চিন্তা আমার বন্ধু, জ্ঞান আমার শোধনকারী, সহিষ্ণুতা আমার চাদর, সন্তুষ্টি আমার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত দান, দারিদ্র আমার গৌরব, প্রাচর্যের প্রতি বিরাগ আমার নৈপুণ্য, দৃঢ় বিশ্বাস আমার কথা, সত্যবাদিতা আমার দোস্ত , ইবাদত আমার আভিজাত্য , জিহাদ আমার প্রকৃতি এবং নামাযে আমার চোখের শীতলতা।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

(স) এর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বিখ্যাত কবিগণের কবিতাংশ উদ্বৃত করেছেন। যেমন কাআব বিন যুহাইব (রা) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক হিকমতের সাথে কাআব বিন যুহাইর (রা) এর কবিতার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁর শ্লোক উদ্বৃত করেন। শ্লোকটি হলো :

ان الرسول لنور يستضاء به * مهند من سيوف الله مسلول

সন্দেহ নেই রাসূল মোদের এমন দীপ্ত নূর
যার আলো নিয়ে কুল মাখলুক আলোকেতে ভরপুর
তলোয়ার মাঝে সেরা তলোয়ার নাম সে মুহান্নাদ
নবীকুল মাঝে সেরা নবী যার নামটি মুহাম্মাদ।

রাসূলের (স) ধারাবাহিক জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লেখক রাসূলের (স) জীবনে বিশেষ বিধান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালকেও চিহ্নিত করেছেন।[১৩২] এর ফলে পাঠকদের জন্য কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতের শানেনুযূল সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা লাভ সহজতর হয়েছে।

অনুবাদকের আরবি ও বাংলা ভাষার পূর্ণ দখল থাকায় তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় 'আউজাজুস সিয়ার' গ্রন্থকে বাংলায় অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন। অনুবাদক ছিলেন নিয়মিত লেখক। তাঁর পাকা হাতে অনুবাদ করার কারণে বইটি পড়ে অনুবাদ গ্রন্থ বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন অনুবাদক নিজের ভাষায়ই একটি পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি পাঠকদের সহজবোধ্যতার জন্য অনেক আরবি পরিভাষাকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তবে তিনি মূল গ্রন্থের নিজস্বতা রক্ষার্থে মূল আরবি শব্দগুলোকে বাদ না দিয়ে সেগুলোকে উল্লেখ করেছেন। যেমন 'মুবাহালা' শব্দটি উল্লেখ করে তার সংজ্ঞা লিখেছেন- "প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের প্রত্যেক নেতা নিজ নিজ পরিবারের লোকদের নিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে কসম খেয়ে বলবে- আমি যে দাবী করছি তা নিঃসন্দেহে সত্য। যদি আমি মিথ্যা দাবী করি তবে মিথ্যুকের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বা লা'নত।"[১৩৩]

---

[১৩২] যেমন প্রথম হিজরিতে রাসুল (স) এর প্রতি জিহাদের আদেশ প্রদান করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله علي نصره لقدير – الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله

দ্র. আল কুরআন, ২২:৩৯।

লেখক রাসুল (স) এর ধারাবাহিক জীবনীর মধ্যে প্রথম হিজরির ঘটনাবলিতে এ আয়াত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ্য করেন। এভাবে অন্যান্য বিশেষ বিশেষ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট তিনি উল্লেখ করেছেন।

[১৩৩] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে "শাহাতিল উজূহ" সম্পর্কে লিখেছেন- এর অর্থ হলো কাফিরদের মুখ বিনষ্ট হোক। রাসূল (স) হিজরতের প্রাক্কালে শাহাতিল উজূহ পাঠ করে এক মুঠো মাটি নিয়ে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন।[১৩৪]

অনুবাদক কতিপয় নতুন পরিভাষা সংযোজন করেছেন। যেমন 'নববী সন'। ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় এ ধরণের পরিভাষা পরিলক্ষিত হয় নি। অনুবাদক মহানবী (স) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির বসরকে প্রথম নববী সন, এরপর থেকে মহানবী (স) মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত সনগুলোকে দ্বিতীয় নববী সন, তৃতীয় নববী সন, চতুর্থ নববী সন, পঞ্চম নববী সন, ষষ্ঠ নববী সন, সপ্তম নববী সন, অষ্টম নববী সন, নবম নববী সন, দশম নববী সন, একাদশ নববী সন, দ্বাদশ নববী সন এবং ত্রয়োদশ নববী সন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হিজরতের পরবর্তী সনগুলোকে হিজরি সন হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মূল গ্রন্থে উল্লেখিত কবিতাংশগুলোর তিনি কাব্যানুবাদ করেছেন। এর ফলে মূল গ্রন্থের স্বকীয়তা রক্ষা হয়েছে এবং পাঠকগণ গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে রূপবৈচিত্রের স্বাদাচ্ছাদনের সুযোগ লাভ করছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি কবিতাংশ ও তার কাব্যানুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

وابيض يستسقي الغمام بوجهه * ثمال اليتمى عصمة الارامل

এর কাব্যানুবাদ করা হয়েছে

চেহারা এমন শুভ্র-সরস মেঘ সেথা পিয়ে পানি
বিধবাকুলের হিফাযতকারী, অনাথসরণ জানি।[১৩৫]

طلع البدر علينا * من ثنية الوداع

وجب الشكر علينا * مادعا لله داع

এর অনুবাদ করা হয়েছে

সানিয়াতুল বিদা হতে উদিল মোদের উপর
পঞ্চদশীর চন্দ্র ওগো, দেখতে কিবা মনোহর
খোদার দিকে আহ্বানিলে আমাদেরে, তার তরে
মোদের উপর ওয়াজিব হল শোকর করা প্রাণভরে।[১৩৬]

نحن جوار من بني النجار * ياحبذا محمد من جار

এর কাব্যানুবাদ করা হয়েছে

---

[১৩৪] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
[১৩৫] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
[১৩৬] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

বনু নাজ্জার দুহিতা আমরা আমোদ মোদের কত
সাবাস, মুহাম্মদ হল আজি প্রতিবেশী সমাগত[১৩৭]

هاتيك روضة تفوح نسيما * صلوا عليه وسلموا تسليما

এর কাব্যানুবাদ করা হয়েছে

মৃদু সমীরণ ছড়ায় এমন রওযা বাগানে আয় সবে
নর-নারী সব দরূদ পাঠাতে সালাত সালাম বল সবে।[১৩৮]

শরীফ সাহেব অনূদিত 'এক নজরে সীরাতুন্নবী (স)' গ্রন্থের ভাষাশৈলী ও উপস্থাপনার নিপুণতা গ্রন্থটিকে পাঠকপ্রিয় করেছে। এ কারণে গ্রন্থটি ছাপানোর কিছুদিনের মধ্যেই সবগুলো কপি বিক্রি হয়ে যায়। ১৯৮৮ সালে আব্বাসিয়া লাইব্রেরি, ৬৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা গ্রন্থটিকে পুনর্মুদ্রণ করে। গ্রন্থটির সাহিত্যমান অতি উন্নত হওয়ায় অনেক সীরাতগ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও একনজরে সীরাতুন্নবী (স) গ্রন্থটি বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানে সহপাঠ হিসেবে পড়ানো হয়।

---

[১৩৭] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

[১৩৮] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামি সাহিত্যে অবদান

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ইসলামি পুস্তক রচনা, অনুবাদ এবং প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে ইসলামি সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এ অধ্যায়ে তাঁর রচিত ইসলামী মৌলিক গ্রন্থ, অনূদিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। এ অধ্যায়টি দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে লেখকের মৌলিক রচনাবলি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর অনূদিত রচনাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৌলিক রচনাবলি

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ১৩টি মৌলিক গ্রন্থ এবং দুই শতাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এ পরিচ্ছেদে তাঁর মৌলিক রচনাবলি পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। এ পরিচ্ছেদকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক. গ্রন্থমালা; খ. প্রবন্ধাবলি; গ. ছোট গল্প ও ভ্রমণকাহিনী।

ক. গ্রন্থমালা

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের গ্রন্থাবলির পর্যালোচনা নিম্নরূপ :

এক. ইসলামে নারীর মর্যাদা

'ইসলামে নারীর মর্যাদা' মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির প্রণীত এক অসাধারণ গ্রন্থ। ১১৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত আলোচ্য গ্রন্থটি ১৯৫৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। লেখক এ গ্রন্থে ইসলামের আলোকে নারীর অধিকারগুলোকে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি সহকারে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। প্রকৃতিগতভাবে নারীর অবস্থান, সমকালীন বিশ্বে তাদের অবস্থা এবং ইসলামে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হের কিতাবের রেফারেন্স এবং প্রয়োজনীয় কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করে তিনি একটি প্রামাণ্য দলীল উপহার দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন এই জন্য যে, পাঠকের পক্ষে তথ্য ও উপাত্তের সত্যাসত্য যাচাই পূর্বক আলোচ্য বিষয়ের প্রতি আস্থা অর্জন করা যেন সহজতর হয়। গ্রন্থটির কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে লেখক তুলে ধরেছেন শান্তির পায়রা হিসাবে। পুস্তকের শুরুতে তিনি উল্লেখ করেছেন, নারী পুরুষের চিরসঙ্গিনী, জান্নাতের সুখ নারী বিনে মিথ্যে। জান্নাতের কত ফল-ফুল, মেওয়াজাত নদী-ফোয়ারা ইত্যাদি আদম (আ) কে শান্তি দিতে পারে নি। কেবল শান্তিদায়িনী, শান্তিরূপিণী নারীই পেরেছে শান্তি ও সুখের ঠিকানা উপভোগ্য করাতে।[১]

পৃথিবীতে মানুষের আগমনের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকার কথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করে মানব জীবনে নারীর অপরিহার্যতাকে তুলে ধরেছেন, "নারীই এই দুনিয়ার প্রবেশ-দ্বার। নারীর দ্বার পার হয়েই সকল মানুষকে দুনিয়ায় আসতে হয়"।[২]

মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অবদান যে অপরিসীম তিনি তা প্রমাণ করার সার্থক চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীতে এসেই শিশু যখন ওয়াঁ ওয়াঁ করে কাঁদে, তখন নারীর হাতের ও বুকের ছোঁয়া পেয়ে তার কান্না থেমে যায়। তার আঙ্গুলীঝরা স্নেহ এবং বক্ষঝরা ক্ষীর দ্বারা মানব শিশুর জীবন বাঁচে।

যখন শিশু একটু বড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করে, তখন পঁচা-বাশি, নাপাক ও বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়ার জন্য হাত বাড়ায়, তাকে নারীর হাতই বারণ করে ধ্বংসের হাত থেকে। শিশু যখন জলন্ত অঙ্গার মুখে পুরে তৃপ্তি লাভ করতে চায়, নারী তাকে সাপটিয়ে ফিরিয়ে রাখে।

মাঠের রৌদ্র উত্তপ্ত হয়ে কারখানায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কিংবা অফিসের ধকল সামলিয়ে শ্রান্ত দেহে নিরস মনে বাড়ি ফিরতেই নারীর হাসিমুখে সাদর সম্ভাষণ, খাদ্য পানীয় দান ও ব্যজনী ব্যজন দ্বারা পুরুষের দেহ-মনের শ্রান্তি দূর করে এক নতুন উদ্যমের সঞ্চার করে দেয়।

নারীর উপলক্ষে কবির কবিতা ফুটেছে, গায়েকের কণ্ঠে গুঞ্জন উঠেছে, সাহিত্যিকের সাহিত্য পুষ্ট হয়েছে, এমনকি সূফীর সাধনা পূর্ণ হয়েছে।[৩]

---

[১] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, ইসলামে নারীর মর্যাদা,(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৫৭), পৃ.১।

[২] মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.১-২।

[৩] মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

০২

নারীকে তিনি সর্বক্ষেত্রে পুরুষের কর্মপ্রেরণার উৎস হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যে বাড়াবাড়ি করেন নি তা প্রমাণ করার জন্য কুরআন, হাদীস ও আরবি-ফারসি কবিতাংশকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।[৪]

পৃথিবীতে যত কল্যাণ সাধিত হয়েছে তাতে পুরুষের তুলনায় নারীর আবদান কোন অংশ কম নয়, এ কথা প্রমাণ করার জন্য লেখক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, "যদিও আদিকাল হতে দেখা যাচ্ছে যে, দুনিয়ার কতৃত্ব ও নেতৃত্ব পুরুষদেরই হাতে। এর দ্বারা কেবল একথা প্রমাণিত হয় না যে, পুরুষরাই পৃথিবীর উন্নতি ও কল্যাণের সিংহভাগ সাধন করেছে। বরং আমাদের ভেবে দেখা উচিত, পুরুষের শক্তিমত্তা, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ভিতিরে নারী কাজ করে যাচ্ছে। নারীই পুরুষের কর্মস্পৃহা বাড়ায়। এক্ষেত্রে তিনি একটি সুন্দর উদাহরণ পেশ করেছেন – "ধান ভাঙ্গা কলের যে বাক্সটি হতে চাল বের হয় তা দেখে আমরা বাক্সটিকে সবকিছু মনে করি; ইঞ্জিন, চাকা, বলটু, ফিতা ইত্যাদির অবদানকে যদি অস্বীকার করি, তা যেমন ভুল হবে, তেমনি পুরুষের কর্ম ও অবদানের ক্ষেত্রে নারীর প্রেরণা ও গৃহে থেকে পুরুষের কাজের নানা ধরনের সহযোগিতার কথাকে অস্বীকার করে কেবল পুরুষকেই মূল্যায়ন করি তাহলে তা সমান ভুল হবে।"[৫]

০৩

ইসলামে নারীর মর্যাদাকে যথার্থরূপে তুলে ধরার জন্য লেখক অন্যান্য ধর্মে নারীর অবমাননাকর অবস্থার কথা উল্লেখ করে পাঠকের উপর ইসলামে নারীর অধিকার বিচার করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

যেমন– ইয়াহুদী ধর্মে নারীদেরকে বেচা–কেনা করা হয়। তাদেরকে মনে করা হয় দাসী। ইচ্ছা অনুযায়ী যতগুলি খুশি বিয়ে করা যায়। পুত্রের বর্তমানে স্ত্রী কোন সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার রাখে না। তাদের ধর্মমতে নারী সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে আনন্দ ও আরাম পরিবেশন করা। নারী পাপের প্রস্রবণ। কোন পুণ্যময় কাজ করার অধিকার নারীর নেই।

---

[৪] "নারীকে পেয়ে সূফীর সাধনা পূর্ণ হয়েছে" এ বক্তব্যের দলীল হিসাবে মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির নিম্নোক্ত হাদীস ও ফার্সি কবিতাংশ উল্লেখ করেছেন।

عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا شراركم غرابكم وركعتان من متاهل خير من سبعين ركعة من غير متاهل - وايضا قال ابن عباس لايتم نسك الناسك حتي يتزوج

متاب از عشق روگرچه مجازيست * كه ان بهر حقيقت سازيست

بلوح اول الف باتا نخواني * زقران درس خواند كي تواني

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৩

[৫] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৪।

Dhaka University Institutional Repository

দুইজন পুরুষের মধ্যে ঝগড়া হলে যদি কোন নারী তার স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে আসে তবে তা অমার্জনীয় বলে গণ্য হবে এবং এজন্য নারীর উভয় হাত কেটে দেওয়া হবে।[৬]

যরোয়েস্ট্রীয়[৭] (মজুসী) ধর্মে কোন ঋতুবতী নারীর জন্য সূর্য দেখা, আগুন দেখা, পুরুষের সাথে কথা বলা, পানিতে নামা, হাতে কাপড় বা অন্যকিছু না পেচিয়ে খাদ্য পাত্র স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। কোন ঋতুবতী নারী যদি উপরিউক্ত কোন কাজ করে তাহলে তার জন্য স্বর্গ হারাম।[৮]

হিন্দু ধর্মে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বেচেঁ থাকার অধিকার ছিল না। সতীদাহ প্রথার নামে মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে জীবন্ত দগ্ধ করা হত। যদিও এ বিধান রহিত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে যে দাহ না করা হলে স্ত্রী স্বর্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। হিন্দু ধর্ম মতে, নারী স্বাধীনা হওয়ার উপযুক্ত নয়। তুলসী রামায়ণে নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাষায় বলা হয়েছে, নারী জাতির অন্তরে সর্বদা আটটি দোষ বিদ্যমান থাকে – ঔদ্ধত্য, মিথ্যা, চালাকি, শঠতা, ভয়, বুদ্ধিহীনতা, কর্কশতা এবং দয়াহীনতা। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে নারীকে 'হীন', 'পাপমূর্তী' ও 'বিশ্বাসের অযোগ্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯]

বৌদ্ধ ধর্মেও নারীত্বের প্রতি অপমানকর উক্তি করা হয়েছে। বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হলো "নারীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে?" বুদ্ধ উত্তর করলেন "নারীর প্রতি দৃষ্টি করাও মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী"। নারী একটি সশরীরী ছলনামাত্র, তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা কর"।[১০]

খ্রিস্ট ধর্মে বলা হয়েছে, "নারী শয়তানের শক্তি, অজগর সর্পের মত রক্তপিপাসু, নারীর মধ্যে সর্পবিষ নিহিত আছে। সমস্ত নৈতিক ত্রুটির মূল উৎস নারী। শয়তানের বাদ্যযন্ত্র, দংশনোন্মুখ বিচ্ছু এবং প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনের উপর শয়তান রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নারী শয়তানের সাহয্যকারিণী"।[১১]

---

[৬] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৫।

[৭] খৃষ্টপূর্ব ৬৬০-৫৮৩ সনে ইরানের মাদী শহরে যরোয়েস্ট্রী (Zoroastre) নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে ধর্মমত প্রচলন করেন তার নাম যরোয়েস্ট্রী ধর্ম।
দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৭।

[৮] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.১০।

[৯] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩-১৪।

[১০] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

[১১] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ধর্মে নারীর স্থান উল্লেখ করণের মাধ্যমে শরীফ সাহেব পাঠকদের সামনে তুলনামূলক পর্যালোচনার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। কেবল ইসলামে নারীর মর্যাদা আলোচনা না করে অন্যান্য ধর্মে নারীদের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা ও হেয়প্রতিপন্ন করার বাস্তবচিত্র তুলে ধরে ইসলামে নারীদেরকে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি উল্লেখ করার ফলে পাঠকদের নিকট বইটি বেশি সমাদৃত হয়েছে।

লেখক জাহেলী যুগে নারীদের করুণ অবস্থারও বিবরণ দিয়েছেন। তখন পরিবার ও সমাজে নারীর কোন অধিকার ছিল না। নারীরা ছিল ভোগের সামগ্রী। এর পরই ইসলাম আগমন করে নারীদেরকে যে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে তার বিবরণ দিয়েছেন তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। এতে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা অতি উজ্জল আভায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

০৪

লেখক পাঠকদের নিকট সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিভিন্ন দিক আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য ধর্মে যে সব ক্ষেত্রে নারীকে অবজ্ঞা করা হয়েছে তিনি সে সব ক্ষেত্রে ইসলামে নারীর প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মর্যাদা প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং পাঠকদের প্রতি অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করার আহবান জানিয়েছেন।[১২]

যেমন–

সৃষ্টিগত তাৎপর্যে : মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির লিখেছেন, "বিভিন্ন ধর্মে যেখানে নারীর জন্মই পাপ বলা হয়েছে ইসলামে সেখানে নারী জন্মের সূচনাকে অনেক কাঙ্খিত বলা হয়েছে। হযরত আদম (আ) যখন জান্নাতের বিভিন্ন ফল-ফলাদি, ঝর্ণাধারা, নাজ-নেয়ামত লাভ করেও শান্তি পাচ্ছিলেন না, তখন তাঁকে শান্তি দানের জন্য অতি কাঙ্খিত জন হযরত হাওয়া (আ) কে সৃষ্টি করা হয়। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এর নিকটও নারী ছিল অত্যন্ত প্রিয়"।[১৩]

লেখক কুরআনের একটি বাণী উল্লেখ করে জন্মগতভাবে পুরুষের তুলনায় নারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তা হল- "পুরুষ নারীর সমতুল্য নয়"।[১৪]

---

[১২] লেখক মহানবীর (স) নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

[১৩] قال النبي صلي الله عليه وسلم اربع من اعطيتهن فقد اعطى خير الدنيا والاخرة قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن علي البلاء صابر وزوجة لاتبغيه خوفا في نفسها ولا ماله (رواه البيهقي)

[১৪] লেখক নিম্নোক্ত বাণীটির মাধ্যমে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন-

وليس الذكر كالانثى :(القران،٣:٣٦)

Dhaka University Institutional Repository

লেখক বিভিন্ন রূপে নারীর মর্যাদা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অধিকার কুরআন ও হাদীসের দলীলসহ উল্লেখ করেছেন। যেমন– কন্যারূপে, স্ত্রীরূপে, মাতৃরূপে ইত্যাদি।

ইসলাম-পূর্ব যুগে কন্যা সন্তান লাভ করা অপমানকর মনে করা হত। কন্যা সন্তান লাভের অপমানকে এড়ানোর জন্য তখনকার লোকেরা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করত। ইললামের আবির্ভাবের পরে নারীরা কন্যা হিসাবে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। লেখক কন্যা হিসাবে নারীর মর্যাদাকে দলীলসহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে কন্যা সন্তান লাভ করাকে সৌভাগ্য প্রমাণ করেছেন। যেমন হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– "প্রথমে কন্যা সন্তান প্রসব করায় জননীর সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে"।[১৫]

মহানবী (স) আরো বলেছেন, "যে ব্যাক্তি দুইটি কন্যাকে বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, সে এবং আমি কিয়ামতের দিন এইরূপ নিকটবর্তী থাকব। এই বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলি মিলিয়ে নৈকট্যের পরিমাণ প্রদর্শন করলেন"।[১৬] এ ধরনের অনেক গুলি হাদীসের মাধ্যমে লেখক কন্যা হিসাবে ইসলামে নারীর মর্যাদাকে প্রমাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।[১৭]

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নারীদেরকে স্ত্রী হিসাবে যে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে লেখক তার একটি অত্যুজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন। লেখক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সুসম্পর্ককে "দুই দেহ এক প্রাণ" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি হাদীসের বাণী উল্লেখ করে পুরুষদেরকে স্ত্রীর প্রতি সুহৃদ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।[১৮] কুরআনের বাণী উল্লেখের মাধ্যমে তিনি স্বামীদেরকে স্ত্রীদের সাথে ন্যায়সঙ্গত জীবনযাপনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।[১৯] হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করে তিনি পাঠকের সামনে মহানবী (স) তাঁর স্ত্রীদেরকে কত মর্যাদা প্রদান করেছেন তা তুলে ধরেছেন।[২০]

---

[১৫] হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে

قال النبي صلي الله عليه وسلم بركة المرأة تبكيرها بالانثى (رواه ابن العساكير)

[১৬] قال النبي صلي الله عليه وسلم من عال جار يتين حتي تبلغا جاء يوم القيامة انا هو هكذا وضم اصابعه (رواه مسلم)

[১৭] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।

[১৮] লেখক নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

قال النبي صلي الله عليه وسلم ان من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا والطفهم باهله (رواه الترمذي)

[১৯] স্ত্রীদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ-

وعاشروهن بالمعروف ،(القران، ٤:١٩)

[২০] হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস-

عن عائشة انها كانت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقته فسبقته علي رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني قال هذه بتلك السبقة (رواه ابوداؤد)

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী হিসাবে নারীর মর্যাদা আলোচনায় লেখক তালাক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ইসলামে তালাকের ব্যবস্থাকে লেখক কল্যাণকর আখ্যায়িত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইসলামী তালাকের কথা শুনে অন্য ধর্মাবলম্বিগণ কখনো হেসে থাকেন। তারা বলেন, একবার বন্ধনের পর আবার তালাক দেওয়া অভদ্রতা ও নির্দয়তার পরিচায়ক। ইসলাম বলে মানুষের জীবন সুশৃঙ্খল এবং শান্তিময় করাই বিয়ের উদ্দেশ্য। বিয়ের পর এই শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ বজায় রাখার চেষ্টা করা স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই উপর ফরয। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি কোথাও স্বামী-স্ত্রীতে মনের মিলন না হয়ে বসে, বহু চেষ্টার পরও যদি মনের মিল না-ই হয় এমতাবস্থায় তালাকের ব্যবস্থা থাকলে সারা জীবনের অশান্তি বা বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।[২১]

তবে তিনি তালাকের কুফল ও সমাজে অহরহ যে তালাক হচ্ছে তার ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচনা করে তালাকের প্রতি নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন-তালাক দেওয়া জায়েয হয়ে থাকলেও তালাক যে ঘৃণ্য কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি মহানবীর (স) হাদীস উল্লেখ করেছেন– "তালাক দেওয়ার চেয়ে ঘৃণ্য কোন কাজ আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন নি।[২২]

সমাজে প্রচলিত তালাক ব্যবস্থার তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "জীবনে বহু ভাইকে দেখেছি অল্পে রাগ হয়েই অদূরদর্শিতাবশত স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসে। তাও আবার এক দুই বা তিন তালাক দিয়াই ক্ষান্ত হয় না। হাজার হাজার তালাক দিয়া ফেলে। শুধু তাই নয়, শ্বশুর শাশুড়ির গোষ্ঠী জ্ঞাতি শুদ্ধ তালাক দেয়। আবার তালাকপ্রাপ্ত বিবিকে ফিরিয়ে আনার জন্য ফন্দি আটে বা হীলা মাসআলা শিক্ষার্থে আলিমগণের নিকট দৌড়াদৌড়ি কান্নাকাটি ও গড়াগড়ি করে।[২৩]

এরপর লেখক কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তালাকের বিধি-বিধান পাঠকদের নিকট উপস্থাপন করেছেন।[২৪]

---

[২১] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

[২২] রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন

ماخلق الله شيئا علي وجه الارض ابغض اليه من الطلاق (رواه الدار قطني)

[২৩] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২।

[২৪] তালাক সম্পর্কিত নিম্নোক্ত আয়াতটি শরীফ সাহেব উল্লেখ করতঃ তালাকের শরয়ী বিধান আলোচনা করেছেন-

الرجال قوامون علي النساء ..... ان الله كان عليما خبيرا ،(القران ٤:٣٩)

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তা স্থায়ী করার জন্য লেখক উভয়কে সুন্দর ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। "ভদ্র আচরণ" শিরোনামে তিনি স্বামীদেরকে স্ত্রীদের সাথে মোলায়েম আচার-আচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "নিজের কন্যার সাথে তার জামাই দুর্ব্যবহার করুক, এটা যেমন কেউ কামনা করে না, তেমনি নিজ স্ত্রীর সাথে স্বামীর দুর্ব্যবহারও কাম্য নয়। কেননা সেওতো কোন পিতামাতার আদরের সন্তান"। এ প্রসঙ্গে তিনি দলীল হিসাবে কয়েকটি হাদীসও উল্লেখ করেছেন।[২৫]

লেখক নারীদের প্রতিও স্বামীর সাথে সঙ্গত আচরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আসমা বিনতে খারিজাতুন ফাযারী তার কন্যাকে স্বামীর গৃহে যাওয়ার সময় যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করেছেন।[২৬]

নারীদেরকে লেখক মায়ের জাতি আখ্যা দিয়েছেন। তিনি মুসলমানদেরকে মায়েদের প্রতি সদাচারণের উপদেশ দিয়েছেন। কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বাণী উল্লেখের মাধ্যমে তিনি মায়ের সেবা-যত্ন করা ও মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব পাঠক সমীপে তুলে ধরেছেন।[২৭]

---

[২৫] লেখক স্ত্রীদের ভাল ব্যবহার সম্পর্কিত ৫টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হল-

قال النبي صلي الله عليه وسلم اتقو الله في النساء فانهن عند كم عوان

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩-৩৬।

[২৬] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮-৩৯।

[২৭] পিতামার সাথে সদ্ব্যবহার করার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ-

وقضي ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنتهر هما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ،(القران : ١٧)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

ان رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين علي ولدهما قال هما جنتك ونارك (رواه ابن ماجه)

এছাড়াও তিনি অনেকগুলি হাদীস উল্লেখ করে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন।

দ্রঃ মাওলানা শরীফ মুহম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

০৬

পুস্তকের মধ্যভাগে লেখক শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার আলোচনা করেছেন।

যেমন– পিতার ও স্বামীর সম্পদ লাভ, সাক্ষ্যদান, শিক্ষা–দীক্ষা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, বিয়ে ও তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামে নারীকে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। নারীর সার্বিক অধিকারকে প্রমাণ করার জন্য লেখক কুরআন ও হাদীসের বাণী ও মনীষীদের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। লেখক প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অন্যান্য ধর্মে নারীর অধিকার-বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে ইসলামে নারীর অধিকারের নিশ্চয়তার প্রশংসা করেছেন এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।[২৮]

[২৮] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২-৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের পর্দা প্রথাকে লেখক নারীর ইয্যত-আব্রু হিফাযতের রক্ষাকবচ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি দলীল হিসাবে কুরআন মাজীদের একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। তা হলো "হে নবী ! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন তারা যেন আচ্ছাদান-বস্ত্র পরিধান করে, তা হলে সম্ভবত তারা পরিজ্ঞতা হবে, কাজেই তারা ক্লিষ্টা হবে না।[২৯] 'বিবাহ' শিরোনামে লেখক বিবাহের উপকারিতা, কোন ধরনের পাত্রের সাথে কোন ধরনের পাত্রীর বিবাহ দেওয়া সঙ্গত ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। লেখক রূপের পাশাপাশি গুণ দেখে বিবাহ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি কবির ভাষায় বলেছেন–

রূপে শুধু আঁখি ভুলে
গুণেতে হৃদয় গলে।[৩০]

তিনি বিধবা বিবাহ ইসলামে বৈধ হওয়ার কল্যাণকর দিকগুলো আলোচনা করেছেন। লেখক উল্লেখ করেছেন "অনেক ধর্মে স্বামী মরার পর স্ত্রীকে চিরদিনের জন্য যৌনবৃত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। কোন কোন ধর্মে তাদেরকে জোরপূর্বক জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করার ন্যায় নৃশংস আচরণ করা হয়। ইসলামে বিধবা নারীদের বিবাহের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এতে অবশ্যই কল্যাণ নিহিত রয়েছে"।[৩১] তবে যদি কোন বিধবা নারী সন্তান লালন-পালন করার জন্য বিবাহ থেকে বিরত থাকে তা ইসলামে অনুমোদিত। এব্যাপারেই ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে।[৩২]

শুধু নারীর অধিকার বর্ণনা করেই শরীফ সাহেব ক্ষান্ত হন নি। বরং তিনি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক বা অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা করে সুখী পরিবার গঠনের প্রতি নারী-পুরুষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। স্বামীকে খুশী করার জন্য লেখক স্ত্রীকে আটটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি হাদীসের মাধ্যমে এর গুরুত্বও তুলে ধরেছেন।[৩৩]

---

[২৯] আল্লাহ বলেন- يا ايها النبي قل لا زواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذالك ادني ان يعرفن فلا يؤذن ، (القران الكريم، ٣٣:٥٩)

[৩০] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

[৩১] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

[৩২] বিধবা নারী কর্তৃক সন্তান লালন-পালনের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে মহানবী (স) বলেছেন-
انا وسفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة واومي بالوسطى والسبابة امرأة امت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها علي ايتامها حتى بلغوا اوماتوا (رواه الترمذي)

[৩৩] স্বামীকে খুশী রাখার ব্যাপারে মহানবী (স) বলেছেন-
ليس من امرأة اطاعت ربها وادت حق زوجها وتذكر حسنه ولا تخونه في نفسها وماله الا كانت بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة فان كانت زوجها مؤمنا حسن الخلق فهي روجته في الجنة والازوجها الله من الشهداء (رواه الطبراني)
দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

লেখক "নয়া যামানায় মুসলিম নারীর স্থান" শিরোনামে বর্তমান আধুনিক যুগে মুসলিম নারীদের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি নারীদের শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হয়ে সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তবে তিনি শরীআতের সীমা অতিক্রম না করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "কুরআন-হাদীসের আলোক-রশ্মি ধরেই আমাদের পথ চলতে হবে। ঐ আলোক রশ্মির বাইরে পা দিলেই আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী"। এক্ষেত্রে তিনি মহানবী (স) বাণী– "আমি দুটি জিনিস তোমাদের মধ্যে রেখে গেলাম, যতক্ষণ তোমরা এ দুটিকে আকড়ে থাকবে ততক্ষণ তোমাদের পতন নাই"[৩৪]—এই হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। তিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারীর কর্মস্থল ঠিক করে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "নারীর কর্মতালিকা প্রণয়নে সর্বপ্রথম আসবে ধর্ম। ধর্মকে বাদ দিয়ে আমরা কোন কাজে অগ্রসর হতে পারি না। প্রথমে আমাদের ধর্ম তারপর রাষ্ট্র"।[৩৫]

লেখক নারী পুরুষের কর্মস্থল আলাদা করার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তিনি উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন– "সুইজারল্যান্ডের ঘরে ঘরে এমন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেক ঘরের মেয়েরা ঘরের কোণে বসে ঘড়ি ও এর বিভিন্ন অংশ তৈরি করে দুনিয়ার বাজার দখল করে আছে। অস্ট্রেলিয়ায় এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে প্রতিটি নারী নানা রকম ফলমূল, খাদ্যদ্রব্য এমনকি মাছটি পর্যন্ত বাটায় ভরে দিয়ে দেশের অর্থ কৌশলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের অধিকাংশ সমাজ-নেতা ও সাহিত্যিক মনে করেন যে, পর্দা প্রথার অভিশাপে নারী সমাজ উন্নত হচ্ছে না।" লেখকের মতে পর্দার ভিতরে নারীর কর্মস্থল হলে দেশের উন্নতি অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। তিনি যুক্তি প্রদান করেছেন, "বিজলি বাতির Negative ও Positive দুই স্বতন্ত্রতায় রাবারের পর্দায় থেকে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে এবং এক নির্দিষ্ট স্থানে উভয়ের কার্যের ফল একত্রিত হলে বাতি জ্বলে। পথিমধ্যে পর্দাছিড়ে Negative ও Positive এ মিলন হলে বাতি জ্বলবে না, অন্ধকার দূরীভূত হবে না, বরং বিপদ ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিবে। এইরূপ নারী ও পুরুষ উভয়ই তাদের স্বতন্ত্র কর্মস্থলে কাজ করতে থাকবে, আর এই দুই কাজের ফল যখন একত্রিত হতে থাকবে তখন রাষ্ট্র উন্নতির আলোকে আলোকিত হবে। আর যদি এ না হয়ে নারী পুরুষের কর্মস্থল এক হয়ে যায় তবে রাষ্ট্রের উন্নতি সুদূর পরাহত এবং অবনতি অনিবার্য"।[৩৬]

---

[৩৪] قال النبي صلي الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله.

[৩৫] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮।

[৩৬] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৯১-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

০৮

"হাদীসের উপদেশ" শিরোনামে লেখক নারী সমাজের প্রতি বিশটি চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনের উপদেশ দিয়েছেন। তা হলো : কৃতজ্ঞতা, সবর, আমানত, ধৈর্যশীলতা, ভদ্রতা, কুৎসা-গীবত থেকে বিরত থাকা, অল্পে তুষ্টি, উদারতা, বাজে কথা না বলা, মিথ্যাবাদিতা পরিহার, পর্দা মেনে চলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, শালীন পোষাক পরিধান, গান-বাজনা না করা, অকারণে ছবি না তোলা, ভোগ বিলাস পরিহার এবং নারী নেতৃত্ব পরিহার করা। এ সব বিষয় সম্পর্কে তিনি কুরআন ও হাদীসের দলীলের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুন্দর আলোচনা করেছেন।[৩৭]

০৯

পরিশিষ্টে লেখক নারী শিক্ষার একটি নূন্যতম অপরিহার্য স্কীম উপস্থাপন করেছেন। তাঁর তৈরীকৃত সম্ভাব্য স্কীম নিম্নরূপ ঃ

১ কুরআন শরীফ : তাজবীদ সহকারে।

২. দ্বীনী ইলম : ঈমান, আকাইদ, পাক-নাপাক, ওযূ, গোসল, নামায, রোযা, হালাল – হারাম, নিকাহ, তালাক ——এই গুলির বিস্তারিত শিক্ষা এবং হজ্জ, যাকাত, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত শিক্ষা।

৩. মুআশারাত : মাতাপিতা, শ্বশুর–শাশুড়ি, স্বামী–স্ত্রী, সন্তান–সন্ততি, আত্মীয়–কুটুম্ব, পাড়া–প্রতিবেশী প্রভৃতি ছোট–বড়দের হক সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন।

৪. গণিত : সাংসারিক আয়–ব্যয়ের হিসাব–নিকাশ করতে পারে এমন শিক্ষা। যেমন– অমিশ্র ও মিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি বিবিধ প্রশ্নসহ।

৫. স্বাস্থ্য রক্ষা : স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়মাবলি ও পারিবারিক চিকিৎসা।

৬. বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

৭. ইতিহাস : নবী–ওলীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও আদর্শ, মুসলিম নারীগণের জীবনের ইতিহাস।

৮. ভূগোল : বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ভৌগলিক জ্ঞান।

৯. শিল্প : দেশচল হিসাবে সূচী–শিল্প, সিঙ্গার মেশিনের ব্যবহার, তেল, সাবান ও শরীয়তসম্মত প্রসাধন প্রস্তুত।

---

[৩৭] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫-১১১।

Dhaka University Institutional Repository

১০. রান্না : দেশ ও সমাজচল হিসাবে সাধারণ ও উচ্চ শ্রেণীর খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত শিক্ষা।

১১. সাময়িকী : ইসলামী নীতি ও সমসাময়িক জ্ঞান।[৩৮]

লেখক প্রথম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষার একটি পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করেছেন এবং বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, শরীফ সাহেবের 'ইসলামে নারীর মর্যাদা' মুসলিম নারী সমাজের উন্নতি–অগ্রগতির একটি কল্যাণকর দিক নির্দেশনা হিসাবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। আমরা লেখককে মুসলিম নারী মুক্তির দিশারী আখ্যা দিতে পারি। গ্রন্থটির ভাষা–মাধুর্য, শব্দালঙ্কার, উপমা, শৈলী ইত্যাদি পর্যালোচনা করে এটিকে আমরা সুখপাঠ্য এবং লেখকের সার্থক সৃষ্টি বলতে পারি।

[৩৮] মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ.১১২-১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. আউলিয়া কাহিনী

'আউলিয়া কাহিনী' মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত একটি ইসলামী গল্পগ্রন্থ। ২৭৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ গ্রন্থটি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে শরীফ পাবলিকেশন্স, রহমতপুর, ঝালকাঠী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সাহাবা কিরাম (রা) এর যুগ থেকে শুরু করে লেখকের সমকাল পর্যন্ত আল্লাহর ওলীগণের বিভিন্ন কাহিনী অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। লেখক আউলিয়া কিরামকে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করে পাঠকদেরকে তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছেন। 'আউলিয়া কাহিনী' গ্রন্থের সকল গল্পই বাস্তব। আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তিনি উক্ত গল্পগুলোকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে তার মাধ্যমে তার গ্রন্থকে সাজিয়েছেন। গ্রন্থের সূচনাতে তিনি 'গুযারিশ' শিরোনামে লিখেছেন, "আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় লিখিত অনেকগুলি জীবনী গ্রন্থ সম্মুখে লইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাষায় এখানে আউলিয়ায়ে কেরামের কাহিনী প্রকাশ করিতেছি। আউলিয়ায়ে কিরামের জীবনের আদর্শাবলী আকাশের নক্ষত্ররাজির মত অসীম ও অগণিত ..... এই বই দ্বারা সমাজের একটি লোকও যদি আল্লাহর পথে চলিতে এতটুকুন সাহায্য পায় তবেই শ্রম সার্থক হইবে।"[৩৯] আমরা সচরাচর যে সব গল্পের বই পড়ি তাতে অনুকরণীয় আদর্শ কিংবা উপদেশ যথেষ্ট পরিমাণে নাও থাকতে পারে। কিন্তু শরীফ সাহেবের এ গ্রন্থে যে সব কাহিনী আছে, তা যেমন বাস্তব তেমনি অনুকরণীয়। বইটিতে এমন কতিপয় গল্প রয়েছে যা পড়ে বিস্ময়কর মনে হয়। এর ফলে গ্রন্থটি পড়ার প্রতি পাঠকের কৌতূহল বৃদ্ধি পায়।

'আউলিয়া কাহিনী' গ্রন্থে উল্লেখিত মজার মজার গল্পগুলোর বেশিরভাগই আউলিয়া কিরামের কারামাত বা আলৌকিক ঘটনা। গল্পগুলো পড়লে পাঠকের মধ্যে নেক আমলের স্পৃহা জাগে। গ্রন্থটিকে আমরা নিম্নের আলোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারি।

০১

গ্রন্থের সূচনাতে লেখক আউলিয়া কিরামের বিদ্যমানতা ও তাঁদের পরিচয় কুরআনের আয়াতের দলীল দ্বারা পাঠকের সামানে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'ওলী ও বিলায়াতের প্রমাণ' শিরোনামে লেখক কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করে আউলিয়া কিরামের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেছেন। তা হলো

১. আল্লাহর ওলী আছেন।
২. তাঁদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা দুঃখিত হবেন না।

---

৩৯ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, আউলিয়া কাহিনী, (ঝালকাঠী : শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৯), পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

৩. যাঁরা ঈমান আনয়নের পর আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করার পাশাপাশি নিষিদ্ধ কাজ হতে ফিরে থাকেন এবং আদিষ্ট কাজগুলো পালন করেন তারাই ওলী।

৪. দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের মর্যদা অপ্রতিরোধ্য।

৫. আউলিয়া কিরাম তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ জীবনে কৃতকার্য।[৪০]

আউলিয়া কিরামের পরিচয় প্রসঙ্গে লেখক কয়েকজন মনীষীর উদ্বৃতিও তুলে ধরেছেন।[৪১] লেখকের মতে সকল মুসলমানই কম-বেশি ওলী। কেননা কুরআন মাজীদে ওলীদের পরিচয়ে বলা হয়েছে "যাঁরা ঈমান আনে এবং আল্লাহকে ভয় করে।" এ বৈশিষ্ট্য সকল মুসলমানের মধ্যেই কম-বেশি থাকে।

লেখক কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা ওলীগণের মর্যদা, তাদের দুআ কবুল হওয়া এবং তাদের অমরত্ব প্রমাণ করেছেন।[৪২]

---

৪০ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

দ্র. আলকুরআন, ১০:৬২।

৪১ লেখক তার গ্রন্থে ওলীগণের পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৬ জন মনীষীর দেয়া সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ

◆ ইমাম কুসাইরী বলেন, যার আনুগত্য ও বশ্যতা পূর্ণ হয়েছে এবং যিনি নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র মুরব্বী (অভিভাবক) নির্ধারণ করেছেন তিনিই ওলী।

◆ আল্লামা সাআদ শরহুল আকাঈদে লিখেছেন, যিনি আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাতের সাথে যথাসম্ভব পরিচিত, ইবাদাত ও আনুগত্যে সদামগ্ন, পাপ হতে পলায়নপর, রিপু-নির্লিপ্ত তিনিই ওলী।

◆ আল্লামা জুনাইদ বোগদাদী বলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুকে যিনি ভয় করেন না, যিনি কারণ বিচার না করে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি তুষ্ট তিনিই ওলী।

◆ হযরত বায়জিদ বোস্তামী বলেন, যিনি প্রবৃত্তির দাস নহেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করে চলেন তিনিই ওলী।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫।

৪২ কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ওলীদের পরিচয় দিয়ে তাদের সাথে জীবন যাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا

দ্র. আলকুরআন, ১৮:২৮।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন

من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাকে আমি আমার সাথে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। লেখক কুরআনের আয়াত ادعوني استجب لكم "তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকের সাড়া দিব" উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে আল্লাহ তার বান্দার দুআ কবুল করেন। ওলীগণ যেহেতু আল্লাহর খুবই প্রিয় বান্দা। সুতরাং তাঁদের দুআ খুব তাড়াতাড়িই কবুল হয়।

দ্র. আল কুরআন, ৪০:৬০।

Dhaka University Institutional Repository

ওলীগণের শ্রেণীবিভাগ ও স্তরবিন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, এই দুনিয়ার সমাজব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য যেমন প্রকাশ্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আছে তেমনি এর রুহানী তদারকের জন্য একটি অদৃশ্য বিধান ও গোপন পরিচালনা সংঘ আছে। একে বিলায়েত বলা হয়। এই বিলায়েত সংঘের কার্যকারিতায় রুহানী জগত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। লেখক বিলায়েত রাজ্যের ৯টি স্তরের কথা সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনা করেছেন ।[৪৩]

লেখক পাঠকদেরকে রূহানী জগতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, যা সত্যিই রহস্যময়। তবে এ জগত কল্পনাপ্রসূত নয়। বরং রুহানী জগত বাস্তব। রুহানী জগত সম্পর্কিত বই-পুস্তক আমাদের হাতের নাগালে কম। বাংলা ভাষাতে এ ধরনের পুস্তক নেই বললেই চলে। সে জন্য 'আউলিয়া কাহিনী' গ্রন্থকে বাংলা ভাষার এক ভিন্ন ধরনের গ্রন্থের নতুন সংযোজন বলা যেতে পারে। ওলীগণের কারামতের সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক দৃঢ়তার সাথে বলেন, কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা ওলীগণের কারামতকে অস্বীকার করেন। অথচ কুরআন মাজীদে অন্যান্য নবীদের উম্মতদের অনেক কারামত উল্লেখ আছে। যেমন- হযরত মরিয়ম (আ) এর মসজিদে গায়েব হতে ফল আমদানী হওয়া[৪৪] আসহাবে কাহাফের ৩০৯ বছরের নিদ্রা[৪৫] সুলাইমান (আ) এর দরবারে বরখিয়া কর্তৃক নিমিষের মধ্যে বিলকিসের সিংহাসন আনয়ন ইত্যাদি। পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের দ্বারা যদি এত বড় বড় কারামত সংঘটিত হতে পারে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (স) এর উম্মতের দ্বারা কারামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং ওলীগণের কারামত সত্য। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা। বর্তমান জামানায় যখন সহীহ আকীদা থেকে মানুষের বিচ্যুতি এবং রুহানী জগতের প্রতি মানুষের ধারণার কমতি লক্ষণীয়। এহেন মুহূর্তে এ ধরণের একটি গ্রন্থ দীর্ঘ দিনের চাহিদা পূরণ করেছে এবং বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

---

৪৩ বেলায়েত রাজ্যের ৯টি স্তর হলো : ১. আকতাব; ২. আয়িম্মা; ৩. আওতাদ; ৪. আবদাল; ৫. নুকাবা; ৬. নুজাবা; ৭. হাওয়ারিয়্যুন; ৮. রজীবুন; ৯. খাতাম।

৪৪ কুরআন মাজীদে হযরত মরিয়ম (আ) নিকট গায়েব হতে ফল আসার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم اني لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب

অর্থাৎ, যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে মরিয়মের কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন, মরিয়ম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি বলতেন এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দেন।

দ্র. আল কুরআন, ৩:৩৭।

৪৫ কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন وليبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا

অর্থাৎ, তাদের উপর তাদের গুহায় তিনশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। আরো নয় বছর অতিরিক্ত অতিবাহিত হয়েছে।

দ্র. আল কুরআন, ১৮:২৫।

Dhaka University Institutional Repository

০২

'আউলিয়া কাহিনী' গ্রন্থে দশজন বিশ্ববিখ্যাত ওলীর বিভিন্ন কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এর অধিকাংশ কাহিনীই আমাদের আমলী জিন্দেগীর জন্য প্রেরণাদায়ক। আউলিয়া কিরামের তাকওয়া, বিনয়, তাঁদের রুহানী শক্তি, ইবাদত-বন্দেগি, আল্লাহর দরবারে তাদের আহাজারি-কান্নাকাটি ইত্যাদির বিবরণ সত্যিই বিস্ময়কর এবং খোদায়ী প্রেমাচ্ছাদনের ক্ষেত্রে প্রেরণার উৎস। হযরত হাসান বসরী (রহ) থেকে লেখকের শায়খ ও শ্বশুর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) পর্যন্ত ওলীগণের জীবনের উল্লেখযোগ্য কাহিনী দ্বারা লেখক তাঁর গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করেছেন। আমাদের জীবনে এসব কাহিনী পথেয় হিসেবে কাজ করবে - এটাই লেখকের কামনা। তাঁর গ্রন্থের সূচনাতে 'দোয়াপত্র' শিরোনামে ছারছীনার পীর মরহুম মাওলানা শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ লিখেছেন, "আমি দোয়া করি, আল্লাহ পাক এই কিতাবখানা দ্বারা মুসলমানগণকে রুহানী খোরাক দান করুন এবং আউলিয়া কিরামের আদর্শে জীবন গঠন করার তওফীক ইনায়েত করুন।"[৪৬] তার দোয়ার প্রতিফলন বইটি পড়লে কিছুটা হলেও অনুভব করা যায়।

নিচে কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রন্থটির মাহাত্ম্য তুলে ধরা হলো :

◆ হযরত হাসান বসরী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, হযরত হাসান বসরী উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালিমার দুগ্ধ পান করে এবং রাসুল (স) এর মুবারক পেয়ালার পানি পান করে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর তাকওয়া ও বিনয়ের ঘটনা কিংবদন্তীর কাহিনীর ন্যায়। তিনি নিজেকে যে কোন লোকের চেয়ে অধিক গুনাহগার মনে করতেন। একবার তিনি মসজিদের ছাদে বসে এমনভাবে কান্না করেছিলেন যে তার চোখের পানি ছাদে পড়ে সেখান থেকে গড়িয়ে এক লোকের শরীরে পড়ল। শৈশবে একবার তিনি গুনাহ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তা কাগজে লিখে জামার সাথে ঝুলিয়ে রাখতেন এবং তা দেখে দেখে ক্রন্দন করতেন।[৪৭] হাসান বসরীর মত এত বড় ওলী যদি শৈশবের পাপের কারণে এত ক্রন্দন করেন তবে আমরা যারা পাপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকি তাদের কত বেশি ক্রন্দন করা উচিত তা আমরা এ কাহিনী পড়ে কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পারি।

---

৪৬ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত (ভূমিকা অংশ)

৪৭ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

রাবেয়া বসরীয়া ছিলেন এই উম্মতের তাপসীকূল শিরোমণি। রাবেয়া অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করে কঠোর সাধনার মাধ্যমে কিভাবে বিশ্ববিখ্যাত ওলীয়াতে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছিলেন তার কয়েকটি ঘটনা লেখক বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনা আমাদের নারীদের জন্য জীবনাদর্শস্বরূপ। যখন তিনি যুবতী তখন ভাগ্যের পরিহাসে তিনি এক ব্যক্তির ক্রীতদাসী হন। মনিব তাকে কঠোর পরিশ্রমে বাধ্য করত। কিন্তু থেমে থাকেনি তাঁর রিয়াযাত,[৪৮] ইবাদাত মুরাকাবা-মুশাহাদা। এমনকি এক পর্যায়ে তার মনিবের ভ্রম ভাঙ্গল। মনিব বলতে বাধ্য হলেন, আল্লাহর এমন প্রিয় দাসীকে আমার এখানে রাখা ঠিক হয়নি বরং আমারই তার সেবায় নিয়োজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখক হযরত রাবিয়া বসরিয়ার জীবন-কাহিনী বিভিন্ন উপশিরোনামে তুলে ধরেছেন। যেমন-বারবণিতার ঘরে নূরের তুফান, প্রাণপূর্ণ ইবাদত, রাবিয়া বসরিয়ার মুনাজাত, হজ্জের সফরে মৃত গর্দভ জিন্দা হওয়া, কাবা শরীফ কর্তৃক অভ্যর্থনা[৪৯], রাবিয়ার বুজুর্গীর কাহিনী, কারামত বড় কথা নহে, সিদক ও সাদিকের আলোচনা, রোগ-শয্যার একটি কাহিনী, দারিদ্রের মধ্যে মাওলার খুশীর তালাস, রস-রসিকতা, বিবাহ সম্পর্কে, তত্ত্ব-বাণী, কারামত, আঙ্গুলে বাতি জ্বলিল,[৫০] কারামতী গোশত পাক, মকসূদ পূর্ণ হওয়া ইত্যাদি। এসব ঘটনা নারী জীবনের জন্য আদর্শ হতে পারে।

◆ হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ) এর জীবনী সাধারণ মানুষের জীবনীর থেকে ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি বলখের বাদশাহ ছিলেন। এক রাতের একটি ঘটনা থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করলেন যে, আরাম-আয়েশে গা ঢেলে দিয়ে আল্লাহর দিদার লাভ করা সম্ভব নয়।[৫১]

---

৪৮ রিয়াযাত মানে আধ্যাত্মিক সাধনা।

৪৯ হযরত রাবিয়া যখন দ্বিতীয় বার হজ্জ করার জন্য গমন করলেন তখন পথিমধ্যে দেখতে পেলেন খানায়ে কাবা তাকে অভর্থনা জানানোর জন্যে জঙ্গলে চলে এসেছে। এই বছর বিশিষ্ট ওলী ইবরাহীম ইবন আদহাম হজ্জে এসেছিলেন। তিনি মক্কা শরীফ পৌঁছে কাবাঘরের দিকে তাকিয়ে কাবাঘর না পেয়ে হয়রান হয়ে পড়লেন। বললেন, হায়! কাবাঘর কোথায় গেল? উত্তর আসল- খানায়ে কাবা রাবিয়াকে অভ্যর্থনার জন্য গেছে।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

৫০ একদা রাত্রিকালে হযরত হাসান বসরী কয়েকজন সঙ্গীসহ হযরত রাবিয়ার গৃহে উপস্থিত হলেন। ঘরে কোন বাতি ছিল না। অথচ তখন বাতি প্রয়োজন ছিল। রাবিয়া নিজ আঙ্গুলিতে ফুঁক দিলেন। আমনি আলো ঝলমল করে উঠল। সারা রাত ঐ আঙ্গুলি আলো বিকিরণ করছিল।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।

৫১ হযরত ইবরাহীম ইবন আদহাম বলখের বাদশাহ ছিলেন। এক রাতে তিনি আপন বালাখানায় পালঙ্কের ওপর শায়িত। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। এমন সময় ছাদের উপরে আওয়াজ শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এত রাতে ছাদের উপর কে? উত্তর আসল- তোমার দোস্ত। আমার উট হারিয়ে গেছে। তার তালাশে এখানে এসেছি। তিনি বললেন, ছাদের উপরে কি কখনো উট থাকে? ছাদের উপর থেকে উত্তর আসল- ওরে গাফেল, তুমি শাহী তখ্তে আরাম-আয়েশে গা ঢেলে দিয়ে খোদাকে তালাশ করছ। এটা কি আমার ছাদের উপর উট তালাশের চেয়ে কম বিস্ময়কর? একথা শুনার পর ইবরাহীমের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠল। তিনি আল্লাহকে প্রাপ্তির জন্য বাদশাহী পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

তাই তিনি বাদশাহী পরিহার করে ফকীরী জীবনযাপন শুরু করেন। আল্লাহ তাআলার দিদার পাওয়ার ওয়াসীলা হিসেবে পীরের সন্ধানে বের হলেন। বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো তাঁকে। অবশেষে খাজা ফুযাইলের মুরীদ হয়ে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিবিষ্ট হলেন এবং ধীরে ধীরে আল্লাহর ওলীতে পরিণত হলেন। লেখক হযরত ইবরাহীম আদহামের রিয়াযাত, বায়আত গ্রহণ, মক্কা শরীফে সফর, বাগানের চাকরি, হালাল রুজির গুরুত্ব সম্পর্কিত ঘটনা[৫২] ইত্যাদি অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন।

◆ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী মায়ের খেদমতে যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তা যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। প্রচন্ড শীতের এক রাতে বায়েজিদের মা পানি পান করতে চাইলেন। বায়েজিদ পানি খোঁজ করে কোন পাত্রে পানি পেলেন না। তিনি পানি আনার জন্য নদীর দিকে ছুটে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। বায়েজিদ পানির পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা তুমি পানির পাত্র রেখে দাও নি? বায়েজিদ বললেন, আপনি জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি পানি না দিতে পারি এই আশঙ্কায় আমি ঘুমাইনি। মা তার প্রতি অত্যন্ত খুশি হন এবং তার জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেন।[৫৩]

---

৫২ হযরত ইবরাহীম আদহাম নিজে বর্ণনা করেছেন- এক রাতে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে ছিলাম। তথাকার খাদেম সেখানে রাতে কাউকে থাকতে দিতেন না। আমি নিজেকে চটের দ্বারা আবৃত করে লুকিয়ে রাখলাম। রাতের কিয়দাংশ অতিবাহিত হলে-দেখতে পেলাম, হঠাৎ মসজিদের কপাট খুলে গেল এবং চট পরিহিত এক বুযুর্গ সেখানে প্রবেশ করল। তার পিছে পিছে আরো চল্লিশজন আউলিয়া মসজিদে উপস্থিত হলেন। তিনি মিহরাবে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে দুই রাকাআত নামায আদায় করলেন। তারপর সবাই মিহবারের পাশে বসে পড়লেন। তাদের মধ্য হতে একজন বললেন, অদ্য আমরা ছাড়া আরো একজন লোক মসজিদে আছে। তাদের পীর বললেন সে হলেন ইবরাহীম ইবন আদহাম। সে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ইবাদাতের স্বাদ পচ্ছে না। এ কথা শুনে ইবরাহীম দৌড়ে গিয়ে উক্ত পীর সাহেবকে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, একদিন তুমি বসরায় খেজুর ক্রয় করেছিলে। একটি খেজুর নিচে পড়েছিল। তুমি নিজের খেজুর মনে করে তা উঠিয়ে নিয়েছিলে ইবরাহীম ইবন আদহাম তৎক্ষণাৎ খেজুরের মালিকের নিকট গিয়ে মাফ চেয়ে নিলেন।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত,পৃ . ১০২-১০৩।

৫৩ মাওলানা শরীফ মুহম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ . ১৮৬-১৮৭.

Dhaka University Institutional Repository

বায়েজিদ বোস্তামী কর্তৃক এক বেশ্যা নারীর হিদায়াতের ঘটনা[৫৪] রণমাঠে সাহায্যদান, চাটুকারদের প্রতি জওয়াব, অদ্ভুত চিকিৎসা ইত্যাদি ঘটনা পাঠককে যেমন আনন্দ দেয় তেমনি আমলী জিন্দেগীর খোরাক হিসাবে ভূমিকা পালন করে।

♦ লেখকের পীর ও শ্বশুর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) ঈদের সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এক অভিনব পদ্ধতিতে আনন্দ উৎসব করতেন। ঈদের পূর্ব রাতে তিনি স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদের আনন্দব্যঞ্জক কিছু কথাবার্তা বলতেন। ঈদের খুশীর জন্য কন্যাদের প্রত্যেককে কিছু টাকা পয়সা দিতেন। এতে কন্যারা খুব আনন্দ উপলব্ধি করত। পরের দিন ভোরে হুজুর বাড়ির সবাইকে ডেকে আবার আলোচনায় বসতেন। এবার তিনি গরিব-দুঃখীদের দান করার ফযীলত বর্ণনা করতেন। ফলে কন্যারা তাদের সকল টাকা-পয়সা দান করে দিতেন।[৫৫]

এ ছাড়াও 'আউলিয়া কাহিনী' গ্রন্থে হযরত ফুযাইল বিন আইয়ায (রহ.) এর ডাকাত থেকে ওলী হওয়া, হযরত হাবীব আযমীর ইবাদাত-রিয়াযাত, হযরত বাশার হাফীর পরহেযগারী, হযরত মালিক দীনার এর ইখলাস ও কঠোর মুজাহাদা, হযরত শাকীক বলখীর জিহাদী জোশ ইত্যাদি মজার মজার কাহিনী পাঠক হৃদয়ে রেখাপাত করার মত।

লেখক তার গ্রন্থে উল্লেখিত দশজন আউলিয়া কিরামের কারো কারো বাণী উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে কিছু আছে যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক হিসাবে অমর হয়ে রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি বাণী নিম্নরূপঃ

হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেছেন

♦ দিল মরে যাওয়াই দুনিয়ার আজাব। আর দুনিয়ার মহব্বতেই দিল মরে যায়।

♦ সবর দুই প্রকার। ১. বলা-মুসীবতে অধীর না হওয়া

২. নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকা।

---

৫৪ একবার বোস্তাম শহরে এক সুন্দরী বেশ্যা এসে বেশ্যাবৃত্তি শুরু করে। মানুষ সেখানে গিয়ে চরিত্রকে বিনষ্ট করতে লাগল। অবস্থা দেখে বায়েজিদ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বায়েজিদ তার হিদায়াতের আকাঙ্খ নিয়ে বেশ্যালয়ে প্রবেশ করে যাবতীয় ফী পরিশোধ করে বললেন, আজ রাতের জন্য তুমি আমার। আমার কথা শোনা তোমার জন্য জরুরি। তিনি বৈশ্যা মহিলাকে অজু করে দুই রাকাআত নামায পড়ার অনুরোধ জানালেন। মহিলাটি নামাযে দাড়াঁল। বায়েজিদ তখন আল্লহর কাছে দোয়া করলেন। ফলে বেশ্যা মহিলার মন পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে তওবা করে নিকৃষ্ট পেশা ত্যাগ করল এবং ইবাদত করে খাঁটি ওলীয়াতে পরিণত হলো।

দ্র. মাওলান শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২০৮।

৫৫ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

◆ দুনিয়ার স্বল্পকালীন আমল দ্বারা চিরন্তন বেহেশত লাভ করা হয় না বরং ইখলাস ও ঐকান্তিকতার লাভ হয়।

◆ কোন বেগানা নারী রাবিয়া রসরীয়ার মত হলেও তার সাথে নির্জনে বসবে না।

◆ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতার তিলও না থাকার নাম মারিফত।

হযরত ইবরাহীম ইবন আদহাম বলেছেন,

◆ তিন সময় যার অন্তরে একাগ্রতা না হয়, বুঝতে হবে তার জন্য মারেফতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। নামাযে, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে এবং যিকর আযকারে।

হযরত ফুযাইল বিন আইয়ায বলেছেন,

◆ প্রত্যেক বিষয়ের যাকাত আছে। জ্ঞানের যাকাত হলো চিন্তা।

◆ কারো দুনিয়ার মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হলে তার আখিরাতের মর্যাদা কমে যায়।

◆ কারো কাছে কিছু না চাওয়াই পৌরুষ।

◆ অনেক লোক বাথরুম থেকে পবিত্র হয়ে বের হয়। আবার অনেক লোক মক্কা শরীফ থেকে নাপাক হয়ে বের হয়।

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী বলেছেন,

◆ যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পেরেছে সে খোদাকে চিনতে পেরেছে।

◆ যে ব্যক্তি লোভ সংবরণ করতে পেরেছে সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে।

◆ ফিরাউন যদি গরিব হত তাহলে 'আমি বড় খোদা' বলতে পারত না।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. নামাজ শিক্ষা ও জরুরী মাছায়েল

'নামাজ শিক্ষা ও জরুরী মাছায়েল' মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত একটি ফিক্‌হ বিষয়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থ রচনায় তাঁকে সহযোগিতা করেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান।[৫৬] ১২৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ গ্রন্থটি ছালেহিয়া প্রকাশনী, ছারছীনা দরবার শরীফ, দারুছছুন্নাত, নেছারাবাদ, পিরোজপুর কর্তৃক ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পর কয়েক বার গ্রন্থটি পুন:প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পরিবেশায় রয়েছে ছারছীনা দারুছছুন্নাত লাইব্রেরি, পিরোজপুর। গ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় ঈমান ও আকাইদ, দ্বিতীয় অধ্যায় তাহারাত বা পবিত্রতা, তৃতীয় অধ্যায় কতিপয় সূরা ও সেগুলোর বাংলা অনুবাদ, চতুর্থ অধ্যায় দোয়া দরুদ, পঞ্চম অধ্যায় নামাজের ফযীলত এবং ষষ্ঠ অধ্যায় নামাজের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত। বাংলাভাষী সাধারণ মুসলমানদের জন্য গ্রন্থটি একটি মূল্যবান সম্পদ। কেননা দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক বালেগ নর-নারীর জন্য ফরয। তাই নামাজ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। সাধারণ মুসলমানগণ যেন সঠিকভাবে সালাত আদায় করতে পারেন তার সুষ্ঠু সুন্দর সমাধান অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থটি পর্যালোচনা করে আমরা নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাই।

০১

গ্রন্থের লেখক মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলেম হওয়ায় তাঁর গ্রন্থটি আমাদের দেশে বিদ্যমান গ্রন্থাবলির তুলনায় উচ্চমানের এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। গ্রন্থটিকে যদি আমরা একটি সংক্ষিপ্ত আকাঈদ বিষয়ক গ্রন্থ বলি তবে তার বাস্তবতা এতে রয়েছে। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক ইসলামী আকাঈদগুলোকে ঈমান ও ইসলামের মূলপ্রাণ আখ্যায়িত করে এর পরিচয় এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে ঈমান ও আকাঈদের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।[৫৭]

---

৫৬ **মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান :** ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক এবং পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার প্রকাশক।

৫৭ ঈমান হলো ইসলামের সাতটি মূল বিষয় তথা- আল্লাহ, ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত, ভাগ্যের ভাল-মন্দ এবং পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আর আকাঈদ হলো ঈমানের যাবতীয় বিষয়; যেমন জান্নাত, জাহান্নাম কবর আযাব, নবীগণের মুজিযা, ওলীগণের কারামত ইত্যাদি বিষয়কে সত্য বলে জানা।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

এর পরে লেখক ঈমানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। লেখক ঈমানের ৭৭টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিন ভাগ বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে ৩০টি দিল বা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন-১. আল্লাহকে বিশ্বাস করা; ২. আল্লাহ ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছুকে আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করা; ৩. পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা; ৪. কিতাবসমূহকে বরহক ও সত্য বলে জানা; ৫. ফেরেশতাদের বিশ্বাস করা; ৬. তকদীর বিশ্বাস করা; ৭. রোজ কেয়ামতকে বিশ্বাস করা; ৮. আল্লাহর সাথে মহব্বত রাখা; ৯. প্রত্যেক কাজ একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে করা; ১০. খোদাকে ভয় করা; ১১. আল্লাহর রহমতের আশা করা; ১২. অন্যায় কাজে লজ্জাবোধ করা; ১৩. ওয়াদা পালন করা; ১৪. মসীবতে সবর করা; ১৫. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখা; ১৬. আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করা; ১৭. হিংসা-বিদ্বেষ না করা; ১৮. দুনিয়ার প্রতি মহব্বত না রাখা ইত্যাদি।

জাবানের সাথে সম্পৃক্ত সাতটি। তা হল : ১. কালিমা পড়া; ২. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা; ৩. দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া; ৫. দুআ করা; ৬. আল্লাহর জিকর করা; ৭. বেহুদা কথাবার্তা না বলা।

শরীরের সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখা ৪০টি। যেমন- ১. অজু, গোসল, ধোয়া-মোছা ইত্যাদি দ্বারা শরীর, পোষাক ও জায়গা পাক-সাফ রাখা; ২. নামাজ পড়া; ৩. যাকাত দেওয়া; ৪. রোযা রাখা; ৫. হজ্জ করা; ৬. ইতিকাফ করা; ৭. যে স্থানে ঈমান ও ধর্ম রক্ষা হয় না এমন জায়গা থেকে হিজরত করা; ৮. ছতর ঢেকে রাখা; ৯. মাইয়্যেতের দাফন-কাফন করা; ১০. অকপটে সত্য সাক্ষ্য দেওয়া; ১১. বিয়ে করা; ১২. নেক কাজে সহায্য করা; ১৩. সৎপথ দেখানো এবং কুপথ থেকে ফিরিয়ে রাখা; ১৪. হালাল রুজি উপার্জন করা ইত্যাদি। লেখক ঈমানের সাতটি মূল বিষয়কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি কলিমা তারিয়্যা, কালিমা শাহাদাৎ, কালিমা তাওহীদ ও কালিমা তামজীদের পাশাপাশি কালিমা রদ্দে কুফরও উল্লেখ করেছেন। আমাদের দেশে বিদ্যামান পুস্তকসমূহে এমনটি দেখা যায় না। এর পর তিনি এক নজরে আকাঈদের যাবতীয় বিষয়সমূহ বর্ণনা করেছেন। যেমন : ১. আল্লাহ ব্যতীত কেউই গায়েব জানে না, এই বিশ্বস রাখা; ২. হাওজে কাওসার ও নবী করীম (স) এর শাফায়াতে বিশ্বাস করা; ৩. ইমাম মাহদীর আগমনকে বিশ্বাস করা ইত্যাদি।[৫৮]

---

৫৮ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

০২

গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় এটি একটি ফিকহ গ্রন্থ। সালাত আদায়ের যাবতীয় শরয়ী হুকুম-আহকাম এবং এতদসংক্রান্ত খুঁটিনাটি সকল বিধান সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে এ দু'অধ্যায়ে। তাহারাত, ইস্তেনজা, হায়েজ, নিফাস, ইস্তেহাজা, গোসল, ওজু, তায়াম্মুম ইত্যাদি সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়িল কুরআন, হাদীস ও ফিকহ্গ্রন্থের আলোকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'নামাজের বিবরণ' শিরোনামে লেখক পাঁচটি প্রকারের অধীনে সকল নামাজের তালিকা দেখিয়েছেন। যথা : ১. ফরজ : দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত; ২. ওয়াজিব : বিতর ও দুই ঈদের সালাত; ৩. সুন্নাত : ফজরের ফরজের পূর্বে দুই রাকাআত, জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাআত এবং ফরজের পরে দুই রাকাআত, মাগরিবের ফরজের পরে দুই রাকাআত, ঈশার ফরজের পরে দুই রাকাআত, জুমুআর ফরজের পূর্বে ৪ রাকাআত এবং ফরজের পর ৪ রাকাআত এই মোট ২০ রাকয়াত সালাত আদায় করা সুন্নাত। ৪. মুস্তাহাব : তাহাজ্জুদে ১২ রাকাআত, আছরের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাআত, ঈশার ফরজের পূর্বে ৪ রাকাআত, ইশরাকের ৪ রাকাআত, যাওয়ালের ২ রাকাআত, আওয়াবীনের ৬ রাকাআত এই মোট ৩৬ রাকাআত নামাজ মুস্তাহাব। ৫. নফল : উপরিউক্ত নামাজ ব্যতীত অন্য নামাজ নফল।[৫৯] লেখক নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজগুলোকে এবং নামাজ ভঙ্গের কারণগুলো সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি যেসব কারণে নামাজ ভঙ্গ হয় না তাও বর্ণনা করেছেন। তিনি নামাজ মাকরুহ হওয়ার ৭৫টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থটির আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ঃ ঈদের নামাজ, জুমুআর নামাজ, জানাযার নামাজ, কসর নামাজ, কাযা নামাজ, তাহাজ্জুদের নামাজ, তারাবীহ এর নামাজ, চাশতের নামাজ, কুসূফের নামাজ, ইস্তেখারার নামাজ, ইস্তেস্কার নামাজ, শা'বানের চাঁদের নামাজ, শবেবরাতের নামাজ, শবে কদরের নামাজ ইত্যাদি আদায়ের নিয়ম ও এর সকল মাসাইল অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নামাজের মধ্যে পঁচিশ স্থানে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। যথা : ক. পুরুষগণ তাকবীর তাহরীমায় কান বরাবর হাত উঠাবে, পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকেরা কাধ বরাবর হাত উঠাবে। খ. পুরুষেরা হাত আস্তিন থেকে বের করে উত্তোলন করবে, পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকেরা হাত আস্তীতের বাইরে বের করবে না। গ. পুরুষেরা পুরাপুরি ঝুকে রুকু করবে, পক্ষান্তরে স্ত্রী লোকেরা রুকুতে সামান্য বাকবে।

---

৫৯ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২ – ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. পুরুষের জন্য প্রভাতে ফর্সা হলে ফজরের নামাজ পড়া মুস্তাহাব, পক্ষান্তরে স্ত্রীদের জন্য ফর্সা হওয়ার পূর্বে পড়া মুস্তাহাব ইত্যাদি।[৬০]

নামাজ সম্পর্কিত সকল বিধান ও নিয়ম থাকায় গ্রন্থটিকে একটি উন্নতমানের ফিকহগ্রন্থ বলা যেতে পারে।

'নামাজ শিক্ষা ও জরুরী মাছায়েল' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ অধ্যায়ে নামাজের ফজীলত সম্পর্কিত ৫৮টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। সিহাহ সিত্তায় নামাজের ফজীলত সম্পর্কিত যত হাদীস আছে তা এ অধ্যায়ে তুলে ধরার মাধ্যমে প্রতিটি মুসলমানকে সালাত আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সিহাহ সিত্তাহ ছাড়া আল জামে আছছগীর, মুআত্তা ও মুসতাদরিকে হাকিম গ্রন্থের হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থটির পঞ্চম অধ্যায়কে আমরা সালাতের ফজীলত সম্পর্কিত হাদীসের একটি উৎকৃষ্ট সংকলন বলতে পারি। এ অধ্যায়ে উল্লেখিত সালাতের ফজীলত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ :

১. সমস্ত শরীরের মধ্যে মস্তিষ্কের যেমন মর্তবা, ইসলামে সালাতের তেমনি মর্তবা।

২. নামাজ দেলের মধ্যে নূর পয়দা করে।

৩. যে ব্যেক্তি রীতিমত নামাযের রুকু, সিজদা প্রভৃতি কাজের দিকে লক্ষ্য রাখবে তার জন্য জান্নাতের দরজাগুলো খোলা থাকবে এবং জাহান্নাম হারাম হবে।

৪. মানুষের মুমিন হওয়া এবং কাফির হওয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত পরিহার করা।

৫. রুজীর বরকত চাশতের নামাযের মধ্যে।

৬. আল্লাহ তাআলা ঈমান ও নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস পয়দা করেন নি।

লেখক কতিপয় হাদীসকে ব্যাখ্যা করে পাঠকদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন- হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দিবে, আর ওয়াক্ত শেষ হলে তা কাজা করবে তাকেও দোযখের আগুনে এক হোকবা আজাব দেওয়া হবে। এই হোকবার পরিচয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, এক হোকবা হয় ৮০ বছরে। আখিরাতের একদিন হবে দুনিয়ার ১০০ বছরের সমান। এক বছর হবে ৩৬০ দিনে। কাজেই ঐ এক হোকবার পরিমাণ হবে ১ × ৮০ × ৩৬০ × ১০০০ = ২,৮৮,০০,০০০ (দুই কোটি আটাশি লক্ষ বছর)।[৬১]

গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায়ে কতিপয় সূরা ও তার বাংলা উচ্চারণ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে অনেকগুলো দুআ ও মুনাজাত উল্লেখ করা হয়েছে এবং সর্বশেষে জুমুআ ও বিয়ের খুতবাও তুলে ধরা হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ গ্রন্থটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য সহায়ক ও সম্বল হিসেবে যথেষ্ট।

---

৬০ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮ – ১০৯।

৬১ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩ – ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

চার. হাকীকাতুল অছীলাহ

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে 'হাকীকাতুল অছীলাহ' অন্যতম। প্রথমে এ গ্রন্থখানি তিনি উর্দু ভাষায় রচনা করেন। তাঁকে এ গ্রন্থ রচনার কাজে সহযোগিতা করেন মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ সিরাজুল হক সাহেব। পরে শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির সাহেব আবার পুস্তকটিকে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। পুস্তকটি ৬৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ১৯৫৫ সালে ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত লাইব্রেরি কর্তৃক বইটি প্রকাশিত হয়। 'হাকীকাতুল অছীলাহ' একটি ফতোয়ার কিতাব। অছীলাহ[৬২]র মাসআলা নিয়ে আমাদের সমাজে পরস্পর বিরোধী মতামত পাওয়া যায়। লেখক তাওয়াচ্ছুলের পক্ষে। তিনি দলীল-আদিল্লার মাধ্যমে দুআ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অছীলাহ দেওয়ার বৈধতা প্রমাণ করেছেন এ গ্রন্থে। গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে তাঁর যুক্তির দৃঢ়তা এবং গ্রন্থটির সাহিত্যমান স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

০১

গ্রন্থের সূচনাতে লেখক মানুষের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য যে আল্লাহর ইবাদত করা[৬৩] তা কুরআনের দলীল দ্বারা প্রমাণ করতঃ ইবাদাতের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ইবাদাত সঠিক হওয়ার জন্য লেখক কয়েকটি বিষয়ের আবশ্যকতার কথা বলেছেন। তা হলো : ক. আল্লাহপাকের একক প্রভুত্বে বিশ্বাস; খ. নিজের দ্বীনতা, হীনতা ও ক্ষুদ্রতা স্বীকার; গ. শিরক, অহঙ্কার, গৌরব, হিংসা, নির্ভয়তা প্রভৃতি আরগত দোষ দূর করা; ঘ. আল্লাহর মহব্বত ও ভয় নিজের অন্তরে স্থান দেওয়া; ঙ. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাঙ্খা পোষণ করা।[৬৪] আর এ জন্য প্রয়োজন কলবকে পরিশুদ্ধ করা। কেননা পরিশুদ্ধ কলব ব্যতীত যেমন ইবাদাত সঠিকভাবে পালন করা যায় না, তেমনি আখিরাতে বান্দার কোন মুক্তির উপায় নেই। আল্লাহ বলেন

يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم

---

৬২ অভিধানে অছীলাহ (وسيلة) এর কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়।

১. الوسطة বা মাধ্যম। যেমন বলা হয় অমুক ব্যক্তির অছীলায় আমরা এ জিনিসটি লাভ করেছি।
২. القربة নৈকট্য।
৩. জান্নাতে অবস্থিত একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান। যেমন আযানের দোয়ায় আমরা বলি

ات محمد ن الوسيلة والفضيلة

(হে আল্লাহ) আপনি হযরত মুহাম্মদ (স) কে দান করুন সম্মানিত স্থান (অছীলাহ) এবং সুমহান মার্যাদা।
দ্র. ইবনুল মানযূর, লিসানুল আরব, (ইরান : নাশরু আদাবিল হাওয়াতি, ২য় খন্ড, ১৪০৫ হি.), পৃ. ৩১২।
অছীলাহ গ্রহণ করার কাজটিকে আরবীতে التوسل বলা হয়।

৬৩ আল্লাহ বলেন, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
অর্থাৎ, আমি জ্বীন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।
দ্র. আল কুরআন, ৫১ : ৫৬।

৬৪ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, হাকীকাতুল অছীলাহ, (পিরোজপুর: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, ১৯৫৫), পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, সে দিন ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি নির্মল কলব নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে (সে মুক্তি পাবে)।[৬৫] হাদীস শরীফে কলবকেই সকল ভাল ও মন্দ কাজের পরিচালক বলা হয়েছে।[৬৬] কলবকে পরিশুদ্ধ রাখার জন্য সদাসর্বদা আল্লাহর যিকর করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, সকাল-সন্ধ্যা মনের ব্যকুলতা ও ভয়ের সাথে স্পষ্ট ও অস্পষ্টের মাঝামাঝি শব্দে তোমার প্রতিপালকের যিকর করতে থাকে। আর গাফেল হয়ো না।[৬৭] আল্লাহ আরো বলেন, হে ঈমানদারগণ! অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর কর এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ পড়।[৬৮] আল্লাহর যিকর থেকে সামান্য সময়ও গাফেল হওয়া যাবে না। তা হলেই শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়তে হবে।[৬৯] সুতরাং ইবাদাত সঠিক হওয়ার জন্য সর্বদা আল্লাহর যিকর অন্তরে বিদ্যমান থাকা দরকার। পার্থিব জীবনের শত ব্যস্ততার মাঝে সর্বদা আল্লাহর যিকর করা সম্ভব নয়। কেবল তরীকত অনুশীলনের মাধ্যমে অন্তরে আল্লাহর যিকর জারি করা সম্ভব। সে জন্য লেখক ইবাদাত পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য অছীলাহ অবলম্বন করা যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন।

০২

গ্রন্থের মূল অংশে লেখক পাঠক সেজে প্রশ্ন করেন, যিকর ও ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য, অন্তরের ওয়াসওয়াসা দূর হওয়ার জন্য এবং আল্লাহর দিকে একাগ্রতা ও তাওয়াজ্জুহ হাসিলের জন্য আম্বিয়া (আ), আউলিয়া কিরাম ও মাশায়িখগণকে অছীলাহ করা জায়েয কি-না? এরপর তিনি এর দীর্ঘ উত্তর প্রদানের মাধ্যমেই বইটি সমাপ্ত করেন।

---

৬৫ আল কুরআন, ২৬: ৮৮।

৬৬ রাসূল (স) বলেছেন

الا وان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب (رواه البخاري)

৬৭ আল কুরআন, ৭: ২০৫।

৬৮ আল কুরআন, ৩৩: ৪১-৪২।

৬৯ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

الشيطان جاثم علي قلب ابن ادم فاذا ذكر الله خنس واذا غفل وسوس (رواه البخاري)

Dhaka University Institutional Repository

একটি মাত্র প্রশ্নের জবাবে একটি নাতিদীর্ঘ পুস্তক রচনার ফলে লেখকের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রমাণিত হয়। অছীলাহ গ্রহণ করা যে শরীয়তসম্মত তা প্রমাণ করার জন্য লেখক বিভিন্ন গ্রন্থের ৬৪টি দলীল উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি দলীল উদাহরণ স্বরূপ নিচে আলোচনা করা হলো।

মানব সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ তাআলা অছীলাহ এর মাধ্যমে মানুষের দুআ কবুল করে অছীলাহ গ্রহণ করার পদ্ধতি বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আদম (আ) ও হাওয়া (আ) যখন ভুল করে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলেন। আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেন। তারা ভুল বুঝতে পেরে কান্নাকাটি শুরু করলেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁদেরকে কিছু বাণী শিক্ষা দিলেন। তারা সেই বাণীর মাধ্যমে যখন মুনাজাত করলেন আল্লাহ তাআলা উক্ত বাণীর অছীলায় তাদের ক্ষমা করে দেন। পবিত্র কুরআনে সে কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন

فتلقي ادم من ربه كلمات فتاب عليه

অর্থ, অতঃপর আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে কয়েকটি বাণী লাভ করলেন এবং তদ্বারা প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করলেন।[৭০] এখানে দেখা গেল, অছীলাহ ধরার কথা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। অতএব অছীলাহ ধরার বৈধতা কুরআন দ্বারা প্রমণিত।

স্বয়ং মহানবী (স) গরিব মুহাজিরদের অছীলাহ দিয়ে যুদ্ধে জয়ের জন্য দুআ করতেন।[৭১] সুতরাং অছীলাহ গ্রহণ করা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত।

---

৭০ অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে, যে বাক্য দ্বারা আদম (আ) প্রার্থনা করেছিলেন তা হলো

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০২), পৃ. ৫৯।

হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, আদম (আ) প্রার্থনার মধ্যে মহানবী (স) এর অছীলাহ গ্রহণ করেছিলেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لما اقترف ادم الخطيئة قال يا رب بحق محمد لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمدا قال لا نك لما خلقتني بيديك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرايت علي قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تصف الي اسمك الا احب الخلق اليك قال صدقت يادم ولولا محمد ما خلقتك ـ (وراه الحاكم)

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪।

৭১ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে

عن امية بن خالد عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ـ(رواه في شرح السنة)

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স) কে আল্লাহ তাআলা গোটা বিশ্বসৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন।[৭২] জ্বীন ও মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি তাঁরই অছীলায় হয়ে থাকে। সে কারণে সাহাবা কিরাম (রা) কখনো গুনাহ কিংবা অপরাধ করলে মহানবী (স) এর খিদমতে হাজির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, যেন আল্লাহ মহানবী (স) এর অছীলায় তাঁদের ক্ষমা করে দেন। কুরআন মাজীদে সে কথা উল্লেখিত হয়েছে

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروالله واستغفر لهم الرسول لوجدو الله توبا رحيما

অর্থাৎ, তাঁরা যখন স্বীয় নফসের ক্ষতি করে বসে তখন আপনার নিকট এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহর রাসূলও তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এতে তাঁরা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও দয়াশীল পান।[৭৩] সাহাবা কিরাম অনাবৃষ্টি দেখা দিলে মহানবী (স) কে অছীলা দিয়ে দুআ করতেন। ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হত।[৭৪] এ থেকে বুঝা যায় যে, অছীলা গ্রহণ করা সাহাবা কিরামের (রা) ও কাজ এবং তাঁদের সুন্নত।

আবু হানিফা (রহ.) হলেন বিশ্বের সর্ববৃহৎ মাযহাবের ইমাম। তিনি একটি কাসিদা রচনা করেছেন; যাতে অনেক কয়েকজন বিখ্যাত নবী আমাদের প্রিয় নবী (স) এর অছীলায় নাজাত পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।[৭৫] একজন মাযাহাবের ইমাম যেখানে অছীলার কথা বলেছেন, সুতরাং অছীলাহ গ্রহণ করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

---

৭২. আল্লাহ বলেন, وما ارسلناك الارحمة للعالمين

অর্থ, আমি আপনাকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।

দ্র. আল কুরআন, ২১:১০৭।

৭৩ আল কুরআন, ৪: ৬৪।

৭৪ হাদীস শরীফে আছে

عن انس ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه كان اذا اقحطوا استسقي بالعباس رضي الله تعالي عنه قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك صلي الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون (رواه البخاري)

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৭৫. ইমাম আবু হানিফার কাসীদাটি হলো

انت الذي لولاك ما خلق امرأ * كلا ولا خلق الوري لولاك

হে রাসূল! (স) আপনি এমন গুণাধার যে আপনি না হলে আল্লাহ কোন মানুষ বা সৃষ্টকে সৃষ্টি করতেন না।

انت الذي لما توسل ادم * من زلة بك فازو هو اباك

আপনারই পিতা হযরত আদম (আ) ভ্রমে পতিত হওয়ার পর আপনারই অছীলা দিয়া ক্ষমা প্রাপ্তিতে কৃতকার্য হয়েছে।

وبك الخليل دعا فصارت ناره * بردا وقد خمدت بنور سناك

ইবরাহীম (আ) নমরূদ কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হলে আপনারই অছীলা দেয়াতে ঐ অগ্নি ঠান্ডা হয়ে নূরে পরিবর্তিত হয়েছে।

ودعاك ايوب لضر مسه * فازيل عنه الضر حين دعاك

আয়্যুব (আ) যখন রোগে পতিত হলেন তখন আপনাকেই ডাকলেন, আপনাকে ডাকার কারণেই আল্লাহ তাঁকে রোগ মুক্তি দিলেন।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

কেবল রাসূলকেই (স) নয়, সাহাবা কিরাম (রা) ও আউলিয়াগণকে অছীলা ধরা জায়েয হওয়ার অসংখ্য দলীল রয়েছে। লেখক প্রতিটি ব্যাপারে কুরআন, হাদীস, তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যাকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।[৭৬]

লেখক দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, হাক্কানী উলামা কিরাম ও তরীকতের মাশায়েখগণ (পীরগণকে) অছীলা হিসাবে গ্রহণ করা মুস্তাহাব।[৭৭]

লেখক সকল ধরনের অছীলাহ গ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করার জন্য তাফসীরে রুহুল বয়ান, তাফসীরে রহুল মাআনী, খুলাসাতুত্ তাফাসীর, তাফসীরে হক্কানী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কবীর প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থ; বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত, নাসাঈ, ইবন মাযাহ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ; মিরকার, আইনী, নুযহাতুন নযর, ফাতহুল বারী ইত্যাদি হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং হিসনুল হাসীন, হিরকুল আসীন, মারাকিউল ফালাহ, আল মাদখাল, ফতোয়ায়ে শামী, আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার, শরহু মিনহাজ, আল মুহাম্মদ, উকূদুয যামান ফী মানাকিবি আবী হানীফা আল নুমান, নাফ্তাহুল কুরব ওয়াল ইত্তিসাল, দুররুল মুখতার, নাইলুশ শিফা বি না'লি মুস্তাফা (স), ফতহুল মুতাআল ফী মাদহি খায়রিন্নিয়াল, মাকতুবাতে মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী, মাকামাতে ইমাম রব্বানী ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়া ও তাসাউফের গ্রন্থাবলির উদ্বৃতি দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। ফলে 'হাকীকাতুল অছীলাহ' গ্রন্থটি যেমন উছমানের ফতোয়া গ্রন্থে পরিণত হয়েছে, তেমনি আরবি ও বাংলা মিলে রচিত হওয়ায় এটি আরবি ও ইসলামী সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে।

---

৭৬ আল্লাহ তায়ালা বলেন, لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض

দ্র. আল-কুরআন, ২: ২৫১।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা কতিপয় লোকের অছীলাহ অন্য লোকদেরকে রক্ষা করেন। আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবন কাসীরে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে

قال ابن جرير حدثني ابو حميد الحمصي عن ابن عمرو رضي الله تعالي عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مأة اهل بيت من جيرانه البلاء ثم قرأ ابن عمرو ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض

দ্র. মাওলনা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

عن ابي الدرداء عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ابغوني في ضعفائكم فانما ترزقون اوتنصرون بضعفائكم (رواه ابو داؤد)

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির , প্রাগুক্ত, পৃ.২০।

عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالي عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الابدال بامتي ثلاثون بهم ترزقون وبهم تمطرون و بهم تنصرون

অর্থাৎ, হযরত উবাদা ইবন সাবিত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন আবদাল আছে। তাদের অছীলায় তোমাদেরকে রিযক ও বৃষ্টি দেওয়া হয় এবং সাহায্য করা হয়।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৭৭. তাফসীরে রুহুল বয়ান এর প্রথম খন্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে

واعلم ان الاية الكريمة (ابتغوا اليه الوسيلة) صرحت بالامر بابتغاء الوسيلة و لا بد منها البتة فان الوصول الي الله تعالي لا يحصل الا بالوسيلة وهي العلماء الحقّنية والمشائخ الطريقية

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

খুলাসাতুত তাফাসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, ছুফিয়ায়ে কিরাম এই আয়াত ধরে প্রমাণ করেছেন যে, অছীলাহ দ্বারা কামেল শায়খ (পীর) কে বুঝানো হয়েছে। যারা আসমানী ইলম ও রুহানী হিকমত শিক্ষা দেন। তাদের সোহবতের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

দ্র. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

লেখক ছিলেন একজন তরীকতপন্থী আলেম। তিনি ছারছীনা শরীফের দাদা হুজুর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) এর খলীফা ছিলেন। তরীকতপন্থীরা দুনিয়াবী ঝামেলা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন এবং আত্মার উন্নতির জন্য যিকর, আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা ইত্যাদিতে নিমগ্ন থাকতে পছন্দ করেন। আত্মার উন্নতির জন্য যে কোন হক্কানী ওলীর সোহবাত ও বায়আত গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু কতিপয় লোক পীর-মুরীদী, বায়আত গ্রহণ এবং অছীলা ধরাকে ইসলামবিরোধী কাজ এমনকি শিরক বলে অপপ্রচার করেন। লেখক তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করা এবং অছীলা ধরার উপকারিতা বর্ণনা করার জন্য এ গ্রন্থখানি বাংলার সাধারণ মুসলমানদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থের শুরুতে 'তাকরীয' শিরোনামে ছারছীনা শরীফের মরহুম পীর মাওলানা শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ লিখেছেন, "কিতাবখানি দ্বারা তাওয়াচ্ছুল বা অছীলা ধরার মাসআলাটি বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিরুদ্ধবাদী আলেমদের ভুল প্রচারণার ফলে যদি কোন সরল-প্রাণ মুসলমান বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, আশা করি সে এ কিতাব দেখে সঠিক মাসআলা বুঝতে পারবেন।"[৭৮] তিনি (পীর সাহেব) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ) এর 'আল কাউলুল জামীল' গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে লিখেন, মুহাব্বত ও তা'যীম সহকারে পীরের সঙ্গে নিজ কলবের সম্বন্ধ লাগানো তরীকায় সর্বপ্রধান রোকন। আল্লাহপাক বিরুদ্ধবাদীদের ভুল ধারণা দূর করে তাদেরকে তরীকার ও তাওয়াচ্ছুলের অপরিহার্যতা এবং বরকত বুঝার তাওফীক দান করুন। যারা পীর-মুরীদী ও তায়াচ্ছুলকে নাজায়েয বলেন তাদের অবগতির জন্য লেখক বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় পীর-মাশায়েখ ও সূফীদের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে "প্রকৃত পক্ষে ওলী-আওয়ালিয়াগণই বাংলাদেশে ইসলামী সভ্যতা ও মুসলিম সভ্যতার পতাকাবাহী। পীর দরবেশগণ ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরব ও মধ্য এশিয়ার দূর-দুরান্ত থেকে বাংলায় আগমন করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে এদেশের মানুষকে ইসলাম ও ইসলামী তাহযীব-তমুদ্দুন শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা একেক জন একেক অঞ্চলে এসে দ্বীনী দাওয়াত ও তাবলীগ শুরু করেন। তাঁদের সহজ-সরল জীবনযাপন, নিষ্ঠা, সাধুতা ও অমায়িক ব্যবহারে শান্তি কামী মানুষের হৃদয়ে রেখাপাত করে। ফলে তাদের সংস্পর্শে এসে মানুষেরা সহজেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সত্যিকারে খাঁটি দীনদারে পরিণত হন। উপমহাদেশে ইসলামের খিদমতে আউলিয়া কিরামের অবদান বিস্ময়কর। সুতরাং তাদের কর্মপন্থাকে অন্যায় ও ইসলামবিরোধী বলা ন্যায়সঙ্গত নয়।"

---

৭৮. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

লেখক আউলিয়া কিরামের নির্দেশিত পথে মুসলমানদেরকে অটল রাখার জন্য অহীলাহর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন 'হাকীকাতুল অহীলাহ' গ্রন্থে। গ্রন্থটি রচনার পর তার সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলিমগণ পড়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন এবং তাঁর ফতোয়াকে সঠিক বলে স্বীকার করে স্বাক্ষর করেছেন। ছারছীনার পীর মাওলানা শাহ্ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ, ঢাকা আলিয়া মদরাসার প্রধান মুফতী মাওলানা সাইয়েদ আমীমুল ইহসান, খুলনার পীর মাওলানা আবদুল লফিত, ছারছীনার প্রধান মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়াজ মাখদূম তুর্কিস্তানী, ছারছীনার অধ্যক্ষ মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন, ছারছীনার মুহাদ্দিস মাওলানা আহমাদুল্লাহ, মাওলানা আবদুস সাত্তার বিহারী, মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস সহ ২৫ জন দেশবরেণ্য আলেম এ ফতোয়ার কিতাবে স্বাক্ষর করেন।[৭৯] শরীফ সাহেবের উস্তায ঢাকা আলিয়া মাদরাসার তৎকালীন প্রধান মুফতী এবং বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের তৎকালীন খতীব মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান লিখেছেন, "ছারছীনা থেকে প্রকাশিত তাওয়াচ্ছুল সম্পর্কিত ফতোয়াখানি দেখলাম। তাওয়াচ্ছুল জায়েয হওয়ার কথা এবং এর তরীকা প্রত্যেক ধর্মভীরু লোকের নিকট জ্ঞাত। এরূপ অহীলা ধরা আম্বিয়া ও মুরছালীনের আমল এবং ছলফে সালেহীন, উলামা ও মুসলিম জনসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এর বিরোধিতা করার কথা আগে কখনো শুনি নি। ইদানীং কিছু লোকের মুখে এর বিরোধিতার কথা শোনা যায়। অহীলা ধরার কারণ যখন আল্লাহর নৈকট্য লাভ, তাঁর দয়া ও মুহব্বত অর্জন তখন তা না জায়েয হওয়ার কারণ থাকতে পারে না। লেখক কুরআন, হাদীস ও ফতোয়ার কিতাবের দলীল দ্বারা তাওয়াচ্ছুল জায়েয হওয়ার যে ফতোয়া পেশ করেছেন তা অত্যন্ত উচ্চ মানের এবং সুদৃঢ়।"[৮০]

"ফুরফুরার তৎকালীন পীর মাওলানা মুহাম্মদ আবু জাফর লিখেছেন, আমি বুযুর্গানে দীনের অহীলা ধরা জায়েয প্রমাণকারী ফতোয়ার কিতাবখানি প্রাপ্ত হয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি। মাশাআল্লাহ উত্তর প্রদানকারী তার কথাগুলি যেভাবে দলীল প্রমাণ দ্বারা সাজিয়েছেন তাতে কিতাবখানাকে একটি জ্ঞানভান্ডার বলা চলে।"[৮১]

---

৭৯. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬।

৮০. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪।

৮১. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুফতী দীন মুহাম্মাদ খান লিখেছেন, "আমি কিতাবখানা অদ্যোপান্ত দেখলাম। আলহামদুলিল্লাহ দলীল শক্তিশালী ও মজবুত হয়েছে।"[৮২]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল যে, শরীফ সাহেব রচিত 'হাকীকাতুল অহীলাহ' গ্রন্থটি আমাদের ইসলামী তামাদ্দুনী স্বকীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামি সাহিত্যের একটি অমূল্য রর।

---

৮২. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. নারী জীবনের আদর্শ

'নারী জীবনের আদর্শ' মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত একটি গল্প গ্রন্থ। ১৪৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ গ্রন্থটি ১৯৬৩ সালে শরীফ পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রথম এবং সর্বশেষ ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে একই পাবলিকেশন্স কর্তৃক পরিবর্ধিত কলেবরে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের প্রকাশক হলেন শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাউয়ূম, শরীফ মুহাম্মদ নূর এবং শরীফ মুহাম্মদ মুনীর। গ্রন্থটির পরিবেশনায় রয়েছেন ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, পিরোজপুর; আব্বাসিয়া লাইব্রেরি, ৬৫ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১ এবং রশীদ বুক হাউজ, ৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১।

লেখক জাতি গঠনের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে 'সিলসিলা-ই-তরবিয়াত' নামক সিরিজ লেখায় ব্রতী হন। সিলসিলা-ই-তরবিয়াত সিরিজের প্রথম পুস্তকের নাম 'জীবনের আদর্শ'। 'নারী জীবনের আদর্শ' উক্ত সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ। গ্রন্থটি বিশেষভাবে নারীদের জন্য লিখিত। চরিত্রবান ও আদর্শ নারী সমাজ গঠন এর মূল উদ্দেশ্য। লেখকের মতে, সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা পুরুষের তুলনায় কম নয়। নারীরা মায়ের জাতি। তারা যদি উত্তম আদর্শের ধারক-বাহক হন, তাহলে তাদের সন্তানরাও হবে চরিত্রবান। গ্রন্থের সূচনাতে লেখক 'দু'টিকথা' শিরোনামে লিখেছেন, "যে মেয়েটি আজ বালিকা, কিছুদিন পর সেই হবে মা। জাতির সৌন্দর্য ও গৌরব সৃষ্টি করার সুমহান দায়িত্ব অর্পিত হবে তার কোমল স্কন্ধে। এহেন মা যদি আদর্শহীনা হয় তবে তার সন্তানও হবে আদর্শহীন। পক্ষান্তরে মা যদি আদর্শবতী হন তবেই সে গড়তে পারবে আদর্শ সন্তান তথা খাঁটি সমাজ। তাই আজ সমাজের ভবিষ্যত মাতাগণকে আদর্শবতী করে গড়ে তোলার জন্য পুণ্যময়ী নারীগণের জীবনাদর্শ বালিকাদের সামনে তুলে ধরার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।"[৮৩]

নিম্নে গ্রন্থটি সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো ঃ

০১

'নারী জীবনের আদর্শ' গ্রন্থে ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত মহিয়সী, বিদূষী, ধর্মপরায়ণা, দানশীলা ও ওলীয়া নারীদের ৫৮টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ঘটনাগুলো আমাদের নারী সমাজের জন্য আদর্শ স্বরূপ। যেমন- 'হযরত আয়েশা (রা) এর দানপ্রিয়তা।' রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রিয়তমা পত্নী হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন সুন্দরী, বিদূষী, ধর্মপরায়ণা ও দানশীলা। আমীরে মুআবিয়া, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা) প্রমুখ শাসনকর্তা গনীমতের অনেক সম্পদ তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। ধন-দৌলতের প্রতি আয়েশা (রা) এর কোন লোভ ছিল না।

---

৮৩ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, নারী জীবনের আদর্শ (বাকেরগঞ্জ : শরীফ পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ১৯৭৯, তৃতীয় সংস্করণ), ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা নম্বর বিহীন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সমস্ত সম্পদ দান করে ফেলতেন। উরওয়া (রা) বলেন, "আমি একবার হযরত আয়েশা (রা) কে সত্তর হাজার দিরহাম দান করতে দেখলাম, অথচ তাঁর নিজের জামা ছিল তালি লাগানো। তিনি নিজের জন্য কোন জামা কিনলেন না।"[৮৪] একদিন তিনি ছিলেন রোযাদার। এমন সময় তাঁর খিদমতে হাদিয়া এল লক্ষাধিক দিরহাম। তিনি দ্রুততার সাথে পাত্র ভরে ভরে সন্ধ্যার পূর্বেই দিরহামগুলো দান করে দিলেন। যখন ইফতারের সময় হলো তখন তাঁর ইফতারের জন্য একটি রুটি ও সামান্য যইতুন তৈল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এ ঘটনাটি লেখক তাবাকাত গ্রন্থ থেকে সংকলন করেছেন।

'হযরত যয়নবের (রা) অর্থ-বিরাগ' শিরোনামে লেখক উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহুশ (রা) এর তাকওয়া ও দানশীলতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কিত একটি ঘটনা হলো : মহানবী (স) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার ইনতিকালের পর কে সর্বপ্রথম আপনার সাথে মিলিত হবে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যার হাত অত্যধিক লম্বা সে-ই সর্বাগ্রে আমার সাথে মিলিত হবে। একথা শুনে মহানবী (স) এর বিবিগণ একের সঙ্গে অপরে হাত মাপামাপি শুরু করলেন। কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। রাসূল (স) 'হাত লম্বা' বলতে বেশি দানশীলতাকে বুঝিয়েছেন। হযরত যয়নব বিনতে জাহুশ (রা) ছিলেন সর্বাধিক দানশীলা নারী। এ জন্য তাঁকে 'মা'ওয়াল মাসাকীন' বা কাঙ্গালদের আশ্রয়স্থল বলা হয়। মহানবী (স) এর ইনতিকালের পর উম্মুল মুমিনীনদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা প্রদান করা হত। হযরত উমরের (রা) লিখাফত কালে হযরত যয়নবের (রা) বার্ষিক ভাতা ১২ হাজার দিরহাম নির্ধারণ করা হয়। তিনি যখনই ভাতা পেতেন সাথে সাথে সব গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। একবার তিনি অর্থ লাভ করেই বিতরণ শুরু করলে আশেপাশের লোকেরা বলতে শুরু করলেন, এগুলো বিতরণের জন্য নয়, আপনার খরচের জন্য। তিনি তাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বিতরণ কাজ চালিয়ে গেলেন। এমনকি দিরহামগুলো যেন চোখে না পড়ে সে জন্য নিজের মুখমন্ডল কাপড় দ্বারা বেঁধে নিলেন। তিনি দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আগামী বছর যেন এ ধরণের অর্থ না আসে। কারণ এতে বড় হয়রানি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দুআ কবুল করেছেন। পরবর্তী বছর আসার আগেই তিনি ইনতিকাল করেন। রাসূল (স) ইনতিকালের পর তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে হযরত যয়নবই (রা) সর্বপ্রথম ইনতিকাল করে তাঁর সাথে মিলিত হন।[৮৫]

---

৮৪ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১ – ২।
৮৫ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০ – ১১।

Dhaka University Institutional Repository

'শান্তি কোথায়' শিরোনামে লেখক মহানবী (স) এর প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমা (রা) এর একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ফাতিমা (রা) সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মহানবী (স) এর কন্যা হয়েও নিজ হাতে যাঁতা ঘুরিয়ে আটা পিষতেন। এতে তাঁর হাতে দাগ পড়ে যেত। মশক ভরে পানি আনার ফলে তাঁর সীনায় রশির দাগ পড়ে গিয়েছিল। ঘরের যাবতীয় কাজ করতে গিয়ে তার শরীর ও পোষাক ধূসরিত হত। একবার রাসূলের (স) খিদমতে কিছু দাস-দাসী এলে হযরত ফাতিমা (রা) এর স্বামী হযরত আলী ফাতিমা (রা) কে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট গিয়ে একটি দাসী চেয়ে আন না কেন? এতে তোমার কাজের কিছুটা সাহায্য হবে। ফাতিমা (রা) মহানবী (স) এর নিকট গেলেন। কিন্তু লোকজনের ভীড়ের কারণে লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না। ফিরে এলেন তিনি। পরের দিন রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই হযরত ফাতিমা (রা) এর ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, গতকাল তুমি কেন গিয়েছিলে? ফাতিমা (রা) লজ্জায় কিছুই বলতে পারলেন না। হযরত আলী (রা) তাঁর পক্ষ থেকে একজন দাসীর জন্য আবেদন জানালেন। তখন রাসূল (স) ফাতিমা (রা) কে বললেন, তাকওয়া অবলম্বন কর, প্রতিপালকের হক আদায় কর, ঘরের কাজকর্ম নিজ হাতেই আঞ্জাম দিতে থাক এবং শোয়ার আগে ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করতে থাক। এর মূল্য দাসীর চেয়ে অনেক বেশি। একথা শোনার পর ফাতিমা (রা) বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগতা। তাঁদের হুকুম পালন করেই চলব। এ ঘটনাটি লেখক আবু দাউদ থেকে সংকলন করেছেন।[৮৬]

'যুবাইদা খাতুনের অক্ষয় কীর্তি' শিরোনামে লেখক খলিফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী যুবাইদা খাতুনের সমাজসেবার কাহিনী তুলে ধরেছেন। যুবাইদা খাতুন রাজ দরবারে থেকেও আল্লাহকে ভুলে যান নি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দীনদার ও মুত্তাকী। তাঁর প্রাসাদে একশত জন হাফিযে কুরআন মহিলা থাকতেন। তাঁরা প্রত্যেকে তাঁকে প্রতিদিন দশ পারা করে একশত খতম করে কুরআন তিলাওয়াত শুনাতেন। সমাজসেবায় তিনি যে অবদান রেখে গেছেন ইতিহাসের পাতায় তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। হজ্জের পথে তিনি মনযিলে মনযিলে দানশীলতার পরিচয় রেখে গেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে, ঐ সময় তিনি ১৭ লক্ষ দিনার খয়রাতী বিভাগে দান করেন। হাজীগণের উপকারার্থে তিনি বহু কূপ খনন করেন এবং অনেক সরাইখানা নির্মাণ করেন। সে সময় মক্কা শরীফে পানির খুব অভাব ছিল। এই অভাব দূরীকরণার্থে যুবাইদা পাথরী যমীনের মধ্য দিয়ে একটি সুদীর্ঘ খাল খনন করেন। খালের পানি যেন চুষে নিঃশেষে হয়ে না যায় সে জন্য তিনি খালের নিচ পাকা করে দেন। খনন কার্যের শুরুতে প্রকৌশলীরা বলেছিল-এই কাজে অগণিত অর্থ ব্যয় হবে।

---

৮৬ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭ – ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরে তিনি বললেন, কোন চিন্তা করো না। এক এক কোদাল মাটি উঠাতে যদি এক আশরাফীও ব্যয় হয় তবুও আমি সে খরচ বহন করব। এক কোটি সাত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে কারা পাহাড় থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত ১১ মাইল দীর্ঘ একটি খাল তিনি খনন করেন। এর নাম নহর-ই-যুবাইদা। খাল খনন সমাপনান্তে প্রকৌশলীগণ একটি বিরাট হিসাব তৈরী করে বেগমের কাছে পেশ করলে তিনি তা তাইগ্রিস নদীতে নিক্ষেপ করে বলেন, আমি যেই অর্থ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছি তার হিসাব দিয়ে কি করব? যদি তোমাদের আরো পাওনা থাকে, আমা হতে তা নিয়ে নাও। আর যদি আমার পাওনা থাকে তা মাফ করে দেওয়া হলো।[৮৭]

লেখক তাঁর মায়ের ত্যাগ-তিতীক্ষার কথা এমনভাবে তুলে ধরেছেন যাতে তিনি মহিলা সাহাবী ও মনীষীদের সব কাহিনী উল্লেখ করেছেন সেগুলোর সাথে তার মায়ের কাহিনী সামঞ্জস্যশীল হয়েছে। 'ফখরুন্নিসা' শিরোনামে লেখক তুলে ধরেছেন, কিভাবে তাঁর মা স্বামীহারা হওয়ার পরও তাকে ছোট্ট থেকে লালন-পালন করে একজন বিশ্ববিখ্যাত আলেম হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "ফখরুন্নিসার জীবনের প্রধান সাধনা পুত্রটিকে আলেম হিসেবে মানুষ করা। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্রকে আলেম করার জন্য বিদেশে প্রেরণ করলেন। কথাটি সহজ নয়। বিধবা হয়ে একমাত্র পুত্র একান্ত বালকটিকে কোলছাড়া করে বিদেশে পাঠানোর নজীর খুব কমই পাওয়া যায়। তার এই কঠিন ত্যাগ সত্যই হযরত বড় পীর সাহেবের মায়ের উদাহরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে ফখরুন্নিসা পুত্রকে তার কাম্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে আলেম করে বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন।[৮৮]

লেখক যেমন 'শরীফ' তেমনি তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীও গুণবতী ও পুণ্যময়ী 'শরীফা'। লেখকের প্রথমা স্ত্রীর ইনতিকালের পর মাজেদা খাতুন নামক এক ষোড়শী নারীকে বিয়ে করেন। মাজেদা খাতুন শরীফ সাহেবের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের শিশুপুত্র শরীফ আব্দুল কাইয়ূমকে এবং শরীফ আব্দুল মাবুদকে নিজের আপন পুত্রের চেয়েও বেশি আদর-সোহাগে যেভাবে লালন-পালন করে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন সেই কাহিনী এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত কাহিনী বাংলাভাষী মুসলিম নারীদের জন্য আদর্শ হয়ে আছে। 'একখানি চিঠি' শিরোনামে লেখক তাঁর স্ত্রীর প্রথম চিঠিটিকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

---

৮৬ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০ – ৪১।
৮৮ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯ – ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

মাজেদা খাতুন শিশুপুত্রকে লালন-পালনের ভার গ্রহণের কথা জানিয়ে স্বামীকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তার কিয়দাংশ নিম্নরূপ ঃ

পালিত বলিয়া অপর পাখির নীড়ে
পিকের কণ্ঠে এত গান ফোটে কিরে
মেঘ-শিশু ছাড়ি সাগর মাতার নীড়
উড়ে যায় হায় দূর হিমাদ্রির শির
তাই কি সে নামি বর্ষা ধারার রূপে
ফুলের ফসল ফলায় মাটির স্তূপে।

আমি জানি, আমি নারী। স্বামীর সেবা, সন্তান প্রতিপালন ও তাদের তরবিয়াত দানের মহান কর্তব্য নিয়েই নারীর জীবন। ইনশা আল্লাহ, সেই কর্তব্য সমাধা করতে পারব সেই মনোবল আমার আছে। আমিও মাত্র এক বছর বয়সে মাতৃহারা হয়ে দ্বিতীয়া মাতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছেছি। সত্য জানবেন, দ্বিতীয়া মাতার আদর-যত্নে মাতৃহীনতার কোন দুঃখই আমাকে স্পর্শ করে নি। আমি কি আমার বর্তমান স্নেহময়ী মার কাছে কিছুই শিখি নি? আপনি ওদেরকে আমার ছেলে করে দিন আর আল্লাহর কাছে দুআ করুন, আমি যেন মাতৃহারা বালকদের মনের মত মা হতে পারি। ওদের মার রূহ যেন বলে ওঠে-

আমি ধরেছিনু গর্ভে তুমি যে ধরি বুকে
করেছ পালন, মোরা দুই বোন সেই সুখে।[৮৯]

উপরিউল্লিখিত কাহিনীগুলো পড়লে অভিভূত হতে হয়। আমাদের নারী সমাজ এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারেন।

০২

'নারী জীবনের আদর্শ' গ্রন্থের রচনাশৈলী উন্নত। এর ভাব ও ভাষা মাধুর্যমন্ডিত। এর সাহিত্যমান প্রশংসনীয়। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি আকর্ষণীয়। গ্রন্থটি কেবল সুখপাঠ্যই নয় বরং এর প্রতিটি কাহিনী বাস্তব এবং অনুকরণীয়। লেখক প্রতিটি গল্পকে একেকটি আলাদা শিরোনামে বিভক্ত করেছেন। যার প্রতিটি শিরোনাম সুন্দর এবং আকর্ষণ সৃষ্টিকারী। যেমন কয়েকটি গল্পের শিরোনাম : কারামতী বকরী, শান্তি কোথায়, প্রেমিকার চাবুক, ইসলামের মুকাবিলায় পুত্রের মূল্য, কাঙ্গালিনী রাজকন্যা, মহারানার দাবী, সাওয়াব রেসানী, বাপ-কী বেটী, রণরঙ্গিনী নাসীবা, একখানি চিঠি, দানের মহিমা, মাতৃত্বের পুরস্কার, উন্মুক্ত কেশদাম, মজার লড়াই, ভাগ্যবান মালিক মুজাফফর, নির্লজ্জতার পরিণাম, তোমরা তো আর অন্ধ নও, উম্মে মুজাহিদের বদান্যতা ইত্যাদি।

---

৮৯ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২ – ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

লেখক কাহিনীগুলোকে বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সংকলন করেছেন। অধিকাংশ কাহিনীর শেষে এর সূত্র[৯০] উল্লেখ করেছেন। যেমন : উম্মে হারমের উচ্চাকাঙ্খা গল্পটির সূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বুখারী শরীফ, হযরত আয়েশার (রা) দানপ্রিয়তার গল্পের সূত্র তাবাকাত, হযরত উম্মে হাবীবার (রা) রাসূলপ্রীতি গল্পের সূত্র হিকায়াতে সাহাবা, ইসলামের মুকাবালায় পুত্রের মূল্য গল্পের সূত্র উসদুল গাবা, শান্তি কোথায় গল্পের সূত্র আবূ দাউদ, কুরআনের উপর হযরত রাবিআর অধিকার গল্পের সূত্র আরিফাত, হুজুর (স) এর নিকট হযরত আসমা (রা) এর দাবী গল্পের সূত্র বেহেশতী হূরে, যুবাইদা খাতুনের অক্ষয়কীর্তি গল্পের সূত্র খুবানে জাহাঁ, হযরত উমরের পুত্রবধু গল্পের সূত্র রিওয়ায়াত ও হিকায়াত, উম্মে সুলাইমের বিবাহ গল্পের সূত্র আলমার্আ, ভাগ্যবান মালিক মুযাফফর গল্পের সূত্র উসতাযুল মারআ, হযরত আসমার উপস্থিত বুদ্ধি গল্পের সূত্র আখবারুয্ যার্রাফ, মজার লড়াই গল্পের সূত্র ওয়াকেদী, যুবাইদা খাতুনের পর্দা-পুশিদা গল্পের সূত্র আহসানুল হিকায়াত, বীরবালা হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ গল্পের সূত্র বা-কামাল মুসলমান আওরাত, অমর বালিকা ফাতিমা বিনতে আবদুল্লাহ গল্পের সূত্র খাওয়াতীনে ইসলাম ইত্যাদি। লেখক আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় রচিত প্রায় চল্লিশখানা বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ থেকে গল্প সংগ্রহ করে এ গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। ফলে গ্রন্থখানি সন্দেহাতীতভাবে নির্ভরযোগ্য। এ কারণে এ গ্রন্থটির প্রতি পাঠকের আস্থা বেশি। উন্নতমানের সাহিত্য হওয়ার জন্য উক্ত সাহিত্যের প্রতি পাঠকের আস্থা থাকা একটি অন্যতম শর্ত। 'নারী জীবনের আদর্শ' গ্রন্থে সে শর্ত পূরণ হয়েছে বিধায় একে আমরা সাহিত্য বিচারে মানসম্পন্ন বলতে পারি।

---

৯০ 'সূত্র' বলতে সেই গ্রন্থকে বুঝানো হয়েছে, যে গ্রন্থ থেকে গল্পটি সংকলন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. না'লায়েন শরীফের ফযীলত

'না'লায়েন শরীফের ফযীলত' মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত একটি ছোট পুস্তিকা। মাত্র ১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ পুস্তিকাটি ছারছীনা প্রকাশনী, ৫৮/১০ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক ১৯৬০ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ সনে এর দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৯৯৮ সনে একই প্রকাশনী থেকে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও এর আবেদন সুদূর প্রসারী। গ্রন্থটি প্রিয় নবীজী (স) এর জুতা মুবারকের পরিচিতি, নকশা ও এর ফযীলত নিয়ে রচিত। না'লায়েন শরীফ মানে রাসূলুল্লাহ (স) এর জুতা মুবারক। প্রিয় নবীজী (স) এর সবকিছুই মুমিনদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়।[৯১] তাঁর ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ন্যায় জিনিসপত্র ব্যবহার করা সুন্নত। হযরত রাসূলে আকরাম (স) এর জামা, টুপি, জুতা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগতি লাভ করার আকাঙ্খা অধিকাংশ মুমিনের অন্তরে বিদ্যমান। সেই আকাঙ্খা পূরণের জন্য শরীফ সাহেব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে আকর্ষণীয় ভাষায় না'লায়েন শরীফের পরিচিতি ও ফযীলত তুলে ধরেছেন এবং না'লায়েন শরীফের নকশা পেশ করেছেন। গ্রন্থের শুরুতে 'নিবেদন' শিরোনামে প্রিয় নবী (স) কে 'কাণ্ডান' আখ্যায়িত করে তাঁর সাথে লেখক আপন কিশতিকে বেঁধে প্রেমাস্পদের দিকে অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন।[৯২] আর তারই সাথে সাথে প্রিয় নবী (স) এর কদম মুবারককে ধারণকারী জুতা মুবারকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরম প্রশান্তি লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে না'লায়েন শরীফের নকশা উপস্থাপন করার কাজে আরনিয়োগ করেছেন। এর মাধ্যমে লেখক নাজাতের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।[৯৩] আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আপনি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আমি তাদেরকে শাস্তি দিব না। এ আয়াত থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, প্রিয় নবী (স) এর আদর্শ ও তাঁর সুন্নত ধারণকারীদের আল্লাহ তাআলা শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন।

---

৯১ আল্লাহর বলেন النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم
অর্থ : নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের (জীবন) অপেক্ষা অধিক পিয়।
দ্র. আল কুরআন, ৩৩:৬।

৯২ লেখক উল্লেখ করেছেন " আমার কিশতি যদি সনদপ্রাপ্ত কাণ্ডান কর্তৃক পবিচালিত জাহাজের সঙ্গে বেঁধে দিতে পারি তবে খোদার মেহেরবানীতে তা পাড়ি দিয়ে অপরূপ সুন্দর ও সুখময় 'প্রিয়-মিলন' দেশের কিনারায় গিয়ে লাগবেই।
দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, না'লায়েল শরীফের ফযীলত, (ঢাকা: ছারছীনা প্রকাশনী,১৯৯৮ইং), পৃ. ৩।

৯৩ আল্লাহ বলেন وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم
দ্র. আল কুরআন, ৮:৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি তাঁর জুতা মুবারকের নকশা সংরক্ষণকারীগণও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার আশা করতে পারেন।[৯৪]

রাসূল (স) এর জুতা মুবারকের নকশা উপস্থাপন করার কারণ প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেছেন, "হুজুর (স) এর ব্যবহৃত অন্য কোন জিনিসের নকশা আমরা পাই না। কেবল শুনেই মহব্বত করি। কিন্তু তাঁর না'ল মুবারকের নকশা মজবুত রিওয়ায়াতসহ আমাদের কাছে পৌছেছে।"[৯৫]

না'লায়েন শরীফের নকশা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য লেখক কয়েকখানি গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছেন। ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী রচিত 'জাওয়াহিরুল বিহার', হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রচিত 'নাইলুশ শিফা' এবং কুতুবখানায়ে নূরী প্রকাশিত 'শিফাউল ওয়ালিহ' তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর প্রমাণপঞ্জী দৃঢ় এবং নির্ভরযোগ্য।

'না'লায়েন শরীফের ফযীলত' গ্রন্থটি আমাদেরকে রাসূল (স) প্রেমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। রাসূল (স) এর সাথে প্রেমের শিকলে আবদ্ধ করে তাঁর আশেকগণকে। লেখকের অনুরোধে গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন ছারছীনার তৎকালীন পীর মাওলানা শাহ আবূ জাফর মুহাম্মদ সালেহ সাহেব। তিনি লিখেছেন "কিতাবখানি ভক্ত ও প্রেমিক মনের অবদান বলে দু'টি কথা বলতে চাই। মুসলমান মাত্রেই রাসূল (স) প্রেমিক। তাঁকে দেখতে না পেলেও তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখে আশেকগণ প্রেম-বিরহের যন্ত্রণা অনেকটা প্রশমিত করতে পারেন। যেমন হযরত ইয়াকুব (আ) পুত্র ইউসুফকে (আ) হারিয়ে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যখন ইউসুফ (আ) এর ভাইয়েরা তাঁর জামাকে পিতার সামনে নিয়ে এলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।[৯৬] বিশ্ববিখ্যাত প্রেমিক মজনু বালুকাময় প্রান্তরে লাইলীর নাম লিখে মনের প্রেম দহনকে প্রশমিত করেছিলেন। না'লায়েন শরীফ থেকে রাসূল-পেমিকগণ রাসূলের (স) ঘ্রাণ পেয়ে থাকেন। রাসূল-প্রেমের দহন প্রশমিত করতে পারেন। তাইতো গ্রন্থখানির মূল্য অনেক বেশি।"[৯৭]

---

৯৪ লেখক উল্লেখ করেছেন, "হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যেমন আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নাজাতের অছীলা, তেমনি তাঁর লেবাস-পোষাক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র আমাদের বিপদমুক্তির অছীলা হয়ে থাকে। চাই বিশ্বাস ও মহব্বত। এই অছীলাসমূহের মধ্যে হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের না'ল মুবারকের নকশা অন্যতম।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ . ৩।

৯৫ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৯৬ হযরত ইয়াকুব (আ) পুত্রশোকে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যান। এ দিকে ইউসুফ (আ) সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর ভাইদের মাধ্যমে পিতার নিকট জামা পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা এই জামা নিয়ে পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখে দিলেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ইউসুফ (আ) এর ভাইয়েরা তাঁর জামা পিতার নিকট নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতা বললেন, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। কুরআন মজীদে সে কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন,

اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا - واتوني باهلكم اجمعين - ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لو لاتفذون

দ্র . আল কুরআন, ১২ : ৯৩-৯৫।

৯৭ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ . ৫।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থের মূল অংশে লেখক না'লায়েন শরীফে এর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, نعلين শব্দটি نعل শব্দের দ্বিবচন। অর্থ পাদুকাদ্বয়। মূলত نعل শব্দের অর্থ : যা দ্বারা মাটি হতে পা বাঁচিয়ে রাখা হয়। কামূস মিসবাহের প্রণেতাগণ না'ল এর সমার্থবোধক শব্দ লিখেছেন কিবাল (قبال) যিমাম (زمام), শিরাক (شراك) ও শস (شسع)। ইমাম ইবনুল আরাবী লিখেছেন, না'ল নবীগণ ব্যবহার করতেন। পরে তা দেখে মানুষেরা জুমা ব্যবহার করা শুরু করেছে। নবীগণের পোষাক হিসেবে না'লয়ের মর্যাদা অধিক।[৯৮] 'না'লায়েন শরীফের আকৃতি' শিরোনামে লেখক না'লায়েনের বর্ণনা দিয়েছে এভাবে- সে যুগে ফটোগ্রাফি বা চিত্রকারদের অস্তিত্ব ছিল না বিধায় আমরা সরাসরি না'লায়েনের ছবি প্রত্যক্ষ করতে পারি নি। কিন্তু না'লায়েনের গুরুত্ব ও ফযীলতের কারণে এর আকৃতির অসংখ্য বিবরণ হাদীস ও সীরাত গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন- বুখারী শরীফে উবায়দ বিন জুরায়েজের বিওয়ায়াতে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমারের বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (স) এর না'লায়েন শরীফ কষাণো গো-চর্মের নির্মিত ছিল। ঐ চামড়ায় কোন লোম থাকত না।

লেখক হাফিজ ইরাকী ও আবু শায়েখের উদ্বৃতি দিয়ে না'লায়েন শরীফের যে বিবরণ দিয়েছেন তার সারসংক্ষেপ হলো : রাসূল (স)-এর জুতা মুবারক ছিল জিহ্বার ন্যায়। জিহ্বার যেমন গোড়া মোটা এবং অগ্রভাগ ক্রমে সরু, তেমনি না'লায়েনের অগ্রভাগও ছিল সরু। একে মুখসূসারা বলে। এ ছাড়াও লেখক নিহায়া, তাবাকাত, নাইলুশ শিফা, জাওয়াহিরুল বিহার ও তোহফায়ে রসূলিয়া গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে না'লায়েন শরীফের আকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন।[৯৯]

'পাদুকা সম্পর্কে হুযূর (স) এর রুচি' শিরোনামে লেখক রাসূল (স) এর জুতা পরিধানের পদ্ধতি ও আদব সম্পর্কে কয়েকটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।[১০০]

---

৯৮ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৯৯ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬ - ৭।

১০০ রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সর্বাধিক রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি অধিকাংশ সময় জুতা পরিধান করে চলতেন। তবে কখনো কখনো তিনি বিনয়বশত জুতা ছাড়া নগ্ন পায়ে চলতেন। আবূ দাউদ শরীফে হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর (স) কখনো বসে আবার প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করতেন। যিয়াদ বিন সাঈদ (রা) বর্ণনা করেছেন, হুজুর (স) না'ল বড় হওয়া পছন্দ করতেন না। স্বাভাবিক হওয়া পছন্দ করতেন। তিবরানী শরীফে আবু উমামা হতে বর্ণিত আছে, হুজুর (স) তাঁর বাম হাতের তর্জনী দ্বারা না'ল শরীফ বহন করতেন।
দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

'পাদুকা বাহক' শিরোনামে লেখক মহানবী (স) এর জুতা বহন করা প্রসঙ্গে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[১০১]

ন'লায়েন শরীফ বলতে কেবল রাসূল (স) একটি সাধারণ পরিধেয় পোষাককেই বুঝায় না,এর দ্বারা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পায়ের স্পর্শকে বুঝায়। যেমন বলা হয়ে থাকে, অমুকের পদধূলিতে অমুক স্থান ধন্য হয়েছে। আল্লাহ তাআলা রাসূলের (স) জুতা মুবারককে এমন মর্যাদাপূর্ণ করেছেন যে, এর স্পর্শে আরশ ধন্য হয়েছে। জাওয়াহিরুল বিহার, কিতাবের উদ্বৃতি দিয়ে লেখক উল্লেখ করেন, মিরাজের রজনীতে মহানবী (স) আরশে মুআল্লায় পৌঁছে জুতা খুলতে চাইলেন। তখন ইরশাদ হলো- আপনি জুতা খুলবেন না। এঁর সম্মানে আমার আরশ ধন্য হবে। ইঞ্জিল শরীফে মহানবী (স) কে সাহিবুন নাইল বা পাদুকাধারী বলা হয়েছে। সুতরাং না'লায়েন শরীফ অত্যধিক মর্যাদার অধিকারী। লেখক সে কারণে এর উপরে একটি গ্রন্থ রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

'না'লায়েন শরীফের নকশার ইতিহাস' শিরোনামে ছয়টি সূত্রের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেন। তা হলো : রাসূলুল্লাহ (স) এর ইনতিকালের পর না'লায়েন শরীফ হযরত আয়েশা (রা) এর নিকট ছিল। তাঁর নিকট থেকে তাঁর বোন উম্মে কুলসূম তা হস্তগত করেন। উম্মে কুলসূমের স্বামী তালহা বিন আবদুল্লাহ জঙ্গে জামালে শহীদ হলে আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবি রাবিয়াতুল মাখযুমী উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করে তা লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পৌত্র ইসমাইল বিন ইবরাহীম তা লাভ করেন। এর পর থেকে না'লায়েন শরীফের নকশা তৈরি করে লোকজন বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যেতে থাকেন।[১০২]

'না'লায়েন শরীফের ফযীলত' শিরোনামে লেখক পার্থিব জীবনে না'লায়েন শরীফ থেকে উপকার লাভের অনেকগুলো ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

আল কাওলুস্ সাদীদ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবন জাযারী লিখেছেন, যে ব্যক্তি এই নকশা নিজের কাছে রাখবে সে সমস্ত মাখলুকাতের প্রিয় হবে এবং স্বপ্নে রাসূল (স) এর দর্শন লাভ করবে।

---

১০১ মহানবী (স) সাধারণত নিজের কাজ নিজে করতেন। সেজন্য তিনি কাউকে জুতা বহন করতে দিতেন না। তবে কখনো কখনো সাহাবীগণ (রা) তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে জুতা মুবারক বহন করতে চাইলে তিনি তাঁদেরকে সুযোগ দিতেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) না'ল মুবারক পরিধান করতে উদ্যত হলেন। তখন একজন সাহাবী তাঁকে না'ল পরিয়ে দেওয়ার আরজ করলেন। রাসূল (স) তাকে সুযোগ দিলেন এবং তাঁর জন্যে দুআ করলেন "হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি আমাকে খুশী করতে চেয়েছে। তুমি তাকে খুশী কর।"

সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে, রাসূল (স) বসলে হযরত ইবন মাসউদ (রা) তাঁর পদযুগল হতে না'লায়েন মুবারক খুলে হাতে রাখতেন।

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

১০২ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ হাবীবুন্নবী বর্ণনা করেন, একবার তার একটি ফোঁড়া হয়েছিল। কোন ঔষধে তা ভাল হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি নকশা মুবারক ব্যথার স্থানে রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে তার যন্ত্রণা কমে গেল এবং ফোঁড়া ভাল হয়ে গেল।

আশরাফ আলী থানবী লিখেছেন, অছীলাসমূহের মধ্যে রাসূল (স) এর পাদুকার নকশা অন্যতম। বুযুর্গানে দ্বীন এর অছীলায় বহু বরকত ও আশুক্রিয়া লাভ করেছেন।[১০৩]

গ্রন্থের শেষাংশে লেখক নকশা মুবারক ব্যবহার ও আমলের নিয়ম[১০৪] আলোচনা করেছেন এবং না'লায়েন শরীফ সম্পর্কিত কয়েকটি আরবি ও ফার্সি কবিতাংশের কাব্যানুবাদ উল্লেখ করেছেন। ফলে পুস্তিকাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাঠকপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :

ياطالبا تمثال نعل نبيه * ها قد وجدت الي اللقاء سبيلا

অনুবাদ :

প্রাণের নবীর পাদুকা ছবি অন্বেষী ওগো বন্ধু।
গেয়েছ, পেয়েছ সঠিক পেয়েছ, প্রিয়-মিলনের রাহাগো।

لما رأيت مثال نعل المصطفي * المسند الوضع الصحيح معرقا
فمسحت وجهي بالمثال تبرك * فشفيت من وقتي علي الشفاء

অনুবাদ :

নবী মুসতফার পাদুকার ছবি যবে
হেরেনু নয়নে, আর জানিলাম সহী।
মুখে লাগাইনু, ভাবিলাম ভাল হবে,
ব্যাধি কেটে গেল, হলাম সুস্থদেহী।

---

১০৩ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

১০৪ না'লায়েন শরীফের নকশা মুবারক ব্যবহার ও আমলের নিয়ম হলো : শেষ রাত্রে উঠে ওযূ করে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে। এর পর ১১ বার দরুদ শরীফ, ১১ বার কালিমা তায়্যিবা এবং ১১ বার আসতাগফিরুল্লাহ পাঠ করে আদবের সাথে না'লায়েন মুবারকের নকশা মাথার উপর রেখে বিনীতভাবে আল্লাহর নিকট মুনাজাত করবে "হে আল্লাহ তাআলা! হুজুর (স) এর না'লায়েন মুবারকের ওসিলায় আমার অমুক আশা পূর্ণ করুন।
দ্র. মাওলনা শরীফ মাহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

هركه بقرطاس مثالش كشد * تاج وش ان را بسرخودنهد
فتح وظفر يابد وكردد عزيز * نور دل افزايد وعقل تميز

অনুবাদ : পাদুকার ছবি রক্ষা করে যে কাগজ পরে
ভাগ্যের টুপি ধারণ করে সেই আপন শিরে
জয়ের মাল্য লভিয়া হয় সে সর্বপ্রিয়
হৃদয়ের আলো বাড়ে তায়, হয় অধিক জ্ঞেয়।

مثال لنعلي من احب هويته * فها انا في يومي وليلي لاثمه
اجر علي راسي ووجهي اديمه * واثمه طورا وطورا لازمه
امثلهه في رجل اكرم من مشى * فتبصره عيني وما انا حامله

অনুবাদ : ভালবাসি যারে ছবি তার পাদুকার
চুমি কাছে পেলে দিবস যামিনী ভর
মনে চায় রাখি বক্ষ ও শির পরে
মুখে বুলাইয়া চুমো খাই বারে বারে।
মনে হয় যেন চরণ- কমলদ্বয়ে
চাক্ষুস দেখিতেছি ওর মাঝে হায়।

সাত. হাবীবুল ওয়া'ঈজীন

এটি মাওলানা শরীফ মহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত একটি বক্তৃতা সংকলন। ৭১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ গ্রন্থটি ১৯৫৮ সালে দারুসসালাম কুতুবখানা, বাকেরগঞ্জ কতৃক প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক হলেন শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম, শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল মা'বূদ এবং শরীফ মুহাম্মদ আবদুন নূর। গ্রন্থটির পরিবেশনায় ছিলেন হামিদিয়া লাইব্রেরি ও এমদাদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা। গ্রন্থকার মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ১৯৪৭ সাল থেকে দীর্ঘদিন যাবত ছারছীনার মরহুম দাদা হুজুর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) এবং তাঁর পুত্র ও পরবর্তী পীর মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ সাহেবের সাথে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে ওয়াজ-নসীহত করেন। শ্রোতাদের অনুরোধে তিনি তার কিয়দাংশ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "অনেক সময় বহু ভাই আমাকে অনুরোধ করেছেন, আপনি যে কথাগুলো মাহফিলে দাঁড়িয়ে বলেন সেগুলি কিতাবাকারে ছাপিয়ে দিলে সমাজের বহু উপকার হত। তাদের অনুরোধ রক্ষা করার জন্যই এ প্রচেষ্টা।"[১০৫] হাবীবুল ওয়া'ঈজীন গ্রন্থে ১০টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। ওয়াজের ভঙ্গিতে এ ১০টি বিষয়ের আলোচনার পূর্বে রয়েছে আল্লাহ তাআলার

Dhaka University Institutional Repository

হামদ, রাসূলের (স) নাত ও দরুদ-সালাম এবং দীর্ঘ মুনাজাত। মুনাজাতের পরেই লেখক মাহফিলের হাজির হওয়ার ফযীলত বর্ণনা করে শ্রোতাদের হৃদয়কে মাহফিলের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। তিনি কুরআন, হাদীস ও যুক্তির অবতরণা করে শ্রোতামন্ডলীকে ফায়েদা লাভের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন।[১০৬] তিনি মুসলমান ভাইদের সাথে একত্রে বসা, পরস্পরকে ভালবাসা এবং পরস্পরের সাথে কুশল বিনিময় করার ফযীলত সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেন। হাবীবুল ওয়া'ঈজীন গ্রন্থে লেখক কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাগুলো যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি সঠিক পথ লাভ এবং বিদআত বর্জন করে চলার জন্য উপযোগী। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, 'বিদআতী বর্জন' শিরোনামে লেখক নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন-"একদিন দুই সহোদর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একজন ভন্ড সাধু তাদের দেখে 'কাউয়া-কাউয়া দূরহ'বলে উঠল। এ অবস্থা দেখে ভ্রাতৃদ্বয় ভাবল লোকটা কোন কামিল লোক হতে পারে। তারা ভন্ড সাধুকে নিবেদন করে যত্নসহকারে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। তারা ভন্ডকে গুরুজী মানল এবং বেশ সম্মান দেখাল।

---

১০৫ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, হাবীবুল ওয়া'ঈজীন, (বাকেরগঞ্জ : দারুসসালাম কতুবখানা, ১৯৫৮), পৃ. ৫।

১০৬ লেখক উল্লেখ করেছেন, আপনারা বাড়ি হতে কদম ফেলতে ফেলতে মাহফিলের ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন। প্রতিটি কদমের বিনিময়ে ১ থেকে ১০টি করে নেকী লাভ করবেন। কেননা আল্লাহ বলেন

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

আর্থৎ, যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে তার জন্য ঐ নেক কাজের দশগুণ সওয়াব রয়েছে।

দ্র. আল কুরআন, ৬ : ১৬০।

আপনারা এই মাহফিলে এসেছেন কুরআনের আকর্ষণে তথা আল্লাহর আকর্ষণে। যেমন বায়তুল্লহ শরীফকে তওয়াফ করা হয় আল্লাহর সম্মানে।

পেয়ারে হাজেরীন! আপনার যখন ঘর থেকে বের হয়েছেন তখন থেকে পুনরায় ঘরে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আল্লাহর রহমতের ফেরেশতাগণ আপনাদেরকে বেষ্টন করে আছেন এবং আপনাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করছেন। মহানবী (স) বলেছেন, নিশ্চয় যখন কোন মুসলমানের জামাআত আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে তখন তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। আল্লহর রহমত তাদের বেষ্টন করে রাখে। ফেরাশতাগণ তাদেরকে তওয়াফ করতে থাকে এবং স্বয়ং আল্লাহ মুকাররাবীন ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের নেক আমল সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। ফেরেশতারা আপনাদেরকে তওয়াফ করেন যেমনভাবে আপনারা হজ্জের সময় কাবা ঘর তওয়াফ করেন। সুতরাং চিন্তা করে দেখুন আপনাদের মর্যদা কত বেশি।

দ্র. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬ - ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

আশেপাশের কিছু লোক তার মুরীদও হল। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন ভন্ড সাধু ভ্রাতৃদ্বয়কে ডেকে বলল, তোমাদের আত্মার শুদ্ধির কাজ চলছে। তোমাদের স্ত্রীগণের আত্মাও শুদ্ধ করে নাও না কেন? যাও বাড়ির ভিতর থেকে থালায় ভাত নিয়ে আস। ভ্রাতৃদয় ভাত আনল। ভন্ড এক প্লেট ভাত নিজে খাইল এবং অন্য প্লেটের ভাত হাত দ্বারা নাড়া নাড়ি করে দিয়ে দিল এবং বলল, তোমাদের বধূদের খেতে দিও, তাসীর হবে। ভ্রাতৃদ্বয় স্ত্রীদেরকে ঐভাত দেওয়ার পর তারা খাবে কি-না সে ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা না খেয়ে কুকুরকে খেতে দিল। খাবার খাওয়া শেষ হতে না হতেই কুকুরটি কুঁৎ কুঁৎ শব্দ করতে করতে ভন্ড সাধুর দিকে ছুটে গিয়ে তাকে চাটতে লাগল। আশেপাশের সবাই কুকুরটিকে সরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কুকুরটি ভন্ড সাধুর গায়ে হেলে দুলে পড়তে লাগল। ভন্ড তখন রাগান্বিত হয়ে বলে উঠল, তোমরা স্ত্রীদের খাবার না খাওয়ায়ে কুকুরকে খাওয়ায়েছ বিধায় এ অবস্থা হয়েছে। একথা বলায় সবাই বুঝে ফেলল ভন্ড ভ্রাতৃদ্বয়ের স্ত্রীদের পাগল করে তাদের সতীত্ব নষ্ট করার জন্য জাদু করেছিল।"[১০৭] লেখক বুঝাতে চেয়েছেন এ ধরণের ভন্ডরা পীরের রূপ ধরে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। এদের থেকে সাবধান। 'নিয়াতের ইসলাহ' শিরোনাম শরীফ সাহেব কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা নিয়াতের বিশুদ্ধতার সুফল এবং নিয়াতের ত্রুটির কুফল আলোচনা করেছেন।[১০৮] তিনি উদাহরণ দিয়ে নিয়াতের বিশুদ্ধতার সুফল স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন, এক ব্যক্তি বাতাস পাওয়ার নিয়াতে ঘরে জানালা রাখল। আরেক ব্যক্তি আযানের ধ্বনি শুনার জন্য ঘরে জানালা রাখল। যে ব্যক্তি আযান শোনার নিয়াতে জানালা রাখল সে বাতসের সাথে সাথে অনেক সওয়াব লাভ করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কেবল বাতাসের নিয়াতে জানালা রাখল, সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হল।

---

১০৭ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫ - ৪৬।

১০৮ কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন

فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا ماله في الاخرة من خلاق - ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বলে থাকে, হে প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে পার্থিব প্রাচুর্য দান করুন তার জন্য আখিরাতের কোন অংশ নেই। পক্ষান্তরে যে বলে, হে প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করুন তাদের জন্য রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ।

দ্র. আল কুরআন, ২:২০০-২০২।

মহানবী (স) বলেছেন انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই প্রতিটি আমলের সওয়াব নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। মানুষ যার নিয়াত করে তারই ফল পেয়ে থাকে। -বুখারী

Dhaka University Institutional Repository

শরীফ সাহেব আরো কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ইবরাহীম (আ) এর খোদা প্রেম, বাহলুল দরবেশের কিস্সা[১০৯] তন্মধ্যে অন্যতম। গ্রন্থটিতে বর্ণিত ঘটনাবলি বিষয়ভিত্তিক আলোচনার অংশবিশেষ। আলোচ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করার জন্যেই এসব গল্পের অবতরণা করা হয়েছে। গ্রন্থখানি ওয়াজের আদলে লিখিত। পড়লে মনে হয় লেখকের ওয়াজ রেকর্ড করে তা শুনে সরাসরি কম্পোজ করা হয়েছে। যেমন দেখা যায় যে, তিনি বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন, বন্ধুগণ, পেয়ারে হাজেরীন, ভাই সাহেব ইত্যাদি। আবার কতক্ষণ আলোচনার পর দরুদ শরীফ উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ বইটা যেন বক্তা আর পাঠকগণ হলেন শ্রোতামন্ডলী।

উপস্থিত বক্তৃতা সংকলন করা হলেও গ্রন্থটিতে বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্বৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে আলোচ্য বিষয় তথ্যনির্ভর ও দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। আমাদের ইসলামি সাহিত্যে এর স্থান সুবিদিত।

আট. জীবনের আদর্শ

এটি মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত একটি গল্প গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি ১৯৬৩ সালে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন যুগের আম্বিয়া (আ) ও আউলিয়া কিরামের (রহ) জীবনের ইবাদাত-বন্দেগি, তাঁদের ত্যাগ-তিতীক্ষা, সততা, নিষ্ঠা ও উত্তম চরিত্রের বিবরণ তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি অধুনা বিলুপ্ত।[১১০]

---

১০৯ বাহলুল নামক এ ব্যক্তি একদা এক পথ ধরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখলেন, অনেকগুলো বালক খেলাধূলা করছে। কিন্তু একটি বালক বিষণ্নভাবে জড়সড় হয়ে রাস্তার পাশে বসে আছে। তিনি বালকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা সবাই খেলাধূলা করছে। তুমি করছ না কেন? বালকটি বলল, আমি খেলছিলাম। খেলার মধ্যে শুনতে পেলাম একব্যক্তি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করছেন।

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর; যার ইন্দন হবে মানুষ এবং পাথর।"

দ্র. আল কুরআন, ৬৬ : ৬।

আমি দেখেছি আমার মা রান্না করার সময় প্রথমে ছোট ছোট লাকড়িকে চুলায় দেন। যখন তাতে আগুন জ্বলে ওঠে তখন বড় কাঠ চুলায় দেন। আমার ভয় হচ্ছে, যেহেতু আমি ছোট মানুষ, তাই আমাকে আগে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় কি - না। বালকটির কথা শুনে বাহলুলের অন্তরে আল্লাহর ভয় ঢুকল। সে ইবাদাত করে আল্লাহর ওলীতে পরিণত হলেন।

দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

১১০ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম, আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির : পারিবারিক পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ), পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

নয়. তরীকুল ইসলাম-দ্বাদশ খন্ড

ছারছীনা শরীফের মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) ধারাবাহিকভাবে 'তরীকুল ইসলাম' নামক এক বৃহদায়তন ফতোয়ার কিতাব রচনা করেন। পীর সাহেবের এ পুস্তক রচনার কাজে শরীফ সাহেব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেন। বিশেষ করে দ্বাদশ খন্ডটি রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব শরীফ সাহেবের উপর অর্পণ করা হয়। শরীফ সাহেব হযরত পীর সাহেব কিবলার সরাসরি তত্ত্বাবধানে এ দ্বাদশ খন্ড প্রণয়ন ও সম্পাদনা করেন। এ গ্রন্থটি ১৯৫৭ সালে প্রথমে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয় এবং সর্বশেষ ২০০২ সালে একত্রে হযরত পীর সাহেব কিবলার নামে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে লেখক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় মাসআলা মাসাইল তুলে ধরেন।[১১১]

দশ. চারি মাসআলার ফয়সালা

বিশ্ববিখ্যাত ওলী হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব (রহ) কর্তৃক প্রণীত 'ফায়সালায়ে হাফত মাসয়ালা' গ্রন্থে চারটি বিষয়ের শরীআতসম্মত ফায়সালা তুলে ধরা হয়েছে। চারটি বিষয় হলো :

১. মিলাদ-কিয়াম; ২. ফাতেহা; ৩. উরস; ৪. নিদায়ে গায়রুল্লাহ।

হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব (রহ) এর উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে শরীফ সাহেব চারি মাসআলার ফয়সালা গ্রন্থখানি রচনা করেন। লেখক এ গ্রন্থে ব্যাপক দলীল-আদিল্লা দ্বারা উক্ত চারটি বিষয় সম্পর্কে শরীআতের বিধি-বিধান জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। ফলে সাধারণ মুসলমান থেকে শুরু করে উলামা কিরাম পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর মানুষ শিরক, বিদআত এবং সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয়েছেন এ গ্রন্থের সাহায্যে। গ্রন্থটি ১৯৬৫ সালে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত।[১১২]

---

১১১ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

১১২ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

এগার. সুখের সন্ধানে

শরীফ সাহেব রচিত 'সুখের সন্ধানে' গ্রন্থটি ১৯৭০ সালে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে লেখক ইসলামের বিধি-বিধান পালনের মধ্যেই সুখের সন্ধান দিয়েছেন। গ্রন্থটি বর্তমানে বিলুপ্ত।[১১৩]

বার. পাকিস্তান ও মুসলমান

এ গ্রন্থটি ১৯৬৩ সালে ছারছীনা মুসলিম স্টোর থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তৎকালীন পাকিস্তানের মুসলমানদের অবস্থা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী বিধি-বিধান কায়িমের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে এ গ্রন্থটি বিলুপ্ত।[১১৪]

তের. কারামাতে আউলিয়া

এ গ্রন্থটি ১৯৬৫ সালে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে আউলিয়া কিরামের কারামাতের অনেকগুলো কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তাঁদের রূহানী শক্তির মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে এ গ্রন্থটি বিলুপ্ত।[১১৫]

---

১১৩ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

১১৪ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

১১৫ শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

খ. প্রবন্ধাবলি

শরীফ সাহেব নিয়মিত ইসলামি প্রবন্ধ রচনা করতেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অগ্রপথিক, সবুজ পাতা, তাবলীগ, আল বালাগ, ইত্তেফাক, ইনকিলাব ইত্যাদি ত্রৈমাসিক, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা এবং বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা দুই শতাধিক। নিম্নে তন্মধ্যে কয়েকটির বিবরণ তুলে ধরা হলো :

এক. তাহরীফ (تحريف) : 'তাহরীফ' শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির লিখিত একটি গবেষণা প্রবন্ধ। এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা ত্রৈমাসিক 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' ৩৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা – ৩৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৪ – সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, [যুগ্ম সংখ্যা]-এ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের শুরুতে লেখক تحريف এর পাঁচটি অর্থ লিখে পাঠকদের নিকট তাহরীফের পরিচয় স্পষ্ট করে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।

তাহরীফ অর্থ বদলানো। এই বদলানো বিভিন্ন ধরণের হতে পারে।

যেমন :

- হরকত বদলিয়ে পড়া, যথা : الفلك কে الفلك পড়া, الخلق কে الخلق পড়া।
- এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর দিয়ে পড়া।
- এক শব্দকে অন্য শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা।[১১৬]

লেখক বিস্তারিতভাবে তাহরীফের প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন। তাহরীফ প্রথমত দুই প্রকার।

১. তাহরীফ লফযী অর্থাৎ শাব্দিক তাহরীফ।

২. তাহরীফ মানাভী অর্থাৎ অর্থগত তাহরীফ।

সব ধরনের তাহরীফ হারাম ও অমার্জনীয় গুনাহের কাজ। আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীর সম্পর্কে বলেন يحرفون الكلم عن مواضعه

অর্থাৎ, তারা তাওরাতের বাণীকে স্বস্থান হতে পরিবর্তিত করে।[১১৭]

---

১১৬ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, তাহরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা–৩৫বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৪ – সেপ্টেম্বর ১৯৯৫), পৃ. ৯।

১১৭ আল কুরআন, ৫ : ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের আয়াতে ইয়াহুদীদের তাহরীফকে নিন্দা করা হয়েছে। এর দ্বারা তাহরীফ হারাম প্রমাণিত হল।

লেখক তাহরীফের ক্ষেত্র আলোচনা করেছেন। তা হলো :

১. কুরআনের আয়াতকে পরিবর্তন করা। এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যদি কেউ কুরআনের আয়াতের তাহরীফ করতে চায়, তবে সে ধরা পড়ে যাবে এবং তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কেননা কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেছেন انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

নিশ্চয়ই আমি এই উপদেশ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং এর হিফাযতকারী আমি নিজেই।[১১৮]

২. কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা নিজের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করা। এটাও সম্পূর্ণ হারাম।

৩. হাদীসকে শব্দ পরিবর্তন করে বর্ণনা করা। একে رواية الحديث بالمعنى বলে। এটা কোন কোন হাদীসবিশারদের মতে জায়েয। তবে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় এমন ধরণের তাহরীফ হারাম।

৪. দলীল, দস্তাবেজ, মোহরকৃত কাগজপত্র ইত্যাদি তাহরীফ করা। এটাও হারাম।

লেখক তাহরীফ থেকে বেঁচে থাকার উপায়ও উল্লেখ করেছেন।

'তাহরীফ' একটি গবেষণা প্রবন্ধ। লেখক নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো থেকে তার প্রবন্ধের মধ্যে দলীল পেশ করেছেন।

১. আল মাউসূয়াত আল ফিকহিয়া; ২. সাভী আলাল জালালাইন; ৩. তাসফীহাতুল মুহাদ্দিসীন; ৪. দুরার শরহে নুখবা; ৫. শরহে মুকাদ্দামা-ই-ইবনুস সালাহ; ৬. আল কিফায়া ফী উসূলির রিওয়ায়া; ৭. তাদরীবুর রাভী; ৮. মুখতাসারুস্ সিহাহ্; ৯. কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন; ১০. আল বুরহান; ১১. আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন; ১২. মাশারিকুল আনওয়ার; ১৩. সিফাতুল ফাতাওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী; ১৪. লুগাতুল কুরআন এবং ১৫. আবজাদুল উলূম।

তাহরীফ প্রবন্ধটি পরবর্তীতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'আল কুরআনের শাশ্বত পয়গাম' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।[১১৯]

---

১১৮ আল কুরআন, ১৫ : ৯।

১১৯ সম্পাদনা পরিষদ, আল কুরআনের শাশ্বত পয়গাম, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০২), পৃ. ১৭০ – ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. ইসলামে ইজতিহাদের স্থান

'ইসলামে ইজতিহাদের স্থান' শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত একটি গবেষণা প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৯৯২ এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।[১২০]

প্রবন্ধের শুরুতে লেখক ইজতিহাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তা হলো : ইজতিহাদের শাব্দিক অর্থ- بذل الوسع والطاقة في طلب امر ليبلغ مجهوده ويصل الي نهايته

অর্থাৎ, কোন ইপ্সিত বিষয়ের শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য শক্তি সামর্থ ব্যয় করা।[১২১]

শরীআতের পরিভাষায় استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له الظن بحكم شرعي

অর্থাৎ, কোন শরয়ী বিধান সম্পর্কে প্রবল ধারণা অর্জন করার জন্য ফকীহ ব্যক্তির সামর্থকে কাজে লাগানোকে ইজতিহাদ বলে।

লেখক সাধারণ অর্থে ইজতিহাদ বলতে মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনাকে বুঝিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ) পৃথিবীতে প্রেরিত হওয়ার পর ইজতিহাদের বলে গাছের পাতা সংগ্রহ করে নিজেদের সতর ঢেকেছিলেন। এ ধরনের ইজতিহাদ মানুষের জন্মগত স্বভাব। প্রবন্ধকার ইজতিহাদের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার জন্য কুরআন ও হাদীসের নিম্নোক্ত দলীলগুলো উপস্থাপন করেছেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বিভিন্ন স্থানে বলেছেন, افلا تعقلون 'তোমরা কি বুঝনা?' افلا يتدبرون 'তারা কি অনুধাবন করে না?' ইত্যাদি। এ সব আয়াতাংশে ইজতিহাদ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

"তোমাদের প্রত্যেক জনদল থেকে কিছু কিছু লোক দ্বীনের ফিকহী জ্ঞান অর্জনের জন্য কেন বের হয় না?"[১২২] এ আয়াতে ইজতিহাদ করার মত জ্ঞান অর্জন করার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আবূ দাউদ শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূল (স) দুই ব্যক্তির মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করার সময় ইরশাদ করেন, "আমি আমার রায়ের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেব।" এখানে দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) ইজতিহাদ করে উম্মতদেরকে ইজতিহাদ করা শিখিয়েছেন।

---

১২০ সম্পাদনা পরিষদ, গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০১), পৃ. ৩৯ – ৪৫।

১২১ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, ইসলামে ইজতিহাদের স্থান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩১বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি – মার্চ ১৯৯২), পৃ. ২৭৫।

১২২ আল কুরআন, ৯:১২২।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স) হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা) কে ইয়ামেন প্রদেশের কাযী হিসাবে প্রেরণ করার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট কোন বিষয়ের ফয়সালা চাওয়া হলে তুমি কিসের মাধ্যমে সমাধান দিবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে। রাসূল (স) জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর কিতাবে সমাধান না পাওয়া গেলে কি করবে? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলের (স) হাদীসের মাধ্যমে সমাধান দেব। রাসূল (স) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হাদীসে না পাওয়া গেলে কি করবে? উত্তরে মুআয (রা) বললেন, আমার রায় দ্বারা ইজতিহাদ করব। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধির দ্বারা এমন উত্তর দেয়ালেন যাতে তাঁর রাসূল খুশী হতে পারলেন। এ থেকে বুঝা যায়, রাসূল (স) ইজতিহাদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

প্রাবন্ধিক ইজতিহাদের কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যেমন- মুজতাহিদকে মুসলিম হতে হবে। সুষ্ঠু জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। শরীআতের আহকাম নির্গমনের উৎস সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। নাহু, সরফ ও বালাগাতসহ আরবি ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা থাকতে হবে। উসূলে ফিকহে বুৎপত্তি থাকতে হবে ইত্যাদি।

'ইজতিহাদের দ্বার কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত' একথার সমর্থনে প্রবন্ধকার লিখেছেন, কতিপয় লোক বলে থাকেন ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের কারণে মুসলিম দুনিয়ার জ্ঞান-গবেষণার সাগরে ভাটা পড়েছে। ইসলামী চিন্তাধারায় দৈন্য এসেছে এবং মুসলিম গবেষকরা ইসলামী গবেষণা বাদ দিয়ে বিধর্মীদের পদলেহন করে বেড়াচ্ছে। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ইসলামে ইজতিহাদ বা গবেষণার দ্বার চিরতরে উন্মুক্ত। তাহলেই আমাদের উন্নতি অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

সর্বোপরি, 'ইসলামে ইজতিহাদের স্থান' একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। প্রবন্ধকার কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ ও অন্যান্য গ্রন্থের উদ্বৃতি সহকারে এ প্রবন্ধকে পাঠক সমীপে উপস্থাপন করেছেন। বাংলাভাষায় রচিত ইসলামি সাহিত্যাকাশে এ প্রবন্ধটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ হিরক নিটোল ভাস্বরতায় উদ্ভাসিত।

তিন. আল মি'রাজ

শরীফ সাহেব রচিত আল মি'রাজ শীর্ষক প্রবন্ধটি 'মাসিক অগ্রপথিক' পত্রিকার ১৯৯২ সনের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে তিনি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা মি'রাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করেছেন। লেখক উল্লেখ করেছেন যে, প্রিয় নবীজী (স) মিরাজ গমন করে সপ্ত আসমান পরিদর্শন করেন। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম এর অবস্থা অবলোকন করেন এবং আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে গিয়ে উম্মতের জন্য সালাম, রহমত ও বরকতের উপঢৌকন নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। উম্মতের জন্য তিনি

Dhaka University Institutional Repository

উপহার স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, সূরা বাক্বারার শেষ তিন আয়াত এবং উম্মতের শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা লাভের সুসংবাদ নিয়ে আসেন।[১২৩]

শরীফ সাহেব রচিত এ প্রবন্ধটি আমাদের আকীদা শুদ্ধকরণ এবং সীরাতুন্নবী (স) সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনে সহায়ক। প্রবন্ধটির ভাষা সহজ ও সাবলীল।

চার. কুরবানীর মর্মকথা

এটি মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির রচিত নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধটি মাসিক অগ্রপথিক ৭ম বর্ষ, মে-জুন ১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে কুরবানীর উদ্দেশ্য ও শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। লেখক উল্লেখ করেছেন যে, কুরবানী আমাদেরকে তাকওয়া অর্জন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। কুরবানী আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের জীবন-মরণ সবকিছু আল্লাহর জন্য। সুতরাং তাঁর পথে জীবনোৎসর্গ করার মাধ্যমেই কেবল তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। কুরবানী আরো শিক্ষা দেয় যে, ইখলাসের সাথে ইবাদাত করলেই কেবল তা আল্লাহ কবুল করেন। লেখক এ ক্ষেত্রে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوي منكم

'এগুলোর (কুরবানীর পশুর) গোশত ও রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।'[১২৪]

পাঁচ. লাইলাতুল বারাআত

শরীফ সাহেব রচিত এ প্রবন্ধটি মাসিক অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সাবান মাসের ১৫ তারিখ লাইলাতুল বারাআত। এরাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের গুনাহ ক্ষমা করে থাকেন। প্রবন্ধকার কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, লাইলাতুল বারাআতে আল্লাহ তাআলা পরবর্তী এক বছরের জন্য বান্দার ভাগ্য নির্ধারণ করেন। লেখক লাইলাতুল বারাআতের ফযীলত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে এরাতে ইবাদাত করার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে।[১২৫]

---

১২৩ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, আল মি'রাজ, অগ্রপথিক, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ১৯৯২), পৃ. ১৯ – ২০।

১২৪ আল কুরআন, ২২ : ৩৭।

১২৫ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, লাইলাতুল বারাআত, অগ্রপথিক, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি – মার্চ ১৯৯২), পৃ. ৩৯ – ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. বিপদ বিদূরণে সাদ্‌কার কার্যকারিতা

শরীফ সাহেব রচিত এ প্রবন্ধটি অগ্রপথিক, জুন ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখক এ প্রবন্ধে মুসলমানদেরকে দান-সদকার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি কুরআনের আয়াত-

وما تنفقوا من خير فلانفسكم

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর"[১২৬] এর মাধ্যমে দান-সদকার ফলে বিপদাপদ দূর হয় এবং কল্যাণ লাভ করা যায়- তা প্রমাণ করেন। প্রবন্ধটি আমাদের জীবনের জন্য পাথেয়।[১২৭]

সাত. ইসলাম বনাম মানব রচিত আইন

এটি শরীফ সাহেব রচিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। এটি পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার ২৮ বর্ষ ৮ম, ৯ম, ১০ম, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা, ২৯ বর্ষ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে লেখক ইসলামের অধীনে থেকে মানব রচিত আইন মেনে চলার কুফল আলোচনা করেছেন। লেখক উল্লেখ করেছেন, মানুষের মধ্যে তখনই ইসলাম বিদ্যমান থাকবে যখন সে সর্বোতভাবে আল্লাহর আইন মেনে চলবে। এক্ষেত্রে লেখক দলীল হিসাবে কুরআনের অনেকগুলো আয়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত হলো : "হে নবী! আপনি কি সে সব লোককে দেখেন নি যারা দাবী করে আমরা সেই কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি, যে কিতাব আপনার উপর ও আপনার পূর্ববর্তীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যকার কোন বিষয়ের ফয়সালার ক্ষেত্রে তারা তাগুতের হাতে বিচারের ভার অর্পণ করে। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাগুতকে পরিহার করার জন্য।"[১২৮] "কোন মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ের ফয়সালা দিবেন তখন তা অমান্য করবে। যে ব্যক্তি অমান্য করবে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে।"[১২৯] "যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, সে কাফির।"[১৩০] লেখক মানব রচিত আইনের অসারতা ব্যাখ্যা করেছেন এবং পাশাপাশি ইসলামী আইনের সুফল বর্ণনা করে ইসলামী আইন ও মানব রচিত আইনের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। লেখকের এ প্রবন্ধটি পাঠকদেরকে শরীআতের বিধান পালনের প্রতি অনুপ্রাণিত করে।

---

১২৬ আল কুরআন, ৬৫ : ১৬।

১২৭ মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, বিপদ বিদূরণে সাদ্‌কার কার্যকারিতা, অগ্রপথিক, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৯ সংখ্যা), পৃ. ২৬।

১২৮ আল কুরআন, ৪ : ৬০।

১২৯ আল কুরআন, ৩৩ : ৩৬।

১৩০ আল কুরআন, ৫ : ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

আট. রহমাতুল্লিল আলামীন (স)

এটি শরীফ সাহেব রচিত একটি সীরাত বিষয়ক প্রবন্ধ। এটি ১৯৯৩ সনের ২ মার্চ তারিখের দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে লেখক রাসূলুল্লাহ (স) এর জীবনের বিভিন্ন দিক অতি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) এর রহমত ও বরকতের কথা তুলে ধরেছেন।[১৩১]

নয়. বিশ্বনবী (স) ও মিলাদুন্নবী

শরীফ সাহেব রচিত এ প্রবন্ধটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাসিক শিশু-কিশোর পত্রিকা 'মাসিক সবুজ পাতায়' প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে লেখক রাসূলুল্লাহ (স) এর দুনিয়ায় আগমনের সুফল বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি দরুদ পড়ার ফযীলত আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটির ভাষা চমৎকার। লেখক প্রবন্ধের শেষাংশে একটি কবিতার মাধ্যমে রাসূল (স) এর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করেছেন।[১৩২]

দশ. বলবিজ্ঞান (Mechanics)

প্রবন্ধটি পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার ৩২ বর্ষ ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। লেখক বলবিজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করেছেন এ প্রবন্ধে। তিনি আব্বাসীয় শাসনামলে বাগদাদে বৃহৎ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা এবং অসংখ্য মূল্যবান পুস্তকের সমাবেশের কথা উল্লেখ করে পাঠকদের নতুন এক ভুবনে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।[১৩৩]

এগার. বীর শহীদানের রাসূলপ্রীতি

এ প্রবন্ধটি মাসিক সবুজ পাতা, সীরাতুন্নবী (স) (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯১) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে লেখক সাহাবীদের রাসূলপ্রেম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সাহাবা কিরাম (রা) রাসূলের (স) প্রতি মহব্বতের কারণে জীবনের মায়া ত্যাগ করে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। লেখক কয়েকজন সাহাবীর রাসূলপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপনের কাহিনী উল্লেখ করে প্রবন্ধটিকে সুখপাঠ্য করেছেন।[১৩৪]

---

১৩১ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, রহমাতুল্লিল আলামীন (স), দৈনিক ইনকিলাব, ২ মার্চ ১৯৯৩, পৃ. ৮।

১৩২ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, রহমাতুল্লিল আলামীন (স), মাসিক সবুজ পাতা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ১৯৯৪ সংখ্যা), পৃ. ৩২।

১৩৩ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, বলবিজ্ঞান, পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর : ছারছীনা দরবার শরীফ, ৩২বর্ষ, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা), পৃ. ৩৮, ৪২, ৫৪।

১৩৪ মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, বীর শহীদানের রাসূলপ্রীতি, মাসিক সবুজ পাতা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯১ সংখ্যা), পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

বার. শবেবরাত কিভাবে পালিত হবে

এ প্রবন্ধটি মাসিক আল বালাগ পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে লেখক শবেবরাতের ফযীলত বর্ণনা করে মুসলিম সমাজকে তা উদযাপনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ প্রবন্ধে তিনি বিদআত বর্জন করে শরীআতসম্মত পন্থায় শবেবরাত পালনের পরামর্শ দেন এবং শবেবরাতে ইবাদত বন্দেগি করার নিয়মনীতি তুলে ধরেন।[১৩৫]

তের. যৌতুকের হিংস্র থাবা

এ প্রবন্ধটি পাক্ষিক তাবলীগ ৩২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এতে লেখক যৌতুকের কারণে সমাজে যে সব দুর্ঘটনা ঘটছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে যৌতুকের কুফল স্পষ্টভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি শরীআতের দৃষ্টিতে যৌতুকের অবৈধতা প্রমাণ করে সরকারের প্রতি যৌতুক বিরোধী আইন পাশ করার আহ্বান জানিয়েছেন।[১৩৬]

চৌদ্দ. কুরবানীর শিক্ষা

এ প্রবন্ধটি দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ১২ আষাঢ় ১৩৯৮ তারিখ প্রকাশিত হয়। লেখক এতে কুরবানী থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়াবলি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করেছেন। যেমন- কুরবানী আমাদেরকে সব ধরনের কষ্ট সহ্য করে আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কুরবানী আমাদেরকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা শিক্ষা দেয়।[১৩৭]

পনের. বিপন্নের সাহায্যে ইসলামের ডাক

এ প্রবন্ধটি দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ২২ জৈষ্ঠ্য ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে লেখক দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য-সহযোগিতা করার ফযীলত আলোচনা করেছেন। লেখক কুরআন, হাদীস ও মনীষীদের বাণীর মাধ্যমে দান সদকা করে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের প্রতি পাঠকদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন।[১৩৮]

---

১৩৫ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, শবেবরাত কিভাবে পালিত হবে, মাসিক আল বালাগ, (ঢাকা: জানুয়ারি ১৯৯১ সংখ্যা), পৃ. ১৭।

১৩৬ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, যৌতুকের হিংস্র থাবা, পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর : ৩২ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা), পৃ. ৫২।

১৩৭ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, কুরবানীর শিক্ষা, দৈনিক ইনকিলাব, (ঢাকা: ১২ আষাঢ়, ১৩৯৮), পৃ.৮।

১৩৮ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, বিপন্নের সাহায্যে ইসলামের ডাক, দৈনিক ইনকিলাব, (ঢাকা : ২২ জৈষ্ঠ্য, ১৩৯৮), পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

ষোল. আশুরার তাৎপর্য

শরীফ সাহেব রচিত এ প্রবন্ধটি পক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার ৪২ বর্ষ, ১৫ জুলাই, ১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকার এ প্রবন্ধে কয়েকটি কারণে আশুরাকে অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ দিবস হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি আশুরার হৃদয়বিদারক কাহিনী উল্লেখ করে পাঠকদেরকে সত্য-ন্যায়ের পথে অটল থাকার আহ্বান জানান। আশুরা উপলক্ষে বিদআতী কাজকর্ম না করে শরীআত মোতাবেক নফল ইবাদাত করার পরামর্শ দিয়ে তিনি প্রবন্ধটি সমাপ্ত করেন।[১৩৯]

সতের. প্রসঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

এ প্রবন্ধটি পাক্ষিক তাবলীগ ৪২বর্ষ, ৩১ জুলাই ১৯৯১, ১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখক রাজধানীর অদূরে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে যত্রতত্র একটি জেলা শহরের স্টেডিয়াম ও পরিত্যক্ত বাড়িতে স্থানান্তর করার প্রতিবাদ জানিয়ে এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। তিনি কতিপয় কুচক্রী কর্তৃক সাংবাদিক সম্মেলনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সিনিয়র মাদরাসা বলে কটাক্ষ করার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি উল্লেখ করেন, ও.আই.সি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরম্য ভবন আজ পরিত্যক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় আজ নির্বাসিত। এটা জাতির জন্য সুফল বয়ে আনবে না। তিনি অচিরেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনরায় গাজীপুর ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনার দাবী জানিয়ে প্রবন্ধটি সমাপ্ত করেন।[১৪০]

আঠার. জাতীয় ঐক্য

এ প্রবন্ধটি পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার ৪২বর্ষ, ১৫ আগস্ট, ১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে লেখক দেশ গড়ার লক্ষে পারস্পরিক দ্বন্দ-কলহ, সংঘাত, কাদা ছিটাছিটি ও নৈরাজ্যের পথ পরিহার করে সৌহার্দ্য ও সমঝোতার ভিত্তিতে দেশ ও জনগণের সেবা করার আহ্বান জানান।[১৪১]

---

১৩৯ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, আশুরার তাৎপর্য, পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর : ৪২ বর্ষ, ১৫ জুলাই, ১৬শ সংখ্যা), পৃ. ১৭।

১৪০ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রসঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর: ৪২ বর্ষ, ৩১ জুলাই, ১৭শ সংখ্যা), পৃ. ২৮।

১৪১ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, জাতীয় ঐক্য, পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর : ৪২ বর্ষ, ১৫আগস্ট, ১৮শ সংখ্যা), পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ. মুসলিম বিশ্ব আজ কোন পথে

এ প্রবন্ধটি পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার ৪২বর্ষ, ৩১ আগস্ট, ১৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখক এ প্রবন্ধে মুসলামনদের অনৈক্য ও আদর্শহীনতার কারণে করুণ ও শোচনীয় অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, ইসলামের আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে মুসলামনরা আজ কাঙ্গালে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস আজ ইয়াহুদীদের কব্জায়। মুসলমানদের বুকের উপর দিয়ে বিজাতিদের বুলডোজার চলছে। মা-বোনের ইজ্জত আজ লুণ্ঠিত। দিকে দিকে আজ মজলুম মুসলমানের হাহাকার। এ অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লেখক মুসলমানদেরকে ইসলামী আদর্শের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হয়ে ঈমানী শক্তি দ্বারা বাতিলকে প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছেন।[১৪২]

বিশ. মহান ঈদে কুরবানী

এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার ৪২বর্ষ, ১৪ জুলাই ১৯৯১, ১৪শ সংখ্যায়। এ প্রবন্ধে লেখক মুসলমানদের জীবনের দুইটি উৎসবের মধ্যে দ্বিতীয়টি তথা কুরবানীকে ঈদে কুরবানী হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈলকে (আ) কুরবানী করতে পারায় শুকরিয়া স্বরূপ যে আনন্দ করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় এই ঈদ। তিনি সবাইকে আল্লাহর পথে জীবনোৎসর্গ করার মাধ্যমে চিরসুখ ও আনন্দ লাভের আহ্বান জানিয়ে প্রবন্ধটি সমাপ্ত করেন।[১৪৩]

একুশ. হজ্জ : ইশকে ইলাহী

শরীফ সাহেবের এ প্রবন্ধটি পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার ৪২বর্ষ, ৩০ মে ১৯৯১, ৩১শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে লেখক আল্লাহর ঘরে হজ্জ পালন, নবী-রাসূলগণের নিদর্শন স্বচোক্ষে দেখা এবং রাসূলুল্লাহ (স) এর রওযা মুবারক যিয়ারতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেম বৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়েছেন মুসলামনদের প্রতি।[১৪৪]

---

১৪২ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, মুসলিম বিশ্ব আজ কোন পথে, পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর : ৪২ বর্ষ, ৩১ আগস্ট, ১৯শ সংখ্যা), পৃ. ২৯।

১৪৩ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, ,মহান ঈদে কুরবানী, পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর : ৪২ বর্ষ, ১৪ জুলাই ১৯৯১, ১৪শ সংখ্যা), পৃ. ৩৮।

১৪৪ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, হজ্জ : ইশকে ইলাহী, পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর : ৪২ বর্ষ, ৩০০মে, ৩১শ সংখ্যা), পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

বাইশ. রমযান মুবারক

এ প্রবন্ধটি পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার ৪২বর্ষ, ১৫ মার্চ ১৯৯১, ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে রমযানের খায়ের ও বরকত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দলীলভিত্তিক আলোচনা স্থান পেয়েছে।[১৪৫]

তেইশ. ছারছীনা শরীফের মরহুম পীর হযরত মাওলানা আলহাজ্জ শাহ আবূ জাফর মুহাম্মদ সালেহ (রহ)

এ প্রবন্ধটি পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার ৪২বর্ষ, ৫ম ও ষষ্ঠ সংখ্যায় (একত্রে, স্মৃতি সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। লেখক এ প্রবন্ধে ছারছীনা শরীফের মহান পীর মুজাদ্দেদে যামান, হাদীয়ে মিল্লাত শাহ আবূ জাফর মুহাম্মদ সালেহ (রহ) এর জীবনী এবং শিক্ষাবিস্তার, জনসেবা, জাতীয় রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদানকে সংক্ষিপ্ত আকারে চিত্রিত করেছেন।[১৪৬]

চব্বিশ. নতুন প্রত্যয়

এ প্রবন্ধটি পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার ৪২বর্ষ, ৩০ নভেম্বর, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখক এ প্রবন্ধে পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকা ৪২বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে নতুন বছরের সাফল্যের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। লেখক দ্বীন প্রচারে পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার অবদান উল্লেখ করে ভবিষ্যতে এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা এবং উত্তরোত্তর উন্নতির সোপান বেয়ে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে প্রবন্ধটি সমাপ্ত করেন।[১৪৭]

পঁচিশ. অপরাধ বনাম গণআদালত

এ প্রবন্ধটি পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার ২৯বর্ষ, ১৮ আগস্ট ১৯৭৮, ১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখক এখানে গ্রাম-গঞ্জে বিচারের নামে স্থানীয় লোকদের সমন্বয়ে গঠিত গণআদালতের সমালোচনা করেন। লেখকের মতে, গণআদালতে সুবিচারের তুলনায় অন্যায় অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।[১৪৮]

---

১৪৫ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, রমজান মুবারক, পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর : ৪২ বর্ষ, ১৫ মার্চ ১৯৯১, ৮ম সংখ্যা), পৃ. .৩১।

১৪৬ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, ছারছীনা শরীফের মরহুম পীর হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শাহ আবু জা'ফর মুহাম্মদ সালেহ (রহ), পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর : ৪২ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃ. ৫৮।

১৪৭ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, নতুন প্রত্যয়, পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর : ৪২ বর্ষ, ৩০ নভেম্বর, ১ম সংখ্যা), পৃ. ৩২।

১৪৮ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, অপরাধ বনাম গণআদালত, পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর : ২৯ বর্ষ, ১৮ আগস্ট ১৯৭৮, ১৮শ সংখ্যা), পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

গ. ছোট গল্প ও ভ্রমণকাহিনী

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির শিশু-কিশোরদের উপযোগী অনেকগুলো ছোট গল্প রচনা করেছেন। এ গল্পগুলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত শিশু-কিশোর পত্রিকা মাসিক সবুজ পাতা, দৈনিক ইনকিলাব ও পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

তার ছোট গল্পগুলোর মধ্যে কয়েকটি গল্পের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

এক. বিরাট বিভ্রাট : সহজ সমাধান

এটি শরীফ সাহেব রচিত একটি চমৎকার ছোট গল্প। গল্পটি মাসিক সবুজ পাতা ১৯৯২ সনের ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পটির সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

এক ছিলেন আমীর। অঢেল ধন-সম্পদের মালিক। তিনি তিন পুত্র রেখে ইন্তিকাল করেন। তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি তিন ছেলেরা কে কি পাবে তিনি তার এক অসীয়তনামা রেখে যান। পিতার ইন্তিকালের পর পুত্রগণ অসীয়ত অনুযায়ী বাড়িঘর, বাগ-বাগীচা, জমি-জামা ও ব্যবসার মাল আসবাব বন্টন করে নেয়। কিন্তু একটি বিষয়ে তারা ঠেকে পড়ল। বন্টন করা সম্ভব হলো না। অসীয়ত নামায় লেখা আছে, "আমি যে উট কয়টি রেখে গেলাম তার অর্ধেক পাবে বড় ছেলে, মেজো ছেলে পাবে চার ভাগের এক ভাগ আর ছোট ছেলে পাবে আট ভাগের এক ভাগ। উটগুলো জীবন্ত রেখেই ভাগ করে নিতে হবে, বিক্রি করা বা জবাই করা চলবে না।"

উট ছিলো ৭টি। এগুলো সব জীবন্ত রেখে কি ভাবে ভাগ করা যায়। প্রথমেই ৭ এর অর্ধেক সাড়ে তিন। মহামুশকিল! তারা বুদ্ধিমান লোকদের কাছে এ বিষয়ে সাহায্য চাইল। কিন্তু কেউ এর সমাধান দিতে পারলো না। অবশেষে তারা এক প্রবীণ মুরব্বীর কাছে গিয়ে এ সমস্যার সমাধান চাইলো।

মুরব্বী এদের কথাবার্তা শুনে অর্ধো মুখে অনেকক্ষণ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "তোমাদের বাবা আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তোমরা বিপদে পড়ে আমার কাছে এসেছ। তোমাদের সমস্যার সমাধান করে দিতেই হচ্ছে। আচ্ছা যাও, আমার একটি মাত্র উট, তাও তোমাদের সাতটির সঙ্গে রেখে দিলাম, এখন উটের সংখ্যা কত হলো? আটটি হলোতো?"

পুত্রগণ উৎফুল্ল হয়ে বলল, "জি হাঁ আটটিই হয়েছে।"

মুরব্বী বললেন, "যাও, বড় মিয়া ৮টির অর্ধেক ৪টি, মেজো মিয়া চার ভাগের এক ভাগ দুটো, আর ছোট মিয়া আট ভাগের এক ভাগ ১টি নিয়ে যাও।" পুত্রগণ যার যার অংশ মত উট নিয়ে নিলো। দেখা গেল একটি উট তখনও সেখানে রয়ে গেছে। পুত্রগণ চেয়ে আছে, দেখি মুরব্বী ঐ উটটি কিভাবে ভাগ করেন। মুরব্বী বললেন, "চেয়ে আছো কেন? নিজ নিজ ভাগ নিয়ে চলে যাও। আমি

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের সাতটি উটের সংগে আমার যে উটটি রেখেছিলাম তা নিয়ে আমিও বাড়ি চলে যাই। সুখে থাকো! আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন!"[১৪৯]

দুই. কার ছেলে?

এ গল্পটি পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার ২২শ বর্ষ, ১৫ আশ্বিন ১৩৭৮, ২০শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

কার ছেলে

একটি শিশু নিয়ে দু'জন মেয়ে মানুষের মাঝে ঝগড়া। এ বলে 'শিশু আমার' আর ও বলে 'শিশু আমার'। খালি মুখেরই দাবী, কেউ কোন সাক্ষী বা নিদর্শন দাড় করাতে পারছে না। ঝগড়া যখন তুমুলে পৌছল তখন দু'জনই স্থানীয় কাযী সাহেবের দরবারে বিচারের জন্য হাযির হল। দু'জনাই কাযী সাহেবের কাছে জোর গলায় নিজ নিজ দাবী জানাল।

কোন সাক্ষী নেই, কোন বিশেষ নিদর্শন নেই। কাযী সা'ব হয়রান। তিনি কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে জল্লাদকে ডাকলেন আর বললেন, "যাও, আর তো কোন উপায় দেখছি না, শিশুটিকে কেটে দু'টুকরো করে দু'জনকে দিয়ে দাও।"

কাযীর রায় প্রকাশ হলে দরবার স্তব্ধ হয়ে গেল। এ কি কথা! একটি মানব-শিশু, কত বিরাট সম্ভাবনা তার সামনে। এ বেঁচে থাকলে দেশ, সমাজ ও জাতির কত বড় কল্যাণই-না হতে পারত। আর কাযীর বিচারে সে আজ দ্বিখন্ডিত হবে? দরবারের কর্মচারী ও দর্শকরা শিশুটির শেষকৃত্য দেখার জন্য একবার জল্লাদের আজরাঈলী চেহারার দিকে, আর একবার তার চকচকে তলোয়ারের দিকে, আবার চন্দ্র-কণা সদৃশ নিষ্পাপ শিশুটির দিকে তাকাতে লাগল। তাকাতে তো লাগল কিন্তু তাদের অজ্ঞাতেই তাদের চোখের দ্বার যেন বন্ধ হয়ে পড়ে। কি করে তারা এ নির্মম দৃশ্য দেখবে।

---

১৪৯ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, বিরাট বিভ্রাট: সহজ সমাধান, মাসিক সবুজ পাতা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঈদ সংখ্যা ১৯৯২), পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

বিচার-কক্ষ স্তব্ধ। আদালতের বাতাসও যে জমাট বেঁধে গেছে। একজন মেয়ে মানুষ ঘাড় নেঁড়ে বাতাসের স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে কাযীর রায়ে সম্মতি জানাল। কিন্তু অপর জনা চিৎকার করে কেঁদে উঠল আর বলতে লাগল, "হুযূর কাজী সা'ব, আপনি ওকে কেটে ফেলার হুকুম দেবেন না। এ-ই যদি বিচার হয় তবে আমি আপনার রায়ের আগেই আমার নালিশ তুলে নিচ্ছি। আমি ওর প্রাণ-ভিক্ষা চাই, ও বেঁচে থাক।

এবার কাযী সাব প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করে ফেললেন। তিনি মৌনা মেয়ে লোকটির শাস্তি স্বরূপ কয়েক ঘা বেতের হুকুম দিলেন আর শিশুটিকে তার প্রাণ-ভিখারিণী মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন।[১৫০]

তিন. খলিফার দরবারে সাহসী কায়েদী

এ গল্পটি মাসিক সবুজ পাতা, আগস্ট ১৯৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ গল্পে লেখক খলিফা হারুন-অর-রশীদের দরবারে একজন কায়েদীর সাহসী উত্তরের মাধ্যমে শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার কাহিনী অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাষায় তুলে ধরেছেন।[১৫১]

চার. হযরত আলীর (রা) সূক্ষ্ম হিসাব

এ গল্পটি মাসিক সবুজ পাতা, মার্চ ১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ গল্পে লেখক হযরত আলীর (রা) জ্ঞান-গরিমা, গণিতশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ দখল এবং ফরায়েয সম্পর্কিত সমাধানে তাঁর পারদর্শিতাকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন।[১৫২]

পাঁচ. ত্রেত্রিশ বছরে মাত্র আটটি কথা শিখেছি

এ গল্পটি মাসিক সবুজ পাতা, ডিসেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ গল্পে লেখক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক আটটি মহান উপদেশ শিক্ষা গ্রহণের কাহিনী তুলে ধরেছেন।[১৫৩]

---

১৫০ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, কার ছেলে, পাক্ষিক তাবলীগ, (পিরোজপুর: ২২ বর্ষ ১৫ আশ্বিন ১৯৭৮, ২০শ সংখ্যা), পৃ. ১৩।

১৫১ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, খলিফার দরবারে সাহসী কায়েদী, মাসিক সবুজ পাতা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৯১ সংখ্যা), পৃ. ১২।

১৫২ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, হযরত আলীর সূক্ষ্ম হিসাব, মাসিক সবুজ পাতা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৯২ সংখ্যা), পৃ. ১৮।

১৫৩ শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, তেত্রিশ বছরে মাত্র আটটি কথা শিখেছি, মাসিক সবুজ পাতা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯১ সংখ্যা), পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রমণ কাহিনী

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির বিদেশ ভ্রমণ করে এসে একটি ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেছেন। এর শিরোনাম হলো : **ইসলামী ফিকহ একাডেমী দেখে এলাম**। এটি ১০ মার্চ ১৯৯৪ তারিখের দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ ভ্রমণ কাহিনীতে শরীফ সাহেব ইসলামী ফিকহ একাডেমীর সাজ-সজ্জা, আসন ব্যবস্থা, অভ্যর্থনা এবং কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[১৫৪]

১৫৪ মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, ইসলামী ফিকহ একাডেমী দেখে এলাম, দৈনিক ইনকিলাব, (ঢাকা: ১০ মার্চ, ১৯৯৪), পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনূদিত গ্রন্থ ও সম্পাদনা কর্ম

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ফার্সি ভাষায় রচিত শেখ সা'দীর কারীমা বাংলা ভাষায় কাব্যানুবাদ করেন। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ ও পত্রিকার সম্পাদনা কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। এ পরিচ্ছেদে সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

ক. অনূদিত গ্রন্থ

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের অনূদিত গ্রন্থের একটি পর্যালোচনা নিম্নরূপ :

এক. কাব্যানুবাদ কারীমা

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ছিলেন একাধারে একজন প্রখ্যাত আলেম, বহু ভাষাবিদ পন্ডিত, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও কবি। ফার্সি ভষায় রচিত শেখ সা'দী[১৫৫]র 'কারীমা' কাব্যগ্রন্থকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলা ভাষায় কাব্যানুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

---

১৫৫ **শেখ সা'দীর পরিচয় :** সৌন্দর্যের লীলাভূমি পারস্যের শিরাজ নগরীর তাউস মহল্লায় ৫৭৫ হিজরিতে শেখ সা'দী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম মাইমুরা খাতুন। শেখ সা'দীর পিতা সৈয়দ আব্দুল্লাহ শিরাজের তদানিন্তন বাদশাহ সা'দ জঙ্গীর রাজ-কর্মচারী ছিলেন। তিনি (সৈয়দ আবদুল্লাহ) অত্যন্ত ধর্মানুরাগী ও তরীকতপন্থী ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রের নাম রাখেন শরফুদ্দীন এবং ডাক নাম দেন মুসলিহুদ্দীন। পরবর্তীতে শরফুদ্দীন যখন রাজ দরবারে অবস্থান করে কবিতা লেখা আরম্ভ করেন তখন তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী বাদশাহর নামের সাথে সম্বন্ধ রক্ষার জন্য তার নামের সাথে সা'দী যুক্ত করেন। এর পর ধীরে ধীরে তিনি শেখ সা'দী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

বাল্যকালে তিনি মায়ের কাছে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন। এর পর তাঁর পিতা তাঁকে স্বীয় পীর মুসলিহুদ্দীন মাসালীর নিকট পড়াশুনার জন্য অর্পণ করেন। এখানে দুই বছরের মধ্যে তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্ত করে ফেলেন। শেখ সা'দীর বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি বাবা-মার সাথে হজ্জে গমন করেন। হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন। বালক শেখ সা'দীর লালন-পালনের ভার পড়ল তার মায়ের উপর। মা অভাব-অনটনের মাঝে দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন। কিন্তু শেখ সা'দীর দৃঢ় মনোবল তাঁর মাকে শক্তি ও সাহস যোগিয়েছে।

মা তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন শিরাজের আজদিয়া মাদরাসায়। কিছু দিন পড়ালেখা করার পর শিরাজে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে শেখ সা'দী বাগদাদ গমন করে সেখানকার নিযামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসায় দীর্ঘ দিন পড়াশুনা করে শেখ সা'দী কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, উসূল, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর তিনি আধ্যাত্মিক ইলম অর্জনে ব্রতী হন। শেহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর বায়আত গ্রহণ করে তিনি তরীকা অনুশীলন করতে থাকেন এবং কামালিয়াতের শীর্ষে পৌঁছতে সক্ষম হন। অতঃপর শায়খের অনুমতি নিয়ে তিনি দেশ ভ্রমণে বের হন। তিনি একেধারে স্থল পথে খোরাসান, তুর্কিস্তান, বোখারা, তাতার, বলখ, কাশগড়, ভারত, ইরাক, আজার বাইজান, শাম, ফিলিস্তিন, এশিয়া মাইনর, ইসপাহান, তিবরীজ, বসরা, কুফা, তিবরালিস, দামেশক, মধ্য ইতালী, মিশর, হাবস প্রভৃতি স্থানে এবং জলপথে পারস্য উপসাগর, ওমান সাগর, লোহিত সাগর, রোম সাগর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি শিরাজ শহর থেকে অর্ধ মাইল দূরে খানকা তৈরী করে সেখানে জীবনযাপন করেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন এসে সেখানে তাঁর সাথে দেখা করত। সেখানেই তিনি ৬৯১হিজরি মোতাবেক ১২৯২খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো: মাজালিসে খামসাহ, নসীহাতুল মুলুক, রিসালায়ে আশিকিয়ান, কিতাবে মারাসি, তাজিয়াত, আততাইয়্যিবাত, কারীমা, বুস্তাঁ, গুলিস্তাঁ ইত্যাদি।

দ্র. আবু মুসা মো: আরিফ বিল্লাহ ও তারিক সিরাজী, শায়খ সা'দী (র), জীবন ও সাহিত্যকর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০০০), পৃ. ১০১ - ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ গ্রন্থটি ১৯৬৬ সালে শরীফ পাবলিকেশন্স, রহমতপুর, রুনশী, বরিশাল কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পরিবেশনা করেন ছারছীনা মাদরাসা লাইব্রেরি, পিরোজপুর এবং এমদাদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা। গ্রন্থটি পান্দেনামা কারীমা'র[১৫৬] মনোজ্ঞ অনুবাদ। পারস্য কবি আল্লামা শেখ সা'দী (রহ.) দুনিয়ার কিশোর কিশোরীদের জন্য এক অমূল্য সওগাত উপস্থাপন করেছেন এ গ্রন্থে। এ যেন পারস্য সিন্দুকে আটকে রাখা হয়েছে ছোট একটি মলাটের ভিতর। কারীমা বিশ্বসাহিত্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

---

১৫৬ **কারীমা:** কারীমা এমন একটি কাব্যগ্রন্থ; যা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট অতি প্রিয় এবং সুখপাঠ্য। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের জন্য এ কাব্যগ্রন্থটি অতি চমৎকার আনন্দ ও প্রেয়ণাদায়ক। এতে কাব্যিক ভাষায় উপদেশাবলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে সাজানো হয়েছে। ফলে কিশোর-কিশোরীরা একে আগ্রহ সহকারে পড়ে এবং তাদের পক্ষে মুখস্ত করা সহজতর হয়। লেখকের ভাষায় - "শেখ সা'দীর এই অমূল্য উপদেশগুলি হবে বালক-বালিকাদের সারা জীবনের পথের দিশারী। সুতরাং এগুলো মুখস্ত রাখাই সমীচীন। আর কবিতা মুখস্ত রাখা সহজ।" কারীমাতে যে সব নীতিবাক্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা আমাদের কিশোর ও যুব শ্রেণীর নাগরিকদের চরিত্র গঠনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানব চরিত্রের প্রহণীয় উপাদান যেমন- বিনয়, দয়া, দানশীলতা, আত্মশাসন, জ্ঞানার্জন, ইনসাফ, অল্পে তুষ্টি, বিশ্বস্ততা, কৃতজ্ঞতা, সততা, ধৈর্য, ইবাদাত-বন্দেগি ইত্যাদির মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। যথা- দানের মহিমা সম্পর্কিত কয়েকটি চরণ :

সাখাওয়াত	তামারে	সোনা করে ভাই
সাখাওয়াত	সমস্ত	বেদনার দাওয়াই

বিনয় সম্পর্কিত দুটি চরণ

বিনয়ই	মানবে	দানে যশঃ মান
বিনয়ই	নেতাদের	নায়কী নিশান

বিদ্যার্জন সম্পর্কিত চরণ

মোম হেন	গলা চাই	জ্ঞানান্বেষণে
বিদ্যাহীন	কভু না	খোদাকে চিনে

ইবাদাত ও সচ্চরিত্র সম্পর্কিত দু'টি চরণ

শরীয়ত	সম্মত	চরিত্র যাহার
হাশরের	মাঠে তার	নাহি কোন ডর

কারীমার এসব চরণ আমাদের শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। কুরআন ও হাদীসের পরই আমাদের অনুকরণীয় বিষয় হলো বিখ্যাত ওলী ও জ্ঞানীদের উপদেশ। কারীমার লেখক যেমন ছিলেন মহান ওলী তেমনি জ্ঞানী। কারীমায় তিনি যে সব উপদেশ তুলে ধরেছেন তা অনুকরণীয় এবং সাফল্যময় জীবন গঠনের জন্য উপাদান স্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

এর বিষয়বস্তু ও সাহিত্য এত উন্নত যে, বিশ্বের অধিকাংশ ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য 'কারীমা' এর দুয়ার খুলে দিয়েছেন মাওলানা শরীফ আবদুল কাদির। শরীফ সাহেবের ভাষায়- "আমি কারীমা-এর অনুবাদ করলাম এই জন্য যে, আমি পাকিস্তানী (তৎকালীন পাকিস্তানী বর্তমান বাংলাদেশী) বালক-বালিকাদেরকে ভালবাসি আর শেখ সা'দীকে শ্রদ্ধা করি। শেখ সা'দী দুনিয়ার বালক-বালিকাদের জন্য যে অমূল্য সওগাত রেখে গেছেন, দুনিয়ার ভিন্নভাষী পন্ডিতগণ তা তাঁদের স্বভাষী বালক-বালিকাদের জন্য খুলে দিয়েছেন। বালক-বালিকারা হৈ হুল্লোড় সহকারে কাড়াকাড়ি করে এর স্বাদ উপভোগ করেছে। আমিও চেয়েছি যে, বাঙালি বালক-বালিকারা ঐ সওগাত হতে বঞ্চিত না হোক।"[১৫৭] কাব্যানুবাদ কারীমা'র একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নরূপ :

কারীমার অনুবাদক মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের ভাষাজ্ঞান ও কাব্য প্রতিভা বিস্ময়কর। ফার্সি কবিতাকে ফার্সি ছন্দের সাথে মিল রেখে তিনি পুরো গ্রন্থটিকে কাব্যানুবাদ করেছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে। ফার্সি ভাষার সুর ও ছন্দ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এর স্বাদচ্ছাদন থেকে বাঙালি বালক-বালিকারা যেন বঞ্চিত না হয় সে জন্যই অনুবাদক কবি এর কাব্যানুবাদ করতে প্রয়াসী হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "ফার্সি ছন্দে কাব্যানুবাদ করলাম এই জন্য যে বিদায়োন্মুখ ফার্সি ভাষা এদেশ হতে চলে গেলেও এর হৃদয়গ্রাহী সুর-কাকলি যেন বিদায় হতে না পারে। তাই পড়ার ছন্দ নির্দেশ করার জন্য কবিতার প্রত্যেক পদকে ভাগ ভাগ করে লিখিত হয়েছে। এমনকি পাঠ-ছন্দের খাতিরে কোন কোন স্থানে এক একটি শব্দকে ভেঙ্গে দুই ভাগে লেখা হয়েছে।"[১৫৮]

অনুবাদকের কাব্যানুবাদে বাংলা ভাষার যথাযথ শব্দাবলি যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি এর সুর ও ছন্দ সুখপাঠ্য এবং আর্কষণীয়। অনুবাদক একে বাংলা ভাষার সুর ছন্দের সাথে তাল না মিলিয়ে ফার্সি ছন্দের সাথে তাল মিলিয়েছেন। কাব্যানুবাদক গ্রন্থের সূচনাভাগে 'সতর্কতা' শিরোনামে লিখেছেন, "এ অনুবাদ বাংলা ছন্দের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত না হয়ে ফার্সি ছন্দ ও পাঠ-লহরীর পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত হয়েছে।

---

১৫৭. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, কাব্যানুবাদ 'কারীমা' (বরিশাল : শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬), পৃ. ৫।

১৫৮. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন - উদাহরণ স্বরূপ :

كريما به بخشاني بر حال ما * كه هشتم اسير كمند هوا

এর অনুবাদ এরই সুর-ছন্দের সাথে মিল রেখে করা হয়েছে -

দয়াময় দয়াদান করহ আমায়
বিধেছি লালসার জালে-অসহায়।

কাজেই এ কবিতাগুলোকে বাংলা ছন্দের দিক দিয়ে বিচার করলে চলবে না, মূল ফার্সি কারীমার বিশেষ ছন্দেই এই বাংলা কবিতা পড়তে হবে।"[১৫৯]

মূল গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কবিতাংশগুলোকে আলাদা আলাদা শিরোনামে লেখা না হলেও অনুবাদক কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে এর বিভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম দিয়েছেন। যেমন- মুনাজাত, নাতে রাসূল, আত্মশাসন, দয়ার মহিমা, কৃপণের হীনতা, বিনয়ের মহিমা, অহঙ্কারের নিন্দা, বিদ্যার মহিমা, মুর্খ সঙ্গ পরিহরণ, ইনসাফ, অত্যাচারের নিন্দা, অল্পে তুষ্টি, লোভ-লালসা, ইবাদাত-বন্দেগি, শয়তানের অনিষ্টকারিতা, বিশ্বস্ততা, কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, সততা, মিথ্যাবাদিতার দোষ, আল্লহর সৃষ্টি মহিমা, পরমুখাপেক্ষিতা, প্রেম-সুরা ইত্যাদি। অনুবাদের ক্ষেত্রে শরীফ সাহেবের দক্ষতা অবিস্মরণীয়। ষাটের দশকে যখন বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্যের ভান্ডার তেমন সমৃদ্ধ ছিল না, তখন শরীফ সাহেব কৃত কাব্যানুবাদ কারীমা আমাদের শিশু-কিশোরদের সাহিত্যভান্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। শরীফ সাহেবের কাব্যনুবাদ কারীমা যুগ যুগ ধরে সুখপাঠ্য হিবেবে থাকবে।

---

১৫৯. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

খ. সম্পাদনা কর্ম

শরীফ সাহেব সম্পাদক হিসেবে ছিলেন বহু বছরের অভিজ্ঞ। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তকের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা ও পুস্তক সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

এক. পাক্ষিক তাবলীগ

শরীফ সাহেব ছারছীনা শরীরফের দাদা হুজুর হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (রহ) প্রতিষ্ঠিত পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকার আজীবন সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি ১৯৫০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় সূচনা লগ্ন থেকেই শরীফ সাহেব এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি এ পত্রিকাটিকে দেশের সাধারণ মুসলমানদের আব্বার খোরাকে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ পত্রিকায় আলকুরআনের তাফসীর, হাদীসের আলো, ফতোয়ায়ে দারুচ্ছুন্নাত ও পাক্ষিক সংবাদ শিরোনামে কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি সংখ্যায় কয়েকটি করে প্রবন্ধ ছাপা হয়। উক্ত নিয়মিত বিভাগসমূহ ও প্রবন্ধাবলি সম্পাদনা ছাড়াও শরীফ সাহেব প্রতিটি সংখ্যায় সম্পাদকীয় লিখতেন। তিনি সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করতেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। তিনি শাসকদের অন্যায় ও ইসলামবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রতিবাদী সম্পাদকীয় লিখে প্রতিবাদ জানাতেন এবং অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখতেন। সম্পাদকীয় ছাড়াও অধিকাংশ সংখ্যায়ই তিনি প্রবন্ধ ও কবিতা লিখতেন। তাঁর সম্পাদিত উক্ত পত্রিকাটি বাংলাদেশের সকল থানাসহ ভারত, পাকিস্তান, ইরাক, সৌদি আরব, কুয়েত, মিশর প্রভৃতি দেশে নিয়মিত পাঠকদের নিকট সমাদৃত ছিল। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি এ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ইনতিকালের পর এখনও পর্যন্ত উক্ত পত্রিকাটির কোন সম্পাদক নিযুক্ত করা হয় নি কেবল তাঁর সমমানের সম্পাদকের অভাবেই। (বর্তমানে একজন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রয়েছেন)।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. দীনিয়াত

'দীনিয়াত' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বৃহৎ ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ। ৪৫২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ গ্রন্থটির সংকলন ও সম্পাদনায় যে সব প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন নিয়োজিত ছিলেন, শরীফ সাহেব ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। উক্ত গ্রন্থের সম্পাদনা কমিটির তিনি ছিলেন সভাপতি। বস্তুত তিনি ছিলেন দীনিয়াত প্রকল্পের উদ্যোক্তা। ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের বোর্ড অব গভর্নর্সের সদস্য পদে নিয়োগ লাভ করে এ মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি সাধারণ মুসলমানদের ঈমান, আকীদা ও দৈনন্দিন জীবনের মাসআলা-মাসাইল শিক্ষার সুব্যবস্থা করার জন্য বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে দীনিয়াত প্রকল্প চালু করে এর অধীনে 'দীনিয়াত' নামক পুস্তক সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। 'দীনিয়াত' গ্রন্থটি মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আকাইদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহারাত, তৃতীয় অধ্যায়ে নামায, চতুর্থ অধ্যায়ে রোযা, পঞ্চম অধ্যায়ে যাকাত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে হজ্জ, সপ্তম অধ্যায়ে বিবাহ, অষ্টম অধ্যায়ে তালাক, নবম অধ্যায়ে কুরবানী এবং দশম অধ্যারয়ে ওয়াকফ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির ভাষা খুবই সহজবোধ্য। এটি সাধারণ পাঠকদের জন্য লিখিত। গ্রন্থটি ১৯৯৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০০৪ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

তিন. পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম

এ গ্রন্থটি ২০০৩ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত। এর নাম 'মুআশারাতী মাসায়েল'। মূল গ্রন্থটির লেখক বিশিষ্ট আলেম মাওলানা বুরহানুদ্দীন সাম্বলী। গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ। শরীফ সাহেব এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। গ্রন্থটির সূচনায় লেখা আছে "সম্পাদনা করেছেন মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির।" যদিও সম্পাদকের জীবদ্দশায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নি। গ্রন্থটি মুসলমানদের পারিবারিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক সমাধান দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি ২২৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

চার. ফাতাওয়া ও মাসাইল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ফাতাওয়া ও মাসাইল গ্রন্থের রূপরেখা প্রণয়ন করে সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করার কিছুদিন পরই শরীফ সাহেব মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন এ গ্রন্থের সম্পাদনা পরিষদের চেয়ারম্যান। তার অসুস্থতার কারণে উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পদ গ্রহণ বায়তুল মুকাররমের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক। গ্রন্থটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং জীবন গঠনে সহায়ক।

পাঁচ. আল হেলাল

এটি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার বার্ষিকী। উক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ থাকাকালীন শরীফ সাহেবই এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতেন। আল হেলালে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখতেন। তিনি একটি চমৎকার সম্পাদকীয় লিখে শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্রদের সাহিত্য চর্চায় প্রেরণা যোগাতেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরের গোটা জীবন ছিল ইসলাম ও মানবতার সেবায় নিয়োজিত। ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির তুলনায় তিনি জাতির সেবাকে প্রাধান্য দিতেন। কর্ম জীবনে তিনি অর্থোপার্জনকে নগণ্য মনে করতেন। ছাত্রদের জীবন গড়ায় তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর প্রত্যক্ষ পাঠদান ও তত্ত্বাবধানে অসংখ্য শিক্ষক, মুফাস্‌সির, ফকীহ, আদীব, উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ নিজেদের জীবনকে প্রস্ফুটিত করে ধন্য হয়েছেন। ছাত্রদের জীবন গঠনের জন্য তিনি নিজেকে করেছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিকশিত। ইসলামি উলূম ও ফুনুন ছাড়াও তিনি ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সাহিত্যের গ্রন্থাদি নিয়মিত অধ্যয়ন করে চতুর্মুখী জ্ঞানের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছিলেন। কর্মজীবনে এবং অবসর গ্রহণের পর তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণে ব্রতী ছিলেন। কখনো ওয়াজ নসীহত, কখনো সাহিত্য রচনা, কখনো সভা সেমিনারে বক্তৃতা প্রদান আবার কখনো জাতীয় প্রচার মাধ্যমে আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি ইসলামের কথা, নৈতিকতার কথা, মানব কল্যাণের কথা পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের কর্ণকুহরে। বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বে তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন, জাতীয় সঙ্কট নিরসন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাঁর পদচারণা ছিল প্রশংসনীয়। দেশের সুবৃহৎ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে এর বোর্ড অব গভর্নর্সের সদস্য পদ লাভ করে উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি যুগান্তকারী অবদান রাখতে সক্ষম হন। ইসলামি ব্যাংকিংয়ে তাঁর অবদান অসমান্য। এমনকি দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আপন মেধা ও যোগ্যতার বলে। ও. আই. সি.র ফিকহ্ একাডেমীর অধিবেশনে যোগদান করে যুগ সমস্যার সমাধানে অবদানের কারণে তিনি একাধিকবার বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হন। ভিন্ন দেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাঙালি পাঠকদের নিকট সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে তিনি কয়েকটি বিদেশী গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ করেন। এ জন্য তিনি জ্ঞানী-গুণী ও পন্ডিতদের নিকট প্রশংসিত ও সমাদৃত হন। এছাড়া পুস্তক রচনা এ সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে তিনি বাংলাভাষী পাঠকদের তিনি অমর হয়ে আছেন। আরবি ও বাংলাভাষায় রচিত তাঁর ১৯টি গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে নি:সন্দেহে বলা যায়, আরবি ও ইসলামি সাহিত্যে তাঁর অবদান অসামান্য। সার্বিক বিবেচনায় আমরা শরীফ সাহেবের জীবনকে সার্থক জীবন বলতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির

মাসিক কুড়িমুকুল, সেপ্টেম্বর-২০০১ সংখ্যাটি মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির স্মৃতি সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এ সংখ্যায় নিম্নের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শরীফ সাহেব সম্পর্কে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেন।

১. আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ মোহেবুল্লাহ

দাদা হুজুর কেবলার জামাতা, আমার ফুফাজান মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (র) ছিলেন আমার মরহুম ওয়ালেদ সাহেব কেবলার আজীবন সহচর। তিনি ছিলেন ছারছীনা দরবার শরীফের একটি স্তম্ভ।

২. হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী

শরীফ সাহেব আমার চেয়ে দশ/বার বছরের ছোট। তবুও আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। মরহুম হুজুরের পার্শ্বে থেকে আমরা একত্রে কাজ করতাম। কিতাবী দর্‌স ছাড়াও কবিতা সাহিত্যেও তাঁর দখল ছিল। কোন কোন বিষয়ে তিনি আমার থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন।

৩. মাওলানা এম.এ মান্নান

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (র) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক অসাধারণ মনীষী। সুন্নতে নববীর খাঁটি অনুসারী এমন অমায়িক ও উন্নত চরিত্রের ব্যক্তিত্ব সত্যিই দুর্লভ।

৪. অধ্যক্ষ আব্দুর রব খান

শরীফ সাহেবের মধ্যে সাহাবী চরিত্র ছিল। ছারছীনার উপাধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর অধীনে অনেক বছর কাজ করেছি। কোন দিন তিনি আমার উপর ক্ষমতা দেখিয়ে কৈফিয়ত তলব করেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

৫. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

মর্দে মুমিন শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (র)ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ জ্ঞানী, দক্ষ প্রশাসক, দরদী শিক্ষক, ব্যতিক্রমী লেখক, মায়াময়ী অভিভাবক, অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন পন্ডিত, বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি ছারছীনার আ'লা হযরত শাহ্ সূফী মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (র)-এর গভীর সান্নিধ্য লাভের দরুণ একদিকে তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি নিখুঁতভাবে অনুধাবন ও অনুসরণ করার সুয়োগ পেয়েছিলেন, অন্যদিকে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তা'লীম, তালকীন ও তাব্লীগের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

শরীফ সাহেব তাঁর জীবনে যে আদর্শ লালন করে গেছেন, যে শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন, যে মিশন তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থে বিধৃত করে গেছেন, যারা আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি, তাঁকে ভালবাসি তাদের কর্তব্য তা অনুসরণ করা। তবেই তাঁকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

৬. প্রফেসর ড. আ. র . ম. আলী হায়দার

জ্ঞান সাধক শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (র) এক বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ছিলেন। স্বল্প পরিসর জীবনে বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ সাধনে তিনি বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে পদচারণা করেন। সাহিত্য ও কাব্য চর্চা, সমাজসেবা, সংগঠন প্রতিষ্ঠা, ইসলাম প্রচার ও জনসভায় বক্তৃতা প্রদান, প্রশাসন ও অধ্যাপনায়, সম্পাদনা ও দেশ-বিদেশে প্রতিনিধিত্ব করা ইত্যাদিতে তাঁর কালজয়ী প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এই ইসলামী চিন্তবিদ জ্ঞান সাধনাকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মানবজীবন সৃজনশীল ও গতিময়-- তিনি ছিলেন এর মূর্ত প্রতীক।

৭. ড. মুহম্মদ আফাজ উদ্দিন

বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় সুপন্ডিত শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (র) ছিলেন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি একজন প্রখ্যাত আবিদ, জাহিদ ও তাকওয়াসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মত হৃদয়বান, সদালাপী, বিনয়ী, সবান্ধব ও কল্যাণকামী মানুষ সমাজে

Dhaka University Institutional Repository

বিরল। নির্ভোল, নিরহংকার মহান এই মনীষীর আদর্শ চির জাগরুক থাকুক এটাই আমার কাম্য।

৮. মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান

আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (র) ছিলেন একাধারে লেখক, কবি, দীনের হাদী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ। এমন ভদ্র, নম্র, উদার মিষ্টভাষী, অমায়িক, প্রাণবন্ত, সদা হাস্যমুখ, স্নেহশীল, মার্জিত রুচির মানুষ জীবনে আমি খুব কমই দেখিছি। বহু বিচিত্র গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মাঝে। অথচ তিনি ছিলেন অহংকার বিবর্জিত, বিনয়ী এক মাটির মানুষ। শরীফ সাহেব ছিলেন সত্যিকার অর্থেই শরীফ। আমল-আখলাকে, লেবাসে-পোশাকে, সীরাতে-সূরতে তিনি ছিলেন খাঁটি নায়েবে নবী (স)। তিনি ছিলেন তাকওয়ার জলন্ত প্রতীক।

দেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁদের মধ্যে আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (র) নিঃসন্দেহে অন্যতম।

৯. মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন

শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির এক মহান ব্যক্তিত্ব। আর তিনি হলেন বিরল কৃতিত্ব ও সাফল্যের অধিকারী, দেশবরেণ্য জাতির বিবেক, ও. আই. সি. ফিক্‌হ একাডেমীর বাংলাদেশের প্রতিনিধি, শতাব্দীর ঐতিহ্যধন্য আধ্যাত্মিক বিদ্যানিকেতন হাজার হাজার নেছার ছালেহের সৈন্য প্রকাশনের বিশাল কারখানা ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসা দ্বিতীয় অধ্যক্ষ । অশ্লীল সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকার ছয়লাবে দেশ যখন ছেয়ে গিয়েছিল সেই দুর্যোগ মুহূর্তে শরীফ সাহেব ছিলেন এ সবের বিরুদ্ধে সার্থক নীরব বিপ্লব। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পাক্ষিক তাবলীগ' পত্রিকাও এ ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রেখেছে। আমার দৃষ্টিতে তাঁর আধ্যাত্মিক দিকটা হ'ল পীর নেছার উদ্দীন আহমদ (র)-এর মত, আর প্রতিভার দিকটা ছিলো অনেকটা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ন্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১০. অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (র) ছিলেন বাংলার এক খ্যাতনামা লেখক, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, মুফতী ও শ্রদ্ধাভাজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। ইসলামী আদর্শকে সুমন্নত রাখা, দ্বীনি ইলম শিক্ষাদান, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন নিঃসন্দেহে জাতি তা যুগ যুগ ধরে স্মরণ রাখবে।

আমার কর্মজীবনে এ পর্যায়ে পৌছার পিছনে যাঁদের প্রেরণা, আন্তরিক দু'আ ও সহযোগিতা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ছিলেন অন্যতম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

১১. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম

শরীফ আবদুল কাদিরের মধ্যে সূফী গুণাবলি বর্তমান ছিল। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম দৃঢ় স্তম্ভ ছিলেন। আমি তাঁকে দুলা ভাই বলে ডাকতাম এই জন্য যে, তাঁর শ্বশুর সাহেব কিবলা যাঁর খলীফা ছিলেন আমার আব্বা হুযূর কিবলা ছারিয়াপুর শরীফের পীর সাহেব কিবলা হযরত মাওলানা শাহ সূফী আলহাজ্জ তোয়াজউদ্দীন আহমদ (র)ও ফুরফুরা শরীফের সেই মুজাদ্দিদে যামান (রহ)-এর খলীফা ছিলেন।

.....

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদিত কবিতা মালা

দীপটি নিভে গেল

মু. সিরাজুম মুনীর তাওহীদ

দীপটি নিভে গেল ধপ করে
নিভে গেল বলছি কেন?
অবিনাশী প্রজ্ঞা যে দীপের জ্বালানী
সলতে যার বিদগ্ধ জ্ঞানের মশাল
কালের পাবন কি কভু নিভাতে পারে সে দীপ?
পৃথিবীর কোন এক অন্ধগলির
পথ ভোলা দিশেহারা মানুষগুলোকে
পথের বাঁকগুলো উতরে দিতে
হিরন্ময় স্বচ্ছ আভায়
জ্বলে উঠেছিল এ দীপ।
এ দীপ জ্বলে উঠেছিল
কালো রাত্রির অচল পর্দা ছিড়ে
ভীরু নাবিকের পাঁজরে
এগিয়ে চলার মন্ত্র ফুঁকে দিতে
আমরা হতভাগারা এ দীপ্ত দীপের জন্য
গড়তে পারি নি একটি বাতিঘর
তাই বুঝি ফেরদৌসের শূন্য বাতিঘরে
তাকে সযতনে তুলে রাখা হল।
মাঝে পড়ে রল ব্যথার এক
অথৈ অশ্রু সরোবর
ব্যথাহত নাবিকের স্মৃতি তবুও
অস্টোপাসের মত করে রেখেছে
তাঁর আলোকোজ্জ্বল দিশা
যার দ্যুতি অবারিত
কোথায় সুদূর মঞ্জিল।

Dhaka University Institutional Repository

শরীফ তুমি

আবু তাহের খান শামীম

শরীফ তুমি মোদের মাঝে সবার শ্রদ্ধাভাজন
তোমাকে হারিয়ে হারাল জাতি পরম প্রিয় ধন।
জাতির জন্য চয়ন করিলে কত যে পুস্তক
বইয়ের পাতায় ভেসে ওঠ তুমি
অবনত হয় মস্তক।
কৃতিত্ব তোমার অমর করিয়াছে রবে চির ভাস্কর
দোয়া মাগরিবে দেশ ও জাতি দরবারে অধিশ্বর
আজি এই দিনে বারেক ফিরি তাকাও মোদের পানে
খেদমত যেন করিতে পারি
দ্বীনে বিশ্বায়নে।

কর্মে শরীফ তুমি

এইচ. এম. বিন ইউনুছ

শরীফ তুমি নামেই নয়
কর্মে ছিলে বটে,
কর্মগুণে জীবন তরী পৌছে দিলে ঘাটে।
মহৎ করে গড়লে জীবন
মায়ের দোলন হতে,
ভুলের কাটা রইল না তাই
তোমার জীবন পথে
ইলম দিয়ে এই সমাজের
বাড়ালে তুমি মান,
ও. আই. সি -তে প্রকাশ হলো
আওলিয়াদের শান।
কবি লেখক, ভাষাবিদ আর
মহান সাহিত্যিক,
উজ্জ্বল হলো তব গুণের রৌশনে সব দিক।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীনের গোলাপ
আবদুল করীম বিন মুহাম্মাদ

শরীফ তোমার নাম ওগো
কর্মে তুমি মহান
দ্বীনের গোলাপ ফুটালে তুমি
বিলীন করে প্রাণ।
রাসুল প্রেমে ওগো তুমি
ছিলে কত দেওয়ানা।
হৃদয় সদা থাকত তোমার
প্রিয় সোনার মদীনা ।
তুমি আজ মোদের ছেড়ে
আছ অনেক দূরে
তোমার লাগি প্রিয়তম
হৃদয় শুধু পুড়ে।
মোদের ছেড়ে চলে গেলে
রেখে হাজারো স্মৃতি
দোয়া চেয়ে তাই কবিতা
কবিতা করছি আবৃতি।

Our Teacher
(Sharif Muhammad Abdul Kadir (Rh)
Ibn-e Abdur Rahma

No body no man
but he die,
as a flying kite
in the sky.
Some was vanished
some not discussed,
Sharif, our teacher
whom remembered at first.

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি

"সোসালিজম ও ইসলাম"

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ [illegible] ও অনু-নির্ভর [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ৭.২ [illegible]
৪. ১৯৫০ সালে [illegible] ১৯৫৭ সালে [illegible] ৭.৭%
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible], ১৯৬১ সালে [illegible]
যে, "[illegible]"

[illegible]
[illegible]
[illegible]
৭. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
10. [illegible]
[illegible]

১ [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

সাম্রাজ্যের। প্রাচ্য [illegible] ও বঙ্গের [illegible] যে [illegible] ১১ [illegible] সাহিত্য- [illegible] ১১ শতক পর্যন্ত সাহিত্য [illegible] যে, সাহিত্য- [illegible] সংস্কৃত [illegible] করেছেন, এই ১১ শতক [illegible] সাহিত্য [illegible] এবং [illegible] সাহিত্য [illegible] হয়েছে। সাহিত্য [illegible] হয়েছে। [illegible] সাহিত্য [illegible] ১১ শতক [illegible]

11. [illegible] এই ১১ শতক [illegible] — [illegible] ৮ম ও ৯ম [illegible] এই ১১ শতক [illegible] — [illegible] যে, [illegible] সাহিত্য [illegible] ও [illegible] এই [illegible] ১১ শতক [illegible] হয়েছে। [illegible]

12. [illegible] — [illegible] হয়নি।

[illegible]

[illegible] ও [illegible] ১৩৫৫ [illegible] এই [illegible] হয়েছিল এবং এই [illegible]

13. [illegible] হয়েছিল [illegible] ১৩৪১ [illegible] এই [illegible] হয়েছিল যে, [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

[illegible] ভোট [illegible], এই সুবিধাভোগী [illegible] সমাজতান্ত্রিক [illegible] ১৪ ভাগ, অর্থাৎ প্রায় (১৯৪১ সালে এই সুবিধাভোগী [illegible] ২৫ লক্ষ থেকে ৩৫ লক্ষ [illegible]। [illegible] ১২ থেকে ১৬ হাজার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুবিধাভোগী শ্রেণী [illegible] হয়েছে। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

14. The Collection of the laws of the Govt of the U.S.S.R -এ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] তাঁর The New Class বই-পৃ: ১০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— "সমাজতন্ত্র [illegible] একচেটিয়া ও নিরঙ্কুশ বিশেষাধিকার [illegible] [illegible] [illegible]।" এই বই [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে, তিনি লিখেছেন,— "আমলাতন্ত্রে যে নতুন দল সৃষ্টি হয়েছে তারা মানুষ ও সম্পদের উপর প্রভুত্ব করে চলেছে।"

15. [illegible]

'[illegible]' নামে [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(সাম্যবাদী দেশে বেতন সম্বন্ধে যে অসাম্য ও বৈষম্য রয়েছে তা প্রমাণ করে, তবে সমাজের শ্রমজীবী লোকদের সুবিধা সেখানেও অসাম্য ও বৈষম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে,

16 ১৯৩৭ সালে রাশিয়ার বেতনের যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ, —

সাধারণ মজুর — ১১০ হতে ৪০০ রুবল মাসিক —
মধ্যম শ্রেণীর কেরানী - ৩০০ হতে ১০০০ রুবল মাসিক
উচ্চ পদস্থ কর্মচারী - ১৫০০ হতে ১০০০০ রুবল মাসিক —
প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী - ২০০০০ হতে ৩০০০০ রুবল মাসিক,

এ সময় হতে ১৯৩৭ সালের, এর পর দিন দিন বেতনের বৈষম্য আরও বেড়ে চলেছে, তার রাশিয়ার বেতনের একটা [illegible] উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে [illegible] শ্রেণীর মধ্যেই [illegible], উচ্চপদস্থ [illegible] সুবিধাভোগী একটা শ্রেণী গড়ে উঠেছে, এরা রাশিয়ার [illegible] নিয়ন্ত্রণহীন [illegible] 'সুবিধাভোগী' নামে অসাম্যবাদী হয়েছে, [illegible] ধনী [illegible] —
[illegible], [illegible] রুবল অসাম্যবাদী হয়ে,

17. রাশিয়ার [illegible] সাম্যবাদ উঠিয়ে দিয়েই [illegible] ~~[illegible]~~ 'মজুরী' [illegible] দেওয়া হয়, এই ভাবে [illegible] শ্রেণী [illegible] প্রকৃতির [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] বেতনের [illegible] ~~[illegible]~~ বেতন নিয়ে থাকে, এমন কি [illegible] বেতনের [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ শ্রমিকদেরই [illegible] হয়। [illegible] [illegible], [illegible] সাম্যবাদ ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] হয়েছে।

রাশিয়ার TRUD নামক সংবাদপত্রে [illegible] — [illegible] যে [illegible] [illegible] (১৯৩৫) জন [illegible], তাদের বেতনের তালিকা নিম্নরূপ —

১০০০ জন — ১২৫ রুবল মাসিক
৪০০ জন — ৫০০ হতে ৮০০ রুবল মাসিক
18. ৭৫ জন — ৮০০ হতে ১০০০ রুবল মাসিক
৬০ জন — ১০০০ হতে ৩৫০০ রুবল মাসিক,

Dhaka University Institutional Repository

এ জাতীয় আরো প্রমাণ রয়েছে যে, সেনাবাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব ছিল না। [illegible] ১৫০০ বাহিনীর মধ্যে [illegible] হাজার [illegible] তার মধ্যে ৬০ জন [illegible] ১০০০ [illegible] ৩৫০০ [illegible] [illegible] [illegible] প্রমাণ [illegible] [illegible] প্রতিবাদ করেছেন? [illegible] [illegible] হাত [illegible] [illegible] দেখা [illegible]

আসল ঘটনা হল, বাঙালীর মাত্র ৭০ জন লোক মাত্র ২৪০ [illegible] [illegible], তার মধ্যে

19. ২০ জন সওয়ার লুটে নেন, অন্যান্য বিভিন্ন [illegible] [illegible] বাঙালীর ইংরেজ [illegible] — ১৯৪৩ সালে সরকারী ইংরাজীর মতে ১০ [illegible] [illegible] [illegible] লোক [illegible] হাজার [illegible] [illegible] ২৪ [illegible] [illegible], বাঙালীর ইংরেজ সৈন্যদের [illegible] জাতীয় [illegible] 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার ৩রা জুলাই ১৯৪৩-খ্রী. সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible] পত্রিকায় ([illegible] ১.৩.৩৩) [illegible] [illegible] যে, বাঙালী ব্যবসায়ীদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবসায়ীদের মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

20. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবসায়ীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] 'বাঙালীর [illegible] [illegible]' [illegible] [illegible] ৩৮ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে, বাঙালীর [illegible] [illegible] ১১ [illegible] ১২ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মাত্র [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

"মাতৃ-দেশ বাঙালির সামনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমাজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হবে।" [illegible] [illegible] হয়,

21. বাঙালির আত্মশক্তি প্রেরণা

১৩৪০ সনে বাঙালির [illegible] "মানব-আত্মার আত্মশক্তি"-র চিত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় লিখেছিলেন। ইহা আত্মশক্তি বিকাশের প্রথম [illegible] [illegible], তাহার মূল [illegible] [illegible] ছিলেন। [illegible] [illegible] লিখেছেন, সেকালে ও এখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ১৩৩০ সনে লিখেছিলেন, "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাংলাদেশে

22. মানুষ ১৬০০০ হাজার টাকা [illegible] দেয় হয়, [illegible] [illegible] দেয় হয় ২০০০০ টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাংলাদেশে দেয় হয় ৩০০০০ টাকা [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেয় হয় ২ লক্ষ টাকা হবে।"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে, এই সব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible]" [illegible] ১৭ জুলাই, ১৯৫৪ সংখ্যার ১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

23. "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লিখেছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible] [illegible] [illegible] বাঙালির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] বাঙালি হতে বাঙালিত্বই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যায়।

Dhaka University Institutional Repository

24. [illegible]

[illegible]

25. [illegible]

[illegible]

26. [illegible]

[illegible]

27. [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]
[illegible]
[illegible]
28. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

29. ## [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
30. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

31. চাকরীর ক্ষেত্রে দুর্নীতি:

আমাদের স্বামীরা এক চাকরী হতে অন্য চাকরীতে যেতে পারত না, এটা ছিল আইনতঃ নিষিদ্ধ। পরে ১৯৭৩, ২৫ এপ্রিল থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব প্রথম দুই আইন তৈরী করে স্বামীদেরকে সাময়িক অন্য চাকরীতে যাওয়ার আইনতঃ অনুমতি দেন, এ ব্যাপারে অনেক আমলা হয়ে ২৩ নম্বর ২ নম্বর ধারা যোগ করে আইন তৈরী করেছিলেন সে আইন দুটো মুসলমানদের হয়ে গেল। ফলে: অসহায় স্বামীরা আইন সাময়িক ভাবে স্বামীরা এক চাকরী হতে অন্য চাকরীতে যেতে পারছে না।

32. সমতাভিত্তিক বেতন স্বামীদের প্রতি ~~অবহেলা~~ আইনের অবহেলা

(সাধারণত আমাদের দেশে চাকরীতে স্বামীদের বয়স ও বেতন আইন অনুযায়ী বেশী হলে অবসর মঞ্জুর হয়, স্বামীরা তৈরী করে উঠে, অথচ স্বামীদের যে সুযোগ হওয়ার কথা তা পাচ্ছে না তার এ কথা সাধারণ সাময়িক ভাবে অবহেলা করে আইন সাময়িক ~~অবহেলা~~ দেখা যায়। যেমন বেশী বয়সে বিবাহ করে নারী আইনের কাছে দুই হাজার টাকা দেনমোহর সাময়িক হয়, অথচ সমান্তরাল বেতন হতে দেখা যায় ২৫ থেকে

33. এক লাখ ~~টাকা~~ দেখা হয়। প্রত্যেক স্বামীদের ডিভোর্স করে নারীর জন্য প্রায় দশ বা চাকরীজীবী-স্বামীদের। কিন্তু দেখা যায়, ওরে স্বামীদের আইনগত ও তার চাকরীর সাথে ডিভোর্স দিতে হয়, যদি কোন স্বামীর দেনমোহর বেশি হয় স্বামীর-উপর অত্যাচার হয় এবং তার নারীর পক্ষে সাথে ডিভোর্স। কিন্তু তারা মনে করেন যে সে স্বামীদের জীবনই শেষ হয়ে গেল, কেননা সে স্বামীর যদি এ চাকরী হতে অন্য কোথাও চাকরীতে যেতে চায় সেখানেও তার এ ডিভোর্সের কারণে প্রমাণ হবে এবং এ কারণে ডিভোর্সের তার সাময়িক-ভাবে নারী চাকরী ও সেই সময় তাকে ছেড়ে দিতে হবে, ফলে তার চাকরী পাওয়ার অন্য কোন সুযোগ থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository

34. [illegible]

[illegible]

35. [illegible]

[illegible]

36. [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

"ইসলামই পাকিস্তানের একমাত্র রক্ষাকবচ" — এ যুক্তির [illegible] কি?

পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ কথা যে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে হলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি হবে, তার ফলে [illegible] সমাধান হয়ে যাবে, কিন্তু ইসলাম

37\. [illegible] থেকে মুক্ত হতে পারে তার মূলীনীতি [illegible] [illegible], [illegible], সবচেয়ে বড় কথা যে, পাকিস্তানের ইতিহাস [illegible] আর্থিক দিক থেকে [illegible] হতে পারে [illegible], পাকিস্তানের [illegible] [illegible] এ [illegible] হলো এই উন্নত [illegible]। ইসলামের [illegible] পাকিস্তানের অর্থনীতি শুরু হয় [illegible] [illegible] [illegible] অর্থনীতি হয়ে [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] এমন [illegible] [illegible] [illegible] হবে [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে [illegible] [illegible], এ সম্বন্ধে পাকিস্তানের [illegible] [illegible] [illegible]। পাকিস্তানের [illegible] পাকিস্তানের [illegible] [illegible] [illegible] পশ্চিম ও পূর্বের [illegible] [illegible] [illegible], পশ্চিম পূর্বের [illegible] [illegible] ৬.৩ পাকিস্তানের

38\. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তান [illegible] হয়। পাকিস্তানের [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছিল, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তান [illegible] [illegible] আর্থিক [illegible] হয় [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তানের [illegible], এ [illegible] পাকিস্তান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তানের, কিন্তু তার অর্থনৈতিক উন্নতির হার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হত —

: পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নতির হার :

১৯৫০ থেকে	১৯৬০	—	৮.৮ শতাংশ —
১৯৬০ "	১৯৬৫	—	৬.৪ শতাংশ —
১৯৬৭	—		১০.৩ শতাংশ —
39. ১৯৬৮	—		১১.৩ শতাংশ —

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের এই যে [illegible] সাম্প্রদায়িকতার
অন্যতম হয়েছে। [illegible] [illegible] ফলে, আমাদের
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] নিয়ে আসে
এর আগেই ৩০ বছরের [illegible] [illegible] [illegible] নিয়ে আসে
আমাদের [illegible] [illegible] যে [illegible] হবে, মুসলিম
লীগ ও সরকার [illegible] [illegible] নিয়ে আসে প্রথম দিকে
মুক্তি ~~[illegible]~~ এর দ্বিতীয় [illegible] আমাদের [illegible], আমরা [illegible]
আর প্রত্যক্ষই [illegible] আমাদের [illegible] কোন [illegible]
মনে নেই — ~~[illegible]~~ এসে [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের
মনে হয়, আমাদের [illegible] [illegible] সাহিত্য সম্পর্কে ভুল না হয়
যেমন হয় তেমনি হবে যে, আমাদের [illegible]
মুসলিম সংস্কৃতি ~~[illegible]~~ ভিন্ন হয়েছে [illegible] এবং দ্বিতীয়
এর ভিন্ন হয়েছে চীন, আরব এই সব [illegible] [illegible],
আরবীয়, ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
40. হয়েছে — [illegible] [illegible] সাহিত্যের [illegible], [illegible]
আমাদের সাহিত্যের বিবর্তনের অন্যতম [illegible] [illegible]
তা [illegible] হবে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে,
মুসলিম সব [illegible] এক আদর্শ-ভিত্তিক [illegible] আমাদের
হয়েছে; আমাদের ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
জীবন, [illegible], সাংস্কৃতিক উপাদান, আচার ব্যবহার,
[illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible]
আমাদের ভিন্ন [illegible] হয় [illegible] [illegible], আমাদের
[illegible] [illegible] মুসলিম [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের সাহিত্য —
হয় [illegible] [illegible] হয়েছে, [illegible] [illegible] হয়, আমাদের
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] সংস্কৃতি
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে; Para. আমাদের [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ১৩৮৭
41. [illegible] মুসলিম [illegible] হয়েছে [illegible] [illegible] কি ছিল?
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] মুসলিম [illegible] [illegible] এই [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তাশীল লোকের মতে [illegible] হয়েছে।
আবার যদি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে (অ্যারিস্টটলের [illegible]
তুলনা অর্থশাস্ত্রের তুলনা করা হয় দেখা যায় কৌটিল্যের
যেমন বেশ উন্নত ছিল [illegible] প্রাচীন ও মধ্যযুগের অর্থশাস্ত্রের
তুলনায় অনেক বেশী, তাদের মতে ও আধুনিক মতে কার্যত
প্রমাণ করে, [illegible] আধুনিক Economic অর্থনীতি শূন্য (ZERO)
থেকে শুরু হয়েছে, আধুনিক [illegible] বলেন, প্রাচীন
ভারতীয় ও চীন সভ্যতার সব [illegible] উন্নত
চিন্তাশীল ছিল, এই কার্যত [illegible]
[illegible]
42. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] A. Para [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
43. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

44. [illegible]

[illegible] — [illegible] ১৩ মার্চ, ১৩৪৪,

[illegible]

"[illegible]" — [illegible] ১৩ মার্চ, ১৩৪৪,

[illegible]

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

এ্যালবাম

Dhaka University Institutional Repository

O.I.C এর ' ফিক্‌হ একাডেমী' র ৮ম অধিবেশন, স্থান ব্রুনাই, সন-১৯৯৩
আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির-বাম থেকে তৃতীয় (উপবিষ্ট)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির
O.I.C এর ' ফিক্‌হ একাডেমী' র ৭ম অধিবেশন, স্থান জিদ্দা, সন-১৯৯২

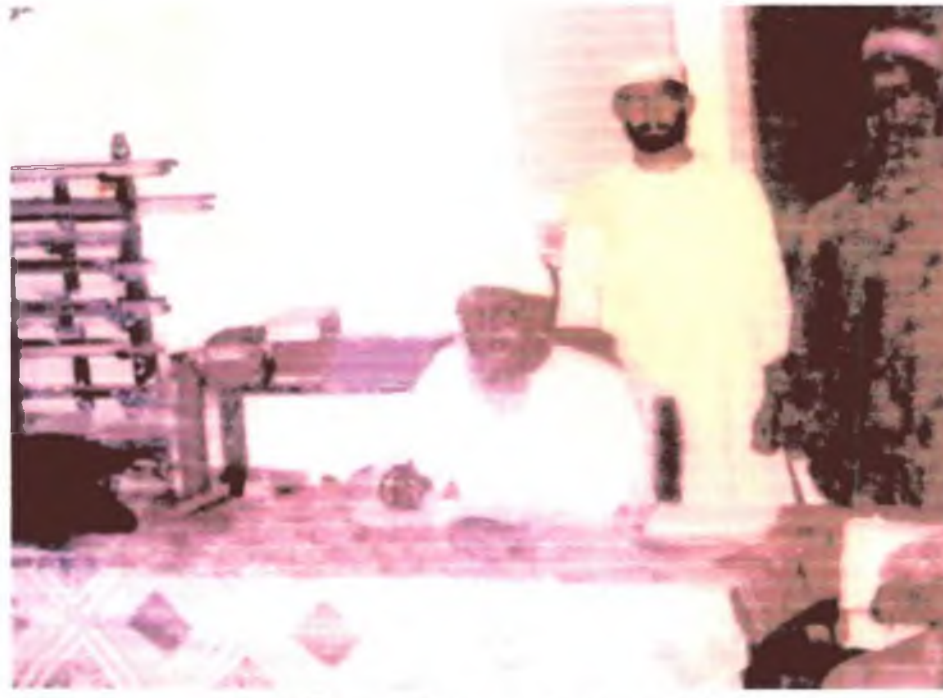

শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির
হারছীনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ-১৯৮২ ইং

Dhaka University Institutional Repository

শরীক মুহাম্মাদ আবদুল কাদির । ১৯৯০ ইং

Dhaka University Institutional Repository

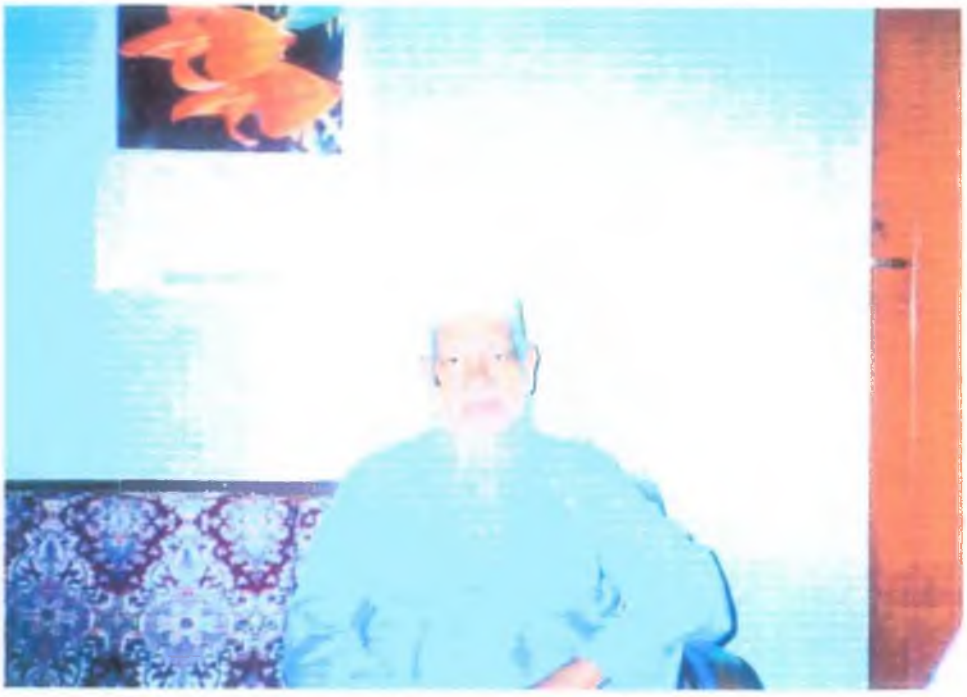

আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির-অসুস্থ অবস্থায় নিজ বাসগৃহে । মার্চ -২০০০

আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির-অসুস্থ অবস্থায় নিজ বাসগৃহে । মার্চ -২০০০

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (রহ.) : জীবন ও কর্ম' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ। তারিখ ঃ ৩১/০৭/২০০৩

'আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (রহ.) : জীবন ও কর্ম' শীর্ষক সেমিনারের সভাপতি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান। তারিখ ঃ ৩১/০৭/২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির-ব্যক্তিগত পাঠাগারে উপবিষ্ট । মার্চ -২০০০

আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির-ব্যক্তিগত পাঠাগারে উপবিষ্ট । মার্চ -২০০০

Dhaka University Institutional Repository

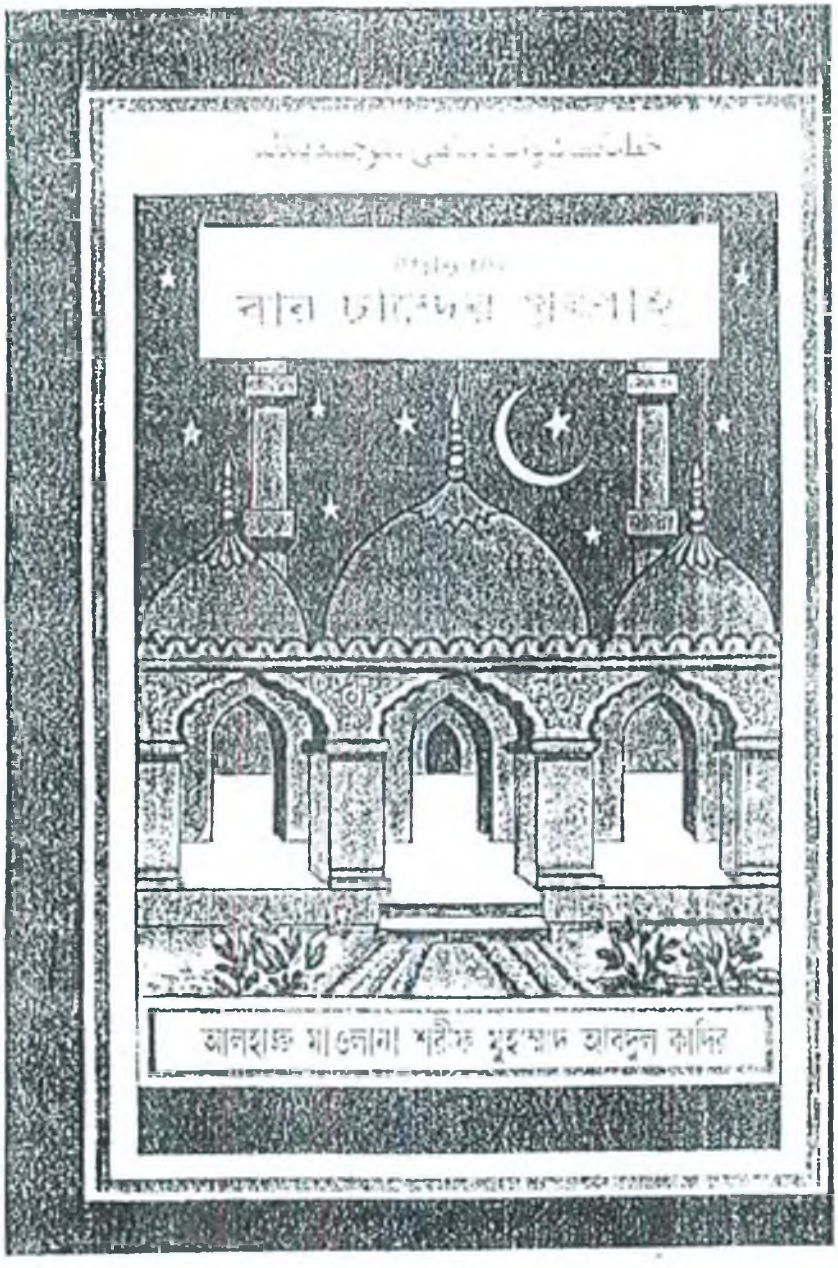

Dhaka University Institutional Repository

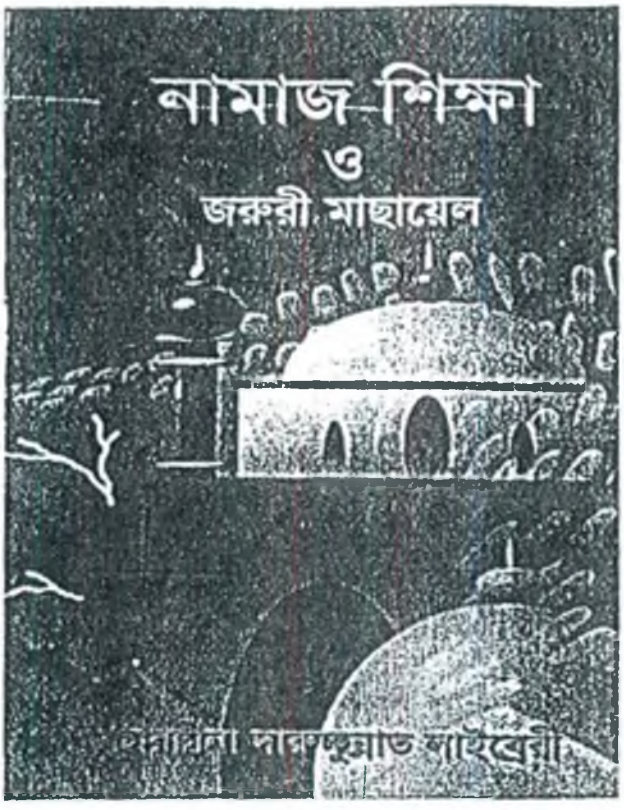

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে জিয়ারতুন্নবী

সংকলন ও অনুবাদ :

আলহাজ্ব শাহ্ শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির

২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

অশ্রু-সরোবর

(দিওয়ানে ইবনুল ফারিদের কাব্যানুবাদ)

আলহাজ্জ মাওলানা
শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির

পাকিস্তানের গৌরব, বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ডক্টর
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম-এ, বি-এল সাহেবের
অভিমত

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

[illegible]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

হাবীবুল ওয়াইযীন

৩য় ভাগ

শর্ষিণা শরীফের হযরত পীর সাহেব কেবলার
অনুমোদনে

বঙ্গানুবাদ বার চাঁদের খুৎবাহ, ইসলামে নারীর মর্যাদা,
জীবনের আদর্শ, চারি মাযহাবের ফায়সালা,
হাকীকাতুল মসলাহ প্রভৃতির লেখক,

শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির
কর্তৃক প্রণীত

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শর্ষিণা মাদ্রাসাহ্ লাইব্রেরী
পোঃ দারুস্সুন্নাত, জিঃ বাকেরগঞ্জ।

স্বত্ব সংরক্ষিত — মূল্য—চৌদ্দ আনা

হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। — এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।

[illegible]

[illegible] (দঃ)এর মাতার নাম বিবি আমিনা, তাঁর পিতা ওহাব, তার পিতা আবদে মানাফ, তার পিতা যুহরা, আমিনার পিতা আমিনাকে খাজা আবদুল্লাহর নিকট বিয়ে দেন। বিবি আমিনা হযরত (দঃ) কে গর্ভে ধারণ করেন। তাঁর গর্ভাবস্থায় খাজা আবদুল মুত্তালিব তদীয় পুত্র খাজা আবদুল্লাহকে খেজুর আমদানী করার জন্য ইয়াসরিবে (পরবর্তী নাম মদীনা শরীফ) পাঠিয়ে দেন। খাজা আবদুল্লাহ সেখানে ইন্তেকাল করেন।

হুযুর (দঃ)এর জন্ম ও শৈশব

সাইয়েদা আমিনা 'আমূল ফীল' (হস্তী-বৎসর) ✱ রবীউল আউয়াল মাসের ২রা বা ৮ই—১২ই কিম্বা ১২ই তারিখে হুযুর (দঃ) কে প্রসব করেন। তারিখটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে।

হুযুর (দঃ) এর জন্মোপলক্ষে হযরত আব্বাস (রাঃ) কবিতা বলেছিলেন—

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ *

وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ ـ

✱ [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

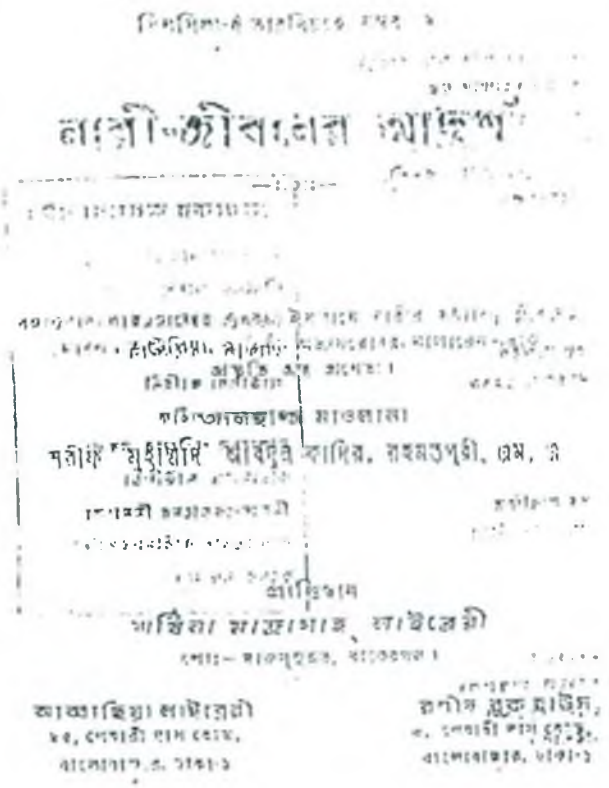

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইনকিলাব

ঢাকা, শুক্রবার ১৭ শ্রাবণ ১৪১০, ১ আগস্ট ২০০৩

সউদী হাসপাতালে লাশ পড়ে থাকার খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন

—পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাসস ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সউদী আরবের হাসপাতালগুলোতে লাশ পড়ে থাকা সম্পর্কিত একশ্রেণীর সংবাদপত্রে ২৭, ২৮, ও ২৯ জুলাই প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ জানিয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পররাষ্ট্র দফতর এ ব্যাপারে গত ২৭ জুলাই দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত খবরকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করেছে। এতে বলা হয় প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে গত ৭ মাসে ১৮৫ জন বাংলাদেশীর লাশ সউদী আরব থেকে পাঠানো হয়। মন্ত্রণালয় আরো বলেছে, ১০২টি লাশ সউদী আরবে দাফন করা হয়। সেদেশের কিছু পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতার কারণে ২৭টি লাশ দাফন করা বা *(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কলামে দেখুন)*

আল্লামা শরীফ আবদুল কাদির (রহঃ) ছিলেন মর্দে মুমিন

—বিচারপতি আবদুর রউফ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ জ্ঞানতাপস যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল কাদির (রহঃ) জীবন ও কর্ম শীর্ষক সেমিনারে বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ বলেছেন, আল্লামা শরীফ আবদুল কাদির (রহঃ) ছিলেন মর্দে মুমিন। বিভিন্ন মাত্রায় তাঁর বিরল প্রতিভা ছিল। ইসলাম প্রচারে তিনি দীর্ঘসময় নিজকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ৭-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

বিচারপতি আবদুর রউফ

৮-এর পৃষ্ঠার পর

আল্লামা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির (রহঃ) ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকেলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে মরহুমের জীবন ও কর্ম শীর্ষক সেমিনারে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ডঃ আ র ম আলী হায়দার। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান, প্রফেসর ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর আবদুল মালেক, ডঃ এ এইচ এম ইয়াহইয়ার রহমান, মাওলানা মোজাম্মেল হক, মাওলানা গিয়াস উদ্দীন, মাওলানা হুসাইন আহমদ, ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম। সভাপতির বক্তৃতায় ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, মরহুম শরীফ মুহাম্মদের মুদ্রিত সকল লেখা এক ভলিউমে প্রকাশ এবং অপ্রকাশিত লেখাসমূহ সংগ্রহ করে তা মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, মরহুম আল্লামা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির ছিলেন একজন সত্যিকার জ্ঞানতাপস। তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী। ছারছীনার পীর সাহেবের মধ্যে যেসব গুণাবলী ছিল মরহুম আবদুল কাদির (রহঃ)-এর মধ্যেও তেমনটি লক্ষণীয় ছিল।

মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান বলেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলমানদের অধঃপতনের হাত থেকে মুক্ত করতে ছারছীনা শরীফের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের যে বিস্তৃতি লাভ করেছিলো সেক্ষেত্রে মরহুম শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদিরের (রহঃ) গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তিনি ইসলামী পুনর্জাগরণের রুকন ছিলেন। জ্ঞান অন্বেষণে তিনি ছিলেন নিবেদিত। কখনও তাকে বই হাতে ছাড়া দেখা যায়নি। আমানতদারীর গুণাবলীতে তিনি ছিলেন বিরল ব্যক্তিত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইনকিলাব ৩

ঢাকা, বৃহস্পতিবার ১৬ শ্রাবণ ১৪১০, ৩১ জুলাই ২০০৩

গড়ে তোলার পরামর্শ দেন।

আজ আল্লামা আবদুল কাদির (রহঃ) জীবন ও কর্ম শীর্ষক সেমিনার

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ আজ (বৃহস্পতিবার) বিকাল ৩টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে 'আল্লামা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির (রহঃ) জীবন ও কর্ম' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারের আয়োজন করেছে আল্লামা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির (রহঃ) ফাউন্ডেশন। সেমিনারে প্রধান অতিথি থাকবেন বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ। মূল প্রবন্ধ পাঠ করবেন ড. আরিম আলী [illegible]। আলোচক থাকবেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান, প্রিন্সিপাল মোঃ আমজাদ হোসাইন, ড. আ ফ ম আনওয়ারুল হক প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইনকিলাব

ঢাকা, শনিবার ১৮ শ্রাবণ ১৪১০, ২ আগস্ট ২০০৩

আল্লামা আঃ কাদির (রহঃ)-এর সকল গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি একটি ভলিউম আকারে প্রকাশের আহবান

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ গত বৃস্পতিবার বিকেল ৩টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে 'আল্লামা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির (রহঃ) ঃ জীবন ও কর্ম' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবুদর রউফ।

মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ এ আর এম আলী হায়দার। আলোচনায় অংশ নেন কবি জহুর আমিন খান, প্রফেসর আনসার উদ্দীন, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ এ এইচ এম ইয়াহইয়ার রহমান, প্রফেসর আব্দুল মালিক, ডঃ আব্দুর রশীদ, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক মোঃ শওকত হোসেন, প্রিন্সিপাল শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাউয়ুম, প্রিন্সিপাল আ খ ম আবু বকর সিদ্দিক, মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ গিয়াসী, মাওলানা মোজাম্মেল হক, মাওলানা হোসাইন আহমদ, শরীফ মুহাম্মদ মুনীর। উপস্থাপনা করেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

বক্তব্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, উপমহাদেশের অন্যতম জ্ঞানতাপস ছিলেন ওআইসি ফিকাহ একাডেমীর বাংলাদেশ প্রতিনিধি আল্লামা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির (রহঃ)। তিনি মরহুমের লিখিত ২৮টি গ্রন্থ এবং তার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধমালা এবং পাণ্ডুলিপিগুলো একটি ভলিউম আকারে প্রকাশের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করেন।

অসুস্থ জোহরা তাজউদ্দিন দেশবাসীর দোয়া চেয়েছেন

২৪২

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক
২ ইত্তেফাক

ঢাকা ঃ বুধবার, ১৫ শ্রাবণ, ১৪১০ ❑ Wednesday, 30 July, 2003

আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির সম্পর্কে আগামীকাল সেমিনার

আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় ইসলামিক কালচারাল মিলনায়তনে (বায়তুল মোকাররম) 'আল্লামা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির (রহঃ) জীবন ও কর্ম' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সভাপতিত্ব করবেন ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ভিসি-ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। প্রধান অতিথি থাকবেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করবেন ডঃ এ আর এম আলী হায়দার। আলোচনায় অংশ নিবেন দৈনিক সম্পাদক মুহিউদ্দীন খান, দৈনিক ইনকিলাব নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি কবুল আমীন খান প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল কুরআনুল কারীম।

২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইব্রাহীম বুখারী (রহ), সহীহ আল বুখারী, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০)।

৩. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ (রহ), সহীহ মুসলিম, (ভারত: মুকতার এন্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সাহারানপুর ইউ. পি. ১৯৯৯)।

৪. ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা (রহ), জামে আত তিরমিযী, (ভারত: মুকতার এন্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সাহারানপুর ইউ. পি. ১৯৯৯)।

৫. মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাযাহ (রহ), সুনান ইবন মাযাহ, (ভারত: মুকতার এন্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সাহারানপুর ইউ. পি. ১৯৯৯)।

৬. সুলাইমান ইবনুল আশআস ও আবু দাউদ আস সিজিস্তানী (রহ), সুনান আবী দাউদ, (ভারত: মুকতার এন্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সাহারানপুর ইউ. পি. ১৯৯৯)।

৭. আহমদ ইবন শুয়াইব (রহ), সুনান নাসাঈ, (ভারত: মুকতার এন্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সাহারানপুর ইউ. পি. ১৯৯৯)।

৮. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইব্রাহীম বুখারী (রহ), আল আদাবুল মুফরাদ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪)।

৯. মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আননববী (রহ), রিয়াদুস সালেহীন, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০০০)।

১০. আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), আল মুসনাদ, (ভারত: মুকতার এন্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সাহারানপুর ইউ. পি. ১৯৯৯)।

১১. সুলাইমান ইবন আহমদ আততাবারানী (রহ), আল মুজামুস সগীর, (বৈরুত: আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৯৪)।

১২. মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, আল মু'জাম আল মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআন, (বৈরুত: আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৯৪)।

১৩. ইবন মানযূর, লিসানুল-আরব, (বৈরুত: দারু-ইহইয়াইত-তুরাসিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি.)।

১৪. ইবরাহীম আনীস, আল মু'জামুল ওয়াসীত, (দেওবন্দ: কুতুবখানা হুসাইনিয়্যাহ, ১৪১৭ হিজরি)

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ইবন হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা, (মিসরঃ আল মাকতাবাতুত-তিজারিয়্যাহ, ১খন্ড, তা. বি.)।

১৬. ইবন কুদামা, নাকদ আন-নাসর, (কায়রোঃ দারুল কুতুবুল মিসরিয়াহ, ১৯৯৩)

১৭. কুদামা ইবন জা'ফর, নাকদ আন-নাসর, (কাযরোঃ দারুল-কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১)।

১৮. ইবন কুতায়বা, উয়ূন আল-আখবার, (কায়রোঃ দারুল কুতুব, ১ম সংস্করণ, ২য় খন্ড, ১৯৮১)।

১৯. ইবন খালদুন, মুকাদ্দামাহ, (বৈরুতঃ দারুল-কালাম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮১)

২০. ওলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ আল-খাতীব আত্-তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশিদিয়্যাহ, তা. বি.)

২১. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলামন ও স্বাধীনতা আন্দোলন, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, মার্চ ১৯৯৩)।

২২. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বঙ্গীয় মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩)।

২৩. অতুল চন্দ্র রায় এবং প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস, (কলিকাতাঃ মৌলিক লাইব্রেরি, ২য় সংস্করণ, ২০০০)

২৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, হাদীস শরীফ, (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৪তম সংস্করণ, ২০০০)।

২৫. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৯ খ্রি.), (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪)

২৬. মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, নামাজ শিক্ষা ও জরুরী মাসায়েল, (পিরোজপুরঃ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, জানুয়ারী ১৯৯৮)

২৭. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, নারী জীবনের আদর্শ, (বাকেরগঞ্জঃ শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৭৯)।

২৮. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, ইসলামে নারীর মর্যাদা, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮)।

২৯. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, হাকীকাতুল অহীলাহ, (পিরোজপুরঃ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, জানুয়ারি ১৯৫৫)।

৩০. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, আউলিয়া কাহিনী (ঝালকাঠীঃ শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৯)

Dhaka University Institutional Repository

৩১. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, এক নজরে সীরাতুননবী (স), (ঝালকাঠী: হিযবুল্লাহ দারুত্তাসনীফ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ)।

৩২. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, নালায়েন শরীফের ফযীলত, (ঢাকা: ছারছীনা প্রকাশনী, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৯৮)

৩৩. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, অশ্রু সরোবর, (বরিশাল: শরীফ পাবলিকেশন্স ১৯৬৬)।

৩৪. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, কাব্যানুবাদ কারীমা, (বরিশাল: শরীফ পাবলিকেশন্স ১৯৯৬)

৩৫. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, হাবীবুল ওয়া'ঈজীন, (বাকেরগঞ্জ: দারুচ্ছালাম কুতুবখানা, ১৯৫৮)

৩৬. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, জীবনের আদর্শ, (পিরোজপুর: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, ১৯৬৩)

৩৭. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, তরীকুল ইসলাম, (পিরোজপুর: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, ২০০২)

৩৮. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, চারি মাসআলার ফায়সালা, (পিরোজপুর: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, ১৯৬৫)

৩৯. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, সুখের সন্ধানে, (পিরোজপুর: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, ১৯৭০)

৪০. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ, ২০০০)

৪১. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, পাকিস্তান ও মুসলমান, (পিরোজপুর: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, ১৯৬৩)

৪২. শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, কারামাতে আউলিয়া, (পিরোজপুর: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, ১৯৬৫)

৪৩. সম্পাদনা পরিষদ, গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০১।

৪৪. মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, বঙ্গানুবাদ বার চান্দের খুৎবাহ, (ঢাকা: ছারছীনা প্রকাশনী, ২০০২)

৪৫. শায়খুল হাদীস মাওলানা মুজীবর রহমান, জুমুআর ফাযায়েল ও মাসায়েল , (ঢাকা: দারুল কিতাব, মে ১৯৯৬)।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর (র), আল হিদায়া, তরজমা: মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮)

৪৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯৯)।

৪৮. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র, (ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ৩য় খন্ড, ২০০৪)

৪৯. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮)

৫০. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান খান, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব, (ঢাকা: সিটি লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯১)

৫১. আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, ৭০ থেকে ৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, (ঢাকা: পান্ডুলিপি, ডিসেম্বর ১৯৯১)

৫২. ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ, পৌরবিজ্ঞানের কথা, (ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি., আগস্ট ১৯৯৬)

৫৩. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৫৭-২০০০, (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০১)

৫৪. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৭)

৫৫. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৭১, (অর্থনৈতিক), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০)

৫৬. আহসান সাইয়েদ, হাদীস সঙ্কলনের ইতিবৃত্ত, (ঢাকা: এ্যভর্ন পাবলিকেশন, ২০০১)

৫৭. সম্পাদনা পরিষদ, আল কুরআনের শাশ্বত পয়গাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২)।

৫৮. সম্পাদনা পরিষদ, দীনিয়াত, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৪)।

৫৯. নাসির উদ্দিন আহমেদ ও ড. মোহাম্মদ তারেক সম্পা., উন্নয়ন অর্থনীতি: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৯৩)

৬০. প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হামিদ, আধুনিক অর্থনীতি, (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা.) লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪)

৬১. সম্পদনা পরিষদ, ফাতাওয়া ও মাসাইল, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০১)

Dhaka University Institutional Repository

৬২. এ. কে. এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, (যুক্তরাজ্য: দি ইসলামিক একাডেমী, ক্যাম্ব্রিজ, ২০০৩)

৬৩. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১১শ খন্ড, ১৯৮৮)

৬৪. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দশম খন্ড, ২০০৩)।

৬৫. A R. Mallik, British Policy and Muslims of Bangla, (Dhaka: Bangla Academy, 1977)

৬৬. G. Allana, Pakistan Movement: Historic Documents, (Karachi: Wisdom Publishers, 1968)

৬৭. Safar A. Akanda, East Pakistan and Politcs of Regionalism, (Ph.D Thesis, University of Denver, 1970)

৬৮. Md. Abdur Rahim, The Muslim Society And Politics in Bengal,(Dhaka: Bangladesh Book Society, 1978)

৬৯. Dr. Abul Fazal Haque, Constitution and Politics in Bangladesh: Conflict, Change and Stability, (Rajshahi University Ph.D Thesis)

৭০. Mizanur Rahman Shelly, Emergence of a Nation in a Multi-Polar World : Bangladesh. (Washington : Washington D.C 1978)

৭১. Harrun-or-Rashid, The foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1987, (Dhaka: University Press Ltd.)1998

পত্র-পত্রিকা

١. مجلة مجمع الفقه الاسلامي ، الذروة الخامسة ، العدد الخامس ، الجزء الاول ، ١٩٨٨م ، ١٤٠٩هـ

٢. مجلة مجمع الفقه الاسلامي ، الذروة السادسة ، العدد السادس ، الجزء الاول ، ١٩٩٠م ، ١٤١١هـ

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা-৩৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা. অক্টোবর ১৯৯৪- সেপ্টেম্বর ১৯৯৫)।

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি - মার্চ ১৯৯২)।

৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা-এপ্রিল - জুন, ২০০০)।

৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা- অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০০০)।

৭. মাসিক অগ্রপথিক, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী ১৯৯২ সংখ্যা)

৮. মাসিক অগ্রপথিক, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , মে ১৯৯২ সংখ্যা)।

৯. মাসিক কুড়িমুকুল, (পিরোজপুর: দারুচ্ছুন্নাত একাডেমী, অক্টোবর ২০০১ সংখ্যা)

১০. পাক্ষিক তাবলীগ, (ছারছীনা শরীফ: ১৭শ সংখ্যা, ৪২ বর্ষ, জুলাই ২০০১ সংখ্যা)

১১. মাসিক অগ্রপথিক, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী মার্চ ১৯৯২ সংখ্যা)

১২. অগ্রপথিক, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৯ সংখ্যা) ।

১৩. দৈনিক ইনকিলাব, (ঢাকা: ২ মার্চ ১৯৯৩ সংখ্যা ।

১৪. মাসিক সবুজ পাতা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ১৯৯৪ সংখ্যা)

১৫. পাক্ষিক তাবলীগ, (ছারছীনা শরীফ, ৩২ বর্ষ, ১ম, ২য় ও ৩য়, ২০০১ সংখ্যা ।

১৬. মাসিক সবুজ পাতা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর- অক্টোবর ১৯৯১ সংখ্যা)

১৭. মাসিক আল বালাগ, (ঢাকা: জানুয়ারি ১৯৯১ সংখ্যা)।

১৮. দৈনিক ইনকিলাব, (ঢাকা: ১২ আষাঢ়, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ)।

১৯. দৈনিক ইনকিলাব, (ঢাকা: ২২ জৈষ্ঠ্য, ১৩৯৮ বাঙ্গাব্দ)।

২০. পাক্ষিক তাবলীগ, (ছারছীনা শরীফ: ৪২ বর্ষ, ১৫ আগস্ট ১৯৯২ সংখ্যা)

সাক্ষাৎকার

১. মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন, অধ্যক্ষ, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসা, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

Dhaka University Institutional Repository

২. শরীফ মুহাম্মদ মুনীর, মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির এর কনিষ্ঠ পুত্র।

৩. শরীফ মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির এর জেষ্ঠ্য পুত্র।

৪. মাওলানা কাজী মাযিজ উদ্দীন জেহাদী, প্রভাষক, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসা, পিরোজপুর।

৫. মাওলানা আব্দুল হাই, অধ্যক্ষ, সারেংগাল নেছারিয়া হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসা, পিরোজপুর।

৬. আবু ছালেহ পাটওয়ারী, প্রধান মুফাসসির, সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদরাসা, কুমিল্লা।